প্রকাশক ঃ
শ্রীনটরাজ কিশোর গোস্বামী
শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির
১১২/১, ক্যানেল ষ্ট্রীট
শ্রীভূমি, কলিকাতা-৪৮
ফোন ঃ ৫৭-৩০৮৭

প্রচ্ছদ ঃ নটরাজ

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭বি, কৈলাস্ বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বিচিত্র সাহিত্য

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি

গোপাল সহস্রনাম

একনাথী ভাগবত

সন্ধানীর সাধুসঙ্গ

জ্ঞানেশ্বরী গীতা

নিকুঞ্জরহস্য স্তব

ভাগবত প্রবেশ

কথকতার কথা

ভারত সংস্কৃতি

(হিন্দী)

পরিবেশক

মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

বসাক বুক ষ্টোর
৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রতি নিশ্বাসে মানুষ আঁকা বাঁকা নানা পথে চলে। তার এই সর্পিল গতির রহস্য আছে তার অন্তরে। প্রাণের গোপনে অন্তহীন জীবন-প্রবাহে সঞ্চিত কামনা-বাসনার অনন্ত নাগই তার প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুজগৎ রূপ, রস, গন্ধের ডালি নিয়ে সতত মানুষের ভোগের তাগিদ সৃষ্টি করে। আকর্ষণের ঘূর্ণিচক্রে উপলব্ধির আনন্দ-আবর্ত্তে মানুষ উন্মাদ। সে তার নিজস্ব চমৎকৃতিময় আনন্দ সম্বেদন প্রকাশে উৎসুক হয় সাহিত্যের আঙ্গিনায়। তাই যুগে যুগে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

ভাবনায় রঙ্গীন বস্তু ও জগৎ ভাষায় ধরা দেয় নিত্য সুন্দর সুষমা নিয়ে। মানুষ কেবল তার নিজেকে নিয়ে আত্মসত্তায় সন্তুষ্ট নয়। সে কবি, মরমিয়া, দার্শনিক ও অধ্যাত্মবাদীর সম্বন্ধে এসে আত্মসচেতন হয়। প্রজ্ঞালোকের অনুসন্ধান চলে তার নিরলস ভাবে। তখন কোনো ব্যক্তিবিশেষ তার শুভ ভাবনায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে সমাজ-জাতি, দেশ-বিদেশ, সর্বত্র বহুজনের ভাব কল্পনায় আত্মদান করে। কাব্যে, দর্শনে, ভাবনায়, এক অভিন্ন আনন্দসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত আত্মা সর্বাত্মা হয়ে যায়। দূরে পড়ে থাকে হিংসা বিদ্বেষের ভ্রান্তি-বিলাস।

বস্তু ও ভাবনিষ্ঠ উভয়প্রকার সাহিত্যের মূলে আছে অহিংস প্রেম প্রতিষ্ঠার সৃজন সৌন্দর্য। মাধুর্য কোনো দেশ কালের ব্যবধান মানেনা। চিরন্তন আনন্দ রূপবিলাসী ও ভাববিলাসীকে নির্বিশেষে পরিব্যাপ্ত করে। অভিসন্ধিহীন হয়ে অখণ্ড আনন্দকে স্বাগত করবার প্রস্তুতি ও প্রশান্ত দৃষ্টি সকলের থাকেনা। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ চিরদিন সর্বজয়ী।

অনেকদিনের ভাবনার সম্পুট তুলে দিলাম রসিক পাঠকের হাতে। তাদের অতটুকু আনন্দ হলে সার্থক হবে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

পূজার দিনে
১৩৬৬ সাল।

গ্রন্থকার

বিচিত্র সাহিত্য

চণ্ডীদাসের পদাবলী

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায় শুনে পরম আনন্দ।
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

চণ্ডীদাস নামটিই বৈষ্ণবের মনে রসধারার প্রবাহ প্রতীক। ঐতিহাসিকের সমীপে চণ্ডীদাস সমস্যা অত্যন্ত কঠিন। ভাবুকের বাঁধনহারা মন রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় গানে চণ্ডীদাসের মর্ম্মের বাণী শ্রবণে সমুৎসুক। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চরম উৎকণ্ঠায় বিশ্বের বিস্মরণেও প্রধানতম স্মরণীয় করিয়াছেন চণ্ডীদাসের পদ। এ হেন চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত কৃষ্ণকীর্ত্তন পদাবলীর রসতত্ত্ব বিশ্লেষণের কতবড় গুরুদায় তাহা সাহিত্যিক মাত্রই উপলব্ধি করিয়াছেন। মদীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সমীপে এ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছি উহা জনসমাজে নিবেদন করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। মনে হয় রসবিশেষপরিপাটী আস্বাদনে বিশেষতঃ অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রস বিচারে ভজনসংস্কৃত মনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে রসধারায় অভিস্নাত পুরুষগণ পারমার্থিক জগতে বরেণ্য হইয়াছেন উহা যে কেবল সাহিত্যিকের বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষায় উৎকর্ষ অপকর্ষ লাভ করিবে এ কথা ধারণা করিতে মন আর চাহে না।

বীরভূম বিচিত্র সাধনায় সমৃদ্ধভূমি। রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত এই বীরভূমে নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিশালাক্ষি বা বাঁশুলীর পূজক হিসাবে তিনি যে শক্তির ধারক হন তাহা তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। নান্নুরে চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী বাঁশুলী বা বিশালাক্ষি আছেন। বর্ত্তমান মন্দির হয়তো প্রাচীনকালের চণ্ডীদাস পূজিত দেবীর প্রাচীন স্থান নয়। একটি প্রাচীন ঢিপিকেই সেকালের মন্দিরের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। নতুন মন্দিরের দক্ষিণে এই প্রাচীন স্থান। সেকালের সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন না একথা বলিতে হইবেই। বিশেষতঃ তিনি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা কাব্যকে স্থানে স্থানে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। শুধু ভাগবত নয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, গর্গসংহিতা এবং অন্যান্য পুরাণ সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তাহার কাব্যই এই বিষয়ে প্রমাণ।

পৌরাণিক বর্ণনা অবলম্বনে অভিনব ভাবপুষ্ট রাধাকৃষ্ণ বিষয়িণী লীলা বিস্তারে তাঁহার দক্ষতা অতুলনীয়। কবি মনের সরসভাবনা লীলা মাধুরী পরিপুষ্টির সহায়তা করিয়াছে প্রতিপদে। ভাবনায় ধরা পড়িয়াছেন রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নায়ক শিরোরত্ন অপ্রাকৃত রসঘন মূর্ত্তি নন্দনন্দন। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তহারিণী মহাভাব স্বরূপিণী রসতরঙ্গিণী শ্রীরাধারাণী যে নিরাবরণ নিরাভরণ ভাবের গভীরতায় রূপায়িত হইয়াছেন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কাব্যে উহাই রসিকজনের অন্তর রাষ্ট্রে ভাবালোকে উদ্ভাসিত হইযাছে অফুরন্ত সৌন্দর্য গৌরবে। কেহ কেহ বাংলার আদি কবি বলিয়া চণ্ডীদাসকে গৌরব দিয়াছেন। তিনি আদি হউন বা নাই হউন তিনি যে আদিরসের কবি এবং "আদ্য এব পরো রসঃ" বলিয়া যে শৃঙ্গার রসের মহিমা বৈষ্ণব সাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে সেই আদি রসের বিস্তার ইনি যে ভাবে করিয়াছেন উহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। শৃঙ্গার রসভাবনা চতুর বিলাসকলা বর্ণনাকুশল সরসরচনানিপুণ কোমল কান্ত পদাবলীর রচয়িতা গীতগোবিন্দ কবি জয়দেবের প্রভাব চণ্ডীদাসের কাব্যে কিছু যে না পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহার প্রমাণ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

চণ্ডীদাসের অনুভূতিগাঢ়তার বিশেষত্ব আছে। ইহার মধ্যে শরণাগতির ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কবি সর্বদাই যেন মহাশক্তির অনুপ্রেরণায় চালিত হইতেছেন। নিজস্ব কিছু তাহার বক্তব্য একথা তিনি ভুলিয়া থাকিতে চান। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার কাব্যের উৎসমুখ উৎসারিত "বাঁশুলীর আদেশে" একথাটি যেন তাহার কাব্যকে কোনো একটি উচ্চতর ভাবরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার এই শরণাগত ভাব ও ভক্তিরসিক ভক্তের মনকে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু যে তাঁহার কাব্য আস্বাদনে ভাবমগ্ন হইয়া থাকিতেন তাহার মূলেও বোধহয় ভক্তিভাবের প্রভাব।

প্রাচীনযুগের বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন। এই গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ আবিষ্কৃত না হইলেও ইহার গুরুত্ব সাহিত্যিকগণ সকলেই স্বীকার করেন। সঠিক কাল নিরূপণ করা কঠিন হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্বেই বিরচিত হইয়াছিল একথা বলা যায়। এই কাব্যে পরবর্ত্তী পদাবলীর বর্ণিত রাধাচরিত্র হইতে পৃথক বর্ণনা রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণনা তুলনীয়। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্‌বল্লভ মহোদয় খণ্ডিত অবস্থায় পাইয়াছিলেন আর বইএর নামও তাহারই দেওয়া। তবে যে যাহাই বলুক না কেন ইহা যে বড়ুচণ্ডীদাসের লেখা তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। তাছাড়া এই বই-এর মধ্যেই দানখণ্ড নৌকাখণ্ড (সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত) পাওয়া যায় ভাষাও যে অত্যন্ত প্রাচীন ইহাও নিঃসন্দেহ।

কালের ব্যবধান ভাবনার পার্থক্য সৃষ্টি করে। একটি সমাজে প্রচলিত ভাব ও ব্যবহার অন্য সমাজে সম্যক্‌রূপে গৃহীত হইতে পারে না। এমন কি বিরুদ্ধ বলিয়াও মনে হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব ও ভাষা সম্বন্ধেও এই কথা বিচারণীয়। ভাষায় প্রাচীনতা স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচকগণ সকলেই ইহাকে মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-

কালের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ভাবধারা এই গ্রন্থে দানখণ্ড বংশী খণ্ড বা নৌকাখণ্ডে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে শ্রীরাধা চন্দ্রাবলীর বড়াইএর যে চরিত্রাঙ্কন ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যে পরবর্ত্তী-কালের বর্ণনার সঙ্গে অনেক দিক্ দিয়াই ভিন্ন, তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। তথাপি এই গ্রন্থের একটা গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। রুচির পার্থক্যে বিষয়বস্তুর গ্রহণ বিচিত্রভাবে হয়। হাস্য পরিহাসও কালেকালে পরিবর্ত্তিত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলাকে যুগে যুগে সমালোচকগণ ও ভাবুকগণ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও করিবেন। যে প্রেম নিত্য-সত্য ব্যাপক সেই প্রেম আধার অনুসারেই গ্রহণ হয় এবং তাহার ব্যাখ্যাও যোগ্যতানুসারেই হয়। ঐতিহাসিক সাহিত্য বিচারক যেভাবে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীকে বিচার করেন ঠিক সেইভাবেই ভাবুকগণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এক সাহিত্য-সমালোচক কুরুচিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন, একজন ভাবুক ভক্তই আবার সেই কাব্যে অল্পস্বল্প প্রেমরসের সন্ধান পাইয়াও নিজেকে ধন্য বলিয়া অনুভব করিবেন। এই ভাবের ভূমির পার্থক্যহেতু দর্শন ও গ্রহণের বৈচিত্র্য। শ্রীমহাপ্রভু কোন্ দৃষ্টিকোণে চণ্ডীদাস কাব্যকে গ্রহণ করেন, সনাতন গোস্বামী কেন এই দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন ইহাই ভাবনার বিষয়। যে কাব্য আদ্যন্ত দেহসম্বন্ধ, আসক্তি, মিলনবাঞ্ছা, সম্ভোগ প্রভৃতির বর্ণনা সত্ত্বেও ভাগবত সম্বেদন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে উহাকে সাধারণ কাব্যকোঠায় ফেলিয়া বিচার করিলে অবিচারই করা হইবে। রাধাকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মবাদীগণ পরমাত্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব লইয়া বহুপ্রকার টানাটানি করিয়াছেন।

সাত্ত্বতগণ এ জাতীয় অধ্যাত্ম ব্যাখ্যায় মোটেই উৎসুক নহেন। তাহাদের চেতনা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধানটিকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বথা সচেষ্ট। তাই রাধাকৃষ্ণলীলায়

দেহ সম্বন্ধ ও প্রীতি সম্বন্ধকে তাহারা অনায়াসে একাকার করিয়া লইতে ইচ্ছুক। তাহাদের ভাবনা অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার দেহদেহী ভেদ নাই। আর কর্ম্মবন্ধনও নাই। তাঁহার শক্তি আনন্দিনী রাধা, তাঁহার ব্যবহারিক পরিচয় যাহাই হউক না কেন একা রাধা সর্ব্বসখীরূপা সহস্ররূপা অনন্তরূপা শ্রীকৃষ্ণের লীলা সুখাস্বাদন দানকারিণী। কাজেই সর্ব্বপ্রকার নিন্দা স্তুতির ঊর্ধ্বে সমবস্থিতা ভগবদ্ স্বরূপাভিন্না। নিত্যলীলার অনন্তবিলাসের রসে ভগবদ্‌ভক্তের মন সঞ্জীবিত। যে সমাজ ও পরিবেশে এই কাব্যগীতি উদ্‌ভূত হইযাছিল, উহা যে শ্রোতৃবর্গ ও রসিকজনের মনোমুকুরে সেই পরমানন্দ পুরুষোত্তমেরই মহিমামাধুরী প্রতিফলিত করিয়া সার্থক হইয়াছে তাহা বলিলে বোধ হয অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীদাসের প্রতি আদর বুদ্ধিই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পরবর্তী চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর রচনা শৈলীর দ্বিরূপতা, সহজীয়া আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, রহস্য সম্বলিত পদযোজনায চণ্ডীদাসের কাব্যে ত্রি-রূপতা নানাদিক্‌দিয়া সমালোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। চণ্ডীদাস বাঁশুলী, চণ্ডীদাস রামী, চণ্ডীদাস নান্নুর, চণ্ডীদাস দ্বিজ, চণ্ডীদাস অনন্ত রূপ আরো কতভাবে এক চণ্ডীদাস সম্বন্ধে দেশভেদ, কালভেদ, ব্যক্তিভেদ, কাব্যভেদ, ভাষাভেদ, লীলাভেদ ও তত্ত্বভেদ কতভেদ সৃষ্টি হইযাছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি 'চণ্ডীদাস' অথবা 'চণ্ডীদাস' উপাধির সঙ্গে যে এক মধুর কাব্যরস-চতুরতার স্মৃতি বিজড়িত হইয়া যুগের পর যুগ বৈষ্ণব ভাবনা ও লীলারস চমৎকৃতির উন্মেষ করিয়া দেয, উহা সাহিত্যিক বিচারকে অতিক্রম করিয়াই হৃদয় জয় করে। পাচশত বৎসরেরও প্রাচীন হস্তাক্ষরে যাহার নামাঙ্কিত সেই চণ্ডীদাস এবং আধুনিকতম যুগে সেই একই নামে চল্‌তি পদ একটি ভাবধারাকেই প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছে সামাজিকের মনে প্রাণে ইহা কি অসামান্য প্রতিভার প্রভাব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে না? রাজপুতানার

পল্লীতে মীরার ভজন সঙ্গীত গিরিধারীলালকে অবলম্বন করিয়া উৎসারিত হইয়াছিল প্রাণাবেগের চরম উৎকর্ষে। এই গানের ছন্দমধুর সুরলাবণ্যে অভিষিক্ত ভক্তপ্রাণ সঞ্জীবিত হইয়াছে হইতেছে। সেই গানের কত রূপ পরিবর্তন কত ভাষা বিপর্য্যয়, কত ব্যক্তি সেই মীরা-নামে স্বরচিত গান চালাইয়াছেন চালাইতেছেন। তথাপি উক্ত মীরা নামটি সিদ্ধ মহৌষধির ন্যায় সকলকেই ভক্তিরস প্রীতি উৎকণ্ঠায় অভিনব রূপ প্রদান করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত। উহাদের নাম যথা—(১) জন্মখণ্ড, (২) তাম্বুল, (৩) দান, (৪) নৌকা, (৫) ভার, (৬) ছত্র, (৭) বৃন্দাবন, (৮) কালিয়দমন, (৯) যমুনা, (১০) হার, (১১) বাণ, (১২) বংশী ও (১৩) রাধাবিরহ। পৌরাণিক ভিত্তিতে ভগবানের মর্ত্ত্যলোকে অবতার কথা জন্মখণ্ডের বিষয়। পরবর্তী রাগ, অনুরাগ, আসক্তি, সম্ভোগ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, ভ্রান্তি, মোহ, চৌর্য্য, বলপ্রয়োগ, বিহার, ভয়, দুঃখ, শোক, বিরহ, সব কিছুর মূলেই রহিয়াছেন দেবগণের প্রার্থিত ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ, বাসুদেব নন্দনন্দন ঃ বৈষ্ণবগণের ভাবনায়—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

মানবলীলার আবেশে ভগবান্ যে কিছু লীলা করেন এবং এই লীলায় যাহারা তাঁহার সঙ্গিনী অথবা সঙ্গী তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ শক্তির বিলাসবৈভব। তাঁহাদের লীলাকলায় লৌকিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে অনেক অসঙ্গতি দেখা গেলেও উহা ভক্তিরসিকের সমীপে অপার্থিব রাজ্যের মুগ্ধ মাধুরীর গন্ধ বহন করিয়া আনে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্যতম প্রয়োজন প্রেমদানলীলা। উহার মধ্যে যে কিছু নিন্দনীয় উহাই ভক্তিরসিকের সমীপে প্রশংসনীয়;

তুচ্ছও উচ্চ, অনাদরণীয়ও আদরণীয় হয়। বন্ধুর দৃষ্টি বন্ধুকে সুন্দর দেখে, প্রিয়ার দৃষ্টি প্রিয়কে নিত্যনব সুষমামণ্ডিত করে।

সমাজ, শিক্ষা ও পরিবেশ অনুসারেই কবির ভাবনা-প্রকর্ষ বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে। দেহসর্ব্বস্ব সাধারণ মানুষ দেহভাবনার বেড়াজাল ছিন্ন করিতে পারে না। পরমেশ্বর অজ অব্যয় নিখিলপ্রাণীর নিয়ন্তা হইয়াও আত্মমায়ায় দেহধারীর মতই লীলা করেন। সেই লীলাবর্ণনায় অতিরঞ্জনের কথা নাই। কবি মানসের কল্পনাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। অলৌকিক বিষয়ে প্রবেশ এবং বিচিত্র বর্ণনা বিন্যাস কাব্যের উৎকর্ষই সাধন করে।

শ্রীরাধার মুখে চণ্ডীদাস বলেন—

তোঙার আঙার দুইমনে।
এক করি গান্থিল মদনে॥

এই দুই মনে এক করিয়া গ্রন্থন ভাবনা অনাদি সিদ্ধপ্রেমের প্রতিধ্বনি।

বড়ায়ির মুখে রাধারূপ অতি মনোরম পদটি যথা—

কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উইল নব সুর॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চাঁদ দুঈ লাখ যোজনে॥
সুনি মন মোহিনীর মনী আনুপামা।
পদুমিনী আঙার নাতিনী রাধা নামা॥
ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বনমাঝে॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপকরে নীল উতপল॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে॥

কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
অভিমান পাঞা পাকা দাড়িম বিদরে॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনি চলয়ে বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

শ্রীরাধা অঙ্গ বর্ণনায় কবির মন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি ত্রিভুবনের সকল সুন্দরের সমাবেশ করিয়াছেন নব যৌবনের আঙ্গিনায়। সজল জলদের অন্ধকার ভেদ করিয়া নবারুণ প্রকাশ ঐশ্বর্য্য তিনি কৃষ্ণ কেশ পাশে সুন্দর সিঁন্দুরের মাধ্যমে দর্শন করেন। সোনার কমলকান্তি অকলঙ্ক বদন শশীর শোভাবৃত লজ্জাকুল চন্দ্র যেন অনেক দূরে থাকিয়াই সেই সুন্দর বদনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার শোভা মুনি মনোহারিণীগণেরও প্রশংসনীয়। অতুলনীয় পদ্মিনী আমার নাতিনী তাহার নাম রাধা। তমাল কলিকা শ্যামলতার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইলেও ললিত অলক পংক্তির কৃষ্ণকান্তি দেখিয়া সেই তমাল কলিকা বনান্তরেই আশ্রয় লইয়াছে। নয়ন কাজল রেখাঙ্কিত নীলকমল জলে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করে রাধা নেত্র শোভা পাওয়ার কামনায়। ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠ শঙ্খকে লজ্জিত করিয়াছে তাহাতেই সে সমুদ্র জলে প্রবেশ করিয়াছে। বক্ষের শোভা দেখিয়া অভিমান ভরে পক্কদাড়িম্ব বিদীর্ণ হইয়াছে। ক্ষীণ মধ্যদেশ মন্থর গতি রাজহংসকে জয় করিয়াছে তাহার গতি। কালিন্দীর কূলে গোঠে গোকুলে যে বাঁশী বাজিল, উহা শুধু রাধার শরীর মনকে আকুল ব্যাকুল করিয়াছে তাহা নয়, এই ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। এই ধ্বনিতে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। বংশী গৃহকর্ম্ম ভুলাইয়াছে—বাদকের খোঁজ

করাইয়াছে—তাহার দাসী করিয়া লইয়াছে। এই শব্দ শ্রবণে প্রবেশ করিয়া নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছে প্রাণমন হরণ করিয়াছে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাই লেঁা বান্ধন
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা
দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলো কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরানী॥

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত রসকীর্ত্তন পর্যায়ে যে সকল পদ সাধারণতঃ কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তন করেন ঐগুলি কিন্তু ভাষায় শ্রীকীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। এই জন্যই চণ্ডীদাস সমস্যা আজও যেমনকার তেমনি রহিয়াছে। পরবর্তী কোনো কবি যদি চণ্ডীদাস নামে স্বরচিত কবিতা চালাইয়া থাকেন তিনিও যে অসাধারণ প্রতিভাবান ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আবার যিনি এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনিই বা অপরের নামে কেন নিজের কবিতা চালাইতে যাইবেন ইহাও ভাবিয়া পাওয়া যায় না। তবেই বলিতে হয়, চণ্ডীদাস নামে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি ছিলেন। রাণী রজকিনীর উপাখ্যান পূর্ব্বতন অথবা পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের সঙ্গে যুক্তকরা যুক্তিযুক্ত তাহাও চিন্তনীয়। উক্ত উভয়বিধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং রসকীর্ত্তনে প্রচলিত ছাড়াও দেহতত্ত্ব ও সহজীয়া পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস কোথা হইতে উদ্ভূত হইলেন সে বিষয়টির সংশয় ছেদন করাও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণই যে প্রথমত শ্রীরাধার রূপের কথা বড়ায়ির

মুখে শুনিয়াছেন এবং মোহিত হইয়াছেন সে কথা বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কবিগণ শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করেন। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—

অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা॥
(পূর্ব্বরাগ প্রকরণ)

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি এই কারিকার ব্যাখ্যায় বিষয়টি পরিষ্কার করেন। মর্মার্থ এই, বয়ঃসন্ধির পূর্ব্ব পর্যন্ত মন নির্বিকারই থাকে। বয়ঃ-সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে ভাবের উদয় হয়, উহাই প্রথম বিক্রিয়া। এই প্রথম বিক্রিয়ার পরই স্ত্রীলোক পুরুষের পরস্পর অন্বেষণ চলিতে থাকে। তাহাতেও দেখা যায়, স্ত্রীজাতির লজ্জা ভয় ধৈর্য কুলাচার প্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকাহেতু পুরুষের প্রতি পূর্ব্বরাগ সহসা প্রকাশ পায় না। পুরুষের পূর্ব্বোক্ত আবরণ না থাকায় প্রথম বিক্রিয়ার পরই সহসা স্ত্রীলোকের অন্বেষণ হয়। এই ক্ষেত্রে মৃগনয়না স্ত্রীলোকের পূর্ব্বরাগ প্রথমত বর্ণনায় অধিকতর চারুতা। স্ত্রীহৃদয়ের প্রেমই অধিকতর বর্ণনার বিষয়। প্রেম তাহাদেরই লজ্জা প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া নিজের বিক্রম অভিব্যক্ত করে। অন্যত্র বলা হইয়াছে—

আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়ো বাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গিতৈঃ।

বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিই রস আর এই রসের আশ্রয় ভক্ত। ভক্তের পূর্ব্বরাগ হইতেই ভগবানের অনুরাগ উদয় হয়। ব্রজের গোপাঙ্গনাগণ ভক্তগণের মাথার মণি। তাহারাই ভক্তগণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব তাহাদের পূর্ব্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। ইহাই কেহ কেহ বলেন।

পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে এই রীতি অনুসারেই পূর্ব্বরাগ কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বরাগোদয়ে শ্রীরাধার যে অদ্ভুত বর্ণনা চণ্ডীদাস করিয়াছেন উহা প্রায়শঃ কীর্ত্তনীয়ার মুখে শুনা যায়।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই কেনবা এমন হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন কোথা বা কি দেবা পাইল।
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি ভূষণ খসায়া পড়ে ॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবতী বালা।
কিবা অভিলাষে বাড়য়ে লালসে না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয় ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ॥

প্রতিকূল আত্মীয়বর্গের ভয় এড়াইল কোন্ দেবতার আহ্বানে? রাধা সর্ব্বদা এমন চঞ্চল কেন? তাহার বস্ত্রাঞ্চল অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইলে উহা যথাস্থানে রাখিবার আগ্রহ নাই। থেকে থেকে চমকিত হইয়া উঠে গায়ের অলঙ্কার একবার খুলে আবার পরে। অল্প বয়স রাজার কন্যা কুলবধূ তাহার পক্ষে এরূপ লালসা বাড়িতে দেওয়া মোটেই ভাল নয়। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় চাঁদে হাত বাড়াইয়াছে দুর্লভ বস্তু পাইবার লালসা। চণ্ডীদাস অনুনয় করিয়া বলেন আর কিছু নয়, কৃষ্ণের প্রেমফাঁদে পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা বিশদভাবে আর একটি পদে বর্ণিত।

আগো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেমতি যোগিনী পারা ॥
আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী দেখয়ে খসায়া চুলি।

হসিত বদনে চাহে মেঘ পানে কি কহে দু বাহু তুলি
একদিঠি করি ময়ুর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরিখনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় কালিয়া বঁধূর সনে।

রাধার প্রাণের ব্যথা বুঝা যায় না। কাহারও কথা তাহার কানেই যায় না। সে একা নির্জনে বসিয়া থাকে যেন সর্বদা কাহার ধ্যানমগ্না। মেঘের দিকেই তাহার দৃষ্টি। আহারের প্রতি বৈরাগ্য যোগিনীর মত রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজের বেণীবন্ধ খুলিয়া কাল চুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আকাশের দিকে দুহাত তুলিয়া মেঘকে যেন কি বলিয়া সে হাসে, আবার একদৃষ্টে ময়ুর ময়ুরীর কণ্ঠের বর্ণ নিরীক্ষণ করে। চণ্ডীদাস বলেন, কৃষ্ণের নব পরিচয়েই এরূপ হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগও চণ্ডীদাসের পদে বিস্তৃতভাবেই দেখা যায়। একটি পদ প্রায়শঃ আমরা কীর্ত্তনীয়ার মুখেই শুনি। পদটি বর্ণনার চাতুর্যে একক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুবল সখার সমীপে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ, সুবল সাঙাতি, কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে, পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন আলাএণ দিয়াছে বেণী—।
উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে, সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্বতটাতে, পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, শরণ লইল আসি।
কিবা সে দুগুলী শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশি কলা।
সাঁজেতে উদয়, শুধু সুধাময় দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির মনমথ জ্বরে ভোর॥

কহে চণ্ডীদাসে বাঁশুলী আদেশে, শুনহে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা॥

নিরাবরণ নায়িকা দর্শনের যে পরিবেশটি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে কবি চণ্ডীদাসের ভাবনা পরিপাটির মাধুর্য্যটি লক্ষণীয়। সিক্ত নীলবসন অতিশয় স্নিগ্ধ আবরণে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি শোভা বর্ণনা অতুলনীয়। কেশদাম নয় অন্ধকার যেন কাঁদিয়া আকুল, তাহাতেই অশ্রুধারার মত জলধারা বিগলিত সুধাময় সেই চাঁদের কিরণে চারিদিক্ সমুদ্ভাসিত। তাহার নীলশাড়ী নিংড়ানো নয়, যেন প্রাণটিই নিংড়ানো হইল এমন কথা চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে ভাবিয়া পাই না।

কাঞ্চনকান্তিমন্থরগতি সুন্দরীর গমন সন্দর্শনে চিত্ত আন্দোলিত তাই নন্দনন্দন বলেন—

কাঞ্চন বরণী, কে বটে সে ধনী, ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে, নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন, নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি, মানস ভাবিয়া, ছুটিছে মরালকুল॥

সুন্দরীর প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুশলী স্রষ্টার রচনা চাতুর্য্য প্রকাশ করে। অতি শান্তমনে নির্জনে ভাবনার গভীরে এই রূপরেখাপাত হইয়াছে সুনিশ্চয় নতুবা এরূপ কোথা হইতে আসিল?

আঁখিতারা দুটি, বিরলে বসিয়া সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা, ছুটিতেছে নিরবধি॥

প্রতিটি অঙ্গেই শ্রীরাধার অফুরন্ত শোভার বিলাস বর্ণনায় ক্লান্তি নাই, উপমার তুলনার দৃষ্টান্তের অভাবতো কখনও ঘটে নাই। তাই আবার শুনি—

কিবা দন্তভাঁতি মুকুতার পাঁতি জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথায় সিঁন্দুর জিনিয়া অরুণ কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥

শ্রীফল-যুগল, জিনি কুচ যুগ পাতলা কাঁচলি তাহে
তাহার উপর মণিময় হার উপমা কহিব কাহে ॥

নায়িকার অঙ্গ বর্ণনায় নৈসর্গিক শোভার ভাণ্ডারে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য্য আহরণ সম্ভব উহারই উপযোগ তিনি প্রতিটি পদে করিয়াছেন। তিনি বলেন—

কেশরী জিনি, কৃশমাজাখানি, মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি, নিতম্ব বলনি, উরু করি-কর পারা ॥

কেশরীর কৃশমাজার সহিত তুলনার মধ্যে শুধু ক্ষীণ মধ্যদেশের শোভাই বুঝিতে হইবে অথবা ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যের কথাও ভাবনার বিষয় হইবে সেটি চিন্তনীয়। গজের কুম্ভ ও শুণ্ডের সহিত নিতম্ব ও উরুর তুলনা করিয়া কবি যে নিটোল অঙ্গশোভা বুঝাইতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। চরণ যুগলের সহিত কবি তুলনা করিয়াছেন কমলের, এই তুলনা খুবই প্রচলিত থাকিলেও উহার মধ্যেও বিশেষত্ব আবিষ্কার করিয়া কবি বলেন—

চরণ যুগল, জিনিয়া কমল, আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝুমন তাহে, কাহে না ভুলব, মদন মুরছা পায় ॥

শুধু কমল হইলে যেন মন ভুলিতনা "আলতা রঞ্জিত" হওয়াতেই ভুলিয়াছে আর ভুলিবে না কেন উহাতে যে মদনও মূর্চ্ছিত হয়। এই জন্যই ঔৎসুক্য ভরে কৃষ্ণ সখাকে জিজ্ঞাসা করেন—

কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য ফলে, বল বল সখা, সে রামা পাইল সে ॥

নায়কের ভাবনা বুঝি বা কোন গুণবান নায়ক পুণ্যফলে নায়িকাকে লাভ করিয়াছে। সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত কবি ভনিতায় বলেন—

চণ্ডীদাস বলে, ভেবনা ভেবনা, ওহে শ্যামগুণমণি।
তুমি যে তাহার, সরবস ধন, তোমারি আছে সে ধনী ॥

পদাবলী সাহিত্যে বর্ষাভিসার

আকাশ অন্ধকার। বর্ষা সমাগত। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন মেঘ। বিদ্যুৎ শোভা! গতি চঞ্চল। ধারাপাত শুরু হইল। পবন নিঃস্বন-শব্দ-ঝঙ্কার-মুখরিত গগন পবন। শ্রীরাধা-হৃদয় উৎকণ্ঠা পূর্ণ। সঙ্কেতকুঞ্জ গৃহ হইতে দূরে। মিলন পিয়াসী নাগর হয়তো কুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছেন! আমি যে গুরুজনের দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছি। কি করা যায়। উপায় দেখি না। পথে বিঘ্নও অনেক। রায়শেখর কবির কথায়—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পতন শবদ ঝনঝন পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥

এমন বর্ষায় কিভাবে বাহির হইব? অথচ না গেলেও যে নয়। আমাকে তো যাইতেই হইবে। একাকী শ্যাম-নাগর উৎকণ্ঠায় অবশ অঙ্গ হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এ কথা সহজেই অনুমেয়। আমাকে স্মরণ করিয়াই সে যে বিহ্বল হয়। স্থির থাকিতে পারেনা। বাতাস জোরে চলিয়াছে, যেন লাফ দিয়া যাইতেছে। আমারও মন বাতাসের আগে যাইতে প্রস্তুত।

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম-নাগর একলে কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু অথির থর থর কাঁপ।
মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥

গৃহে গুরুজন সতত সতর্কদৃষ্টি। ঘোর অন্ধকার এখন তাহাদের সেই দারুণ দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন আর অন্য বিচারে

প্রয়োজন নাই। শীঘ্র চল। আমার প্রাণ আগেই ছুটিয়া গিয়াছে। রায় শেখর বলেন—বিঘ্ন যতই থাকুক না কেন অভিসার কর।

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু আগুসার ॥
রায়শেখর বচনে অভিসর কিয়ে যে বিঘিনি বিথার ॥

শ্রীরাধার অভিসার উৎকণ্ঠা আরও অধিকতর প্রকাশিত শেখর-কবির নিম্নের পদটিতে। এখানে বর্ষার ধারা ও দশদিকে ঘন অন্ধকার বাধা সৃষ্টি না করে, এই আকূতি। তিনি বলেন—

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জল ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা ॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার ॥
অন্তরে শ্যাম চন্দ্র পরকাশ।
মনহিঁ মনোভব লেই নিজ পাশ ॥

আমার অন্তর পথে অন্ধকার নাই। সেখানে শ্যামচন্দ্র উদয় হইয়া পথ আলোকিত করিয়া দিয়াছেন। মনোরথ-সারথি কামদেব রথের রজ্জু হাতে লইয়া রথ চালাইতে প্রস্তুত। কিভাবে কানু সঙ্কেত কুঞ্জে কাল কাটায় তাহা ভাবিতে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। দামিনী অগ্নিবর্ষণের ন্যায় ঝলক দিতেছে। বজ্রপাত ধ্বনি কর্ণবিদারক। অথচ ঘরেও থাকা যায় না। এ সকল বিঘ্ন থাকিলেই বা কি হইবে ? মনের রথে চড়িয়া কামদেবকে সারথি করিয়া অনতিবিলম্বে নাগরের সমীপে মিলিত হইব। মনই আমার এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কবি বলেন—অভিসার কর।

কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান ॥

ঘরমাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার ॥
চড়ব মনোরথ সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম ॥
মনমাহা সাথী দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার ॥

বর্ষার অন্ধকার যে অত্যন্ত গভীর তাহা আরও একটি পদে বর্ণিত আছে। পদটি গোবিন্দদাসের। নববর্ষাসমাগমে এরূপ অন্ধকার হইয়াছে যে, নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। অপরকে দেখার কথা তো দূরে থাকুক। বাহিরে অন্ধকার সত্ত্বেও শ্রীরাধার অন্তরে শ্যামবর্ণ চন্দ্র উদয় হইল। মনোভব সিন্ধু এই চন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এখন আর অন্য কথা বিচারে প্রয়োজন নাই। নববর্ষা সমাগত—অতএব শুভক্ষণে প্রথম অভিসার হউক।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ
বাহিরে তিমির না হেরি নিজদেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু।
অব জনি সজনি করহ বিচার।
শুভখনে ভেল পহিল অভিসার ॥

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া যাইতে হইবে। অতএব সেইভাবে বেশ ধারণ করা প্রয়োজন। চম্পকবর্ণ অঙ্গের কান্তি আবরণ করিতে মৃগমদ কস্তুরীর কালি ভিন্ন আর উপায় কি? নীল শাড়ী পরিধান করিতে হইবে। বক্ষাবরণ কাঁচলির ভার বহন করিবার প্রয়োজন নাই। সতিনীর মত মুক্তার মালা দূর করিয়া দাও। ওলো সখি তুই একবার দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখ, দেখি গুরুজন সকলে ঘুমাইয়া

পড়িল, অথবা এখনও জাগিয়া আছে। পথে চালতে যেন দিক্‌ভ্রান্ত না হয়। গোবিন্দদাস পদকর্ত্তা কবি গোপনে গোপনে অভিসারিণীর সঙ্গে যাইতে প্রার্থনা করে।

মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল-নিচোল॥
কী ফল উচকুচ-কঞ্চুক ভার।
দূরে কর সোতিনী মোতিম হার॥
তুহু঳ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ্‌ ভরম জানি হোই।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোই॥

ব্যবস্থা হইল কিন্তু বড়ই সন্দেহ। সঙ্গী ভাবেন—কেমন করিয়া রাধার রূপ আবরণ করা সম্ভব? তাই তিনি শ্রীরাধাকে তাহার উপদেশ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীহরির সঙ্কেতে অভিসার করিবে, কিন্তু আমার কথামত চলিতে হইবে। তোমার নীলশাড়ীতে মুখমণ্ডল আবৃত করিতে হইবে। তোমার হাসির সঙ্গে শরৎ কালের বিমল চন্দ্রের শোভালোক ছড়াইয়া পড়ে। মুক্তার হার খুলিয়া রাখ। কিঙ্কিণী বন্ধন মুক্ত কর। নুপূরকে নিঃশব্দ করাও। পথে চলিতে কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজিয়া না উঠে। পুরবাসী কোনো শব্দমাত্রে চমকিত হইয়া উঠিবে। পথের অনুসরণে অন্ধকারে সন্দেহ হইতে পারে, গোবিন্দদাসকে সঙ্গে করিয়া চল, পথ দেখাইয়া দিবে।

কি করব মৃদমদ-লেপন তোর।
কি ফল পহিরণ নীল নিচোল॥
শারদ চাঁদনি তুয়া মুখ হাস।
বিঘটন তিমির হোয়ব পরকাশ।
এ ধনি ধরবি হামারি উপদেশ।

অব অভিসার হরিক সন্দেশ ॥
আঁচরে ঝাঁপব আনন-চন্দ।
দূরে কর মোতিম কিঙ্কিণী বন্ধ ॥
নূপূর মুখভরি ও নখপুঞ্জ।
মন্থর গতি চল কেলি নিকুঞ্জ ॥
চলইতে চঙকি নগর পুরমাঝ।
জনি মণি-কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ ॥
তিমিরে পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস সঙ্গে করি লেহ ॥

অভিসার সুযোগ সুবিধা মত দিবা অথবা রাত্রি যে কোনো সম হইতে পারে। বর্ষার দিনে দিবা-অভিসারেও সুযোগ মন্দ নয় দিবাভাগেও যখন ঘন মেঘে সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন কোনোদি এমনও হয়—যে দিন বা রাত্রির ভেদ ঘুচিয়া গেল। কাছের মানুষকে তখন লক্ষ্য করা যায় না। প্রতিটি গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ। সে অবসরেও অভিসার বর্ণনা করেন গোবিন্দদাস।

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই-লখই নাহি পার।
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গগন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥
চৌদিশে অথির পবন ভরু দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর হিলোল ॥
চলইতে গোরী নগর পুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥

যব ধনী কুঞ্জে মিলহ হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দ দাস ॥

কবি বর্ষাভিসার উপলক্ষে শ্রীরাধা ও সখীর উক্তি প্রত্যুক্তি অতি নিপুণভাবে বলেন। পথে কাদা ইহাই শুধু রাধার বাধা নয়। বাধা অনেক আছে। প্রথমতঃ গৃহের সদর দরজা। সেটা অতিক্রম করা কঠিন। দ্বারটিও কঠিন। পথে চলিতে শঙ্কা। কোথায় পা পড়ে স্থিরতা নাই। কর্দমাক্ত পথ দুর্লক্ষ্য। বর্ষাও এমন যে কোনো দিকে আর ফাঁক নাই। মুষলধারে জলবর্ষণ। জলকে বাধা দেওয়ার মত ছত্রাদির অভাব। মানস-গঙ্গার তীরে যেখানে নাগর-চূড়ামণি রহিয়াছেন উহা নিকটবর্ত্তী স্থান নয়। শব্দ সহ ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। কানে তালা লাগিবার উপক্রম। বিদ্যুতের প্রভা চারিদিকে। চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এই সব বাধা না মানিয়া ঘরের বাহির হওয়ার অর্থ নিজের দেহকে উপেক্ষা করা। প্রেম কি দেহ রক্ষার চাইতেও বড় হইল? শঙ্কার উত্তর কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি বলেন—ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার। সম্পূর্ণ পদটি এই—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহি অতি দুরতর বাদলদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥

ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহে ইতে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥

জল কাদায় অন্ধকারে পথে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুতি চলিয়াছে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীবাক্যে সেই সংবাদ পাওয়া যায়। শ্রীরাধা কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথে কেমন করিয়া শীঘ্র গতিতে চলিয়া যাইবেন তাহার অভ্যাস করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কণ্টক ফেলিয়া কলসী জল ঢালিয়া কর্দ্দমাক্ত পথে আঙ্গুলে ভর করিয়া কোমল কমল চরণে শ্রীরাধা চলিয়াছেন। হে সুন্দর শ্যাম, অন্ধকারে অনায়াসে চলিবার জন্য কখনো কখনো চক্ষু বুজিয়া আবার নিজে হাতে চক্ষু চাপিয়া রাত্রি কালে অপর সকলে নিদ্রিত সেই সময় তিনি অভ্যাস করিয়াছেন। অঙ্গের কোনো অলঙ্কারের ধ্বনি না হয় সে জন্যও সাবধানতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি সাপের ওঝাদের নিজের হাতের কঙ্কণ প্রদান করিয়া সাপগুলি বশীভূত করবার মন্ত্রতন্ত্রও শিখিয়া লইয়াছেন। যে যাহাই বলুক না কেন গুরুজন পরিজনের কথায় কান দেন না, এমন কি তাহাদের কথা শুনিয়া যেন কিছুই বুঝিতেছেন না, এমন ভঙ্গী করিয়া অবোধের মত শুধু হাসেন। গোবিন্দ দাসের বাণী—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি,
গাগরী বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জানি ॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন শিখই ভুজগগুরু পাশে ॥

গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

শ্রীরাধা কি ভাবে ভয়কে জয় করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সখী বলেন, এই রাধা একদিন একটি সাপ দেখিলে ভীতচিত্তে চমকিত হইয়া কম্পিত হইত। এখন অন্ধকারে নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া চলে, সাপের মাথার মণি ঝিকমিক্ করিয়া উঠিলে নির্ভয়ে সেই মণির দীপ্তি বন্ধ করিবার জন্য রাধা সাপের মাথায় হস্তার্পণ করেন। অনুরাগে রাধাকে অবশ করিয়াছে। সে যে বাঁচিয়া আছে ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে। স্থল কমল হইতেও অধিকতর সুকোমল শ্রীরাধার চরণতল, উহা ভূমি স্পর্শে চমকিত হইয়া উঠে, আর এখন কণ্টকময় সঙ্কটাকুল পথেও সেই রাধা নির্ভয়ে গমনাগমন করে। নিজের গৃহ হইতে কখনও যে বাহিরে যাইত না, সন্ধ্যা হইলে দ্বারটিকে দূর পথ বলিয়া মনে করিত, এখন অন্ধকার অমাবস্যা রজনীতেও একাকিনী সে পথে চলিয়া যায়।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই করদেই ফণি-মণি ঝাঁপ ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী জীবই বহু পুণভাগ।
যো পদতল থলকমল সুকোমল ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহিঁ আওত যাওত নিঃশঙ্ক ॥
মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

পথের বাধা কোনো ক্ষেত্রেই শ্রীরাধাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। নিঃশঙ্ক হৃদয়ে রাধা সখীর বাক্যের উত্তরে যাহা বলেন গোবিন্দ দাস তাহার প্রতিধ্বনি করেন। নিম্নের পদটি আস্বাদন করুন—

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরেনুঁ তাহে কি তটিনি অগাধা॥

সজনি, মঝু পরীখণ কর দূর।

কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ তাহে কি বজরক আগি॥

যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলুঁ তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর সহচরী পাওল বোধ॥

সখী মন্দিরের বাহিরে কঠিন কপাটের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারই উত্তরে রাধা বলেন, কুলবতী নারীর কুলমর্য্যাদার সঙ্গে তুলনা করিলে কাঠের কপাটের বাধা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। মর্য্যাদার বাধা যখন অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছি, কাঠের কপাট আর আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না সখী। আত্মমর্য্যাদা সাগরের মত অপার, সেই অপার সমুদ্র পার হইয়াছি, সাধারণ নদী আমাকে বাধা দিবে কেমন করিয়া বলতো? আমায় আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। আমার মন কাঁদিয়া মরিতেছে। শুধু আমি ভাবি—কেমন হৃদয় লইয়া কৃষ্ণ আকুলভাবে পথের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমার উপর কোটি কুসুমশর বর্ষিত হইতেছে, কাজেই মেঘের জল বর্ষণ আমার মোটেই বাধক নয়। আমার হৃদয়ে যে সতত প্রেমের আগুন তাপ সঞ্চার করিতেছে, বজ্রের অগ্নিতাপ আমার কি করিবে? আমি যে সুন্দর শ্যামের চরণতলে আমার জীবনটিই সমর্পণ করিয়াছি, আমার দেহ থাকুক বা না থাকুক উহা আমার সমীপে অতি তুচ্ছ কথা। সখী বুঝিলেন রাধাকে বাধা দেওয়া যাইবে না। গোবিন্দদাস বলেন—রাধে, তুমি যথেচ্ছ অভিসার কর।

চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড় কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ।
উচইতে চাহে জল-ধারক এহ॥
ঐছন মিলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ॥

অন্যত্র এই অবস্থাটির বর্ণনা, যথা—
যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার॥

ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে অধিক পরিমাণে জল বর্ষণ হইতে লাগিল। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। উহা কি আর হাত দিয়া ঠেলিয়া দূর করা সম্ভব ? পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল মদন নিজেই, পাছে দিগ্‌ ভ্রম হয় এই নিমিত্ত।

কর চলন নহে ঘন আঁধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥

গোবিন্দ দাস কবি সখীমুখে বলেন—
কি কহব মাধব পুণ ফল তোরি।
এতহু দূর তরি তোহে মিলু গোরী॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘন মহীপঙ্ক॥

পথের কাদায় চরণ স্খলিত হইলে দাঁড়াইতে যাইয়া উদ্যত-ফণ সর্পকে মণির কিরণে স্বর্ণদণ্ড ভ্রম করিয়া উহাই ধরিতে যান। প্রাণের কোনো ভয় নাই। এইভাবে শ্রীরাধা অভিসার করেন।

উচইতে ফণি মণি উজোর হেরি।
কনক দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছন সোপলুঁ তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দ দাস ভরম দূরে গেল॥

বর্ষাহর্ষ

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রসলোলুপ ভক্তের নয়নে অবিরল ধারা, বিরহ তার স্বাভাবিক আস্বাদ্য। দিনের পর দিন কাতরতার মধ্য দিয়াই তার জীবনস্রোত প্রবাহিত। দিন যামিনী আকুল উৎকণ্ঠায় সংসার সুখ তার মহাশূন্যতায় পরিণত। জীবনে রসের উৎস তার গৌরস্মৃতি, নব নব ভাবে মাধুরীর অনুভব। অমৃত ও বিষ দিয়া এই অনুভূতির মধুরতা ও তীব্রতা প্রকাশ করলেও তাহার প্রাণের অনির্ব্বচনীয় আকুতি চিরকালই এক প্রকার। সে বলে—

অব জেঠ মাহ ইহ আই
পহুঁ সঙ্গ যদি নাহি পাই।
হাম কৈছে রাখব দেহ
সখি বিছুরি সো পহুঁ লেহ ॥

এই বসন্তের পর দারুণ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড তাপ সকলকেই তাপিত করেছে তার উপর গৌর-বিরহ তাপ। স্থলকমল হতেও সুকোমল যে চরণ যুগল ভয়ে ভয়ে হৃদয়ে ধারণ যোগ্য সেই চরণে ভূমির তাপ ও কণ্টক না জানি কতই ব্যথা দিতেছে! হায় গৌরসুন্দর, তুমি কোথায় কোন্ দেশে ঘুরিয়া বেড়াচ্ছ? কখনও নদীয়া, কখনোও পুরুষোত্তম, কখনও শ্রীবৃন্দাবনধামের উত্তপ্ত ভূমিতে ছুটাছুটি কার আকর্ষণে? কোন্ প্রেম তোমাকে পাগল করে দেশ-বিদেশে এমন গ্রীষ্মের দিনেও বহণ করছে? কোথায় নদীয়া, কোথায় দক্ষিণ দেশ! চাতুর্ম্মাস্য দিনগুলি কি নদীয়ায় নিজের ঘরেই যাপন করতে পারতে না, তবে কেন গ্রীষ্মতাপের সহিত তোমার দাস-দাসীর অন্তর তাপ বৃদ্ধি করেছ? বন উপবনে অসহ্য তাপের প্রখরতায় পশু-

পক্ষী দূরে পলায়ন করেছে, আম্র পনস প্রভৃতি রসাল ফল পরিপক্ক হয়েছে এই তাপে। মাঝে মাঝে কোকিল কুহু কুহু ধ্বনিতে বিরহ তপ্ত কর্ণে বজ্রপাত কচ্ছে॥ প্রাণ সেই ধ্বনিতে গৌরাঙ্গ দর্শনে অনির্ব্বচনীয় ভাবে দোল খেয়ে উঠে। মনে হয়, অতি অল্পকালের নিমিত্তও সেই নিদাঘ কালের প্রখর তাপের সময় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ সেবা সৌভাগ্য লাভ করবার অবসরে জীবন ধন্য হয়, অপূর্ণ অন্তর পূর্ণ হয়। ভ্রমর-গুলি মধুর আস্বাদ জানে তাই বিকশিত কমলের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুপান করে আর গুন গুন স্বরে গুণমুগ্ধ তারা ফুলের মহিম গান করে। হায়, আমরা কি ঐ বৃত্তি অনুসরণ করে গৌরাঙ্গ-মুখ-কমল মধুপান করে আনন্দ নৃত্য করে তাঁর গুণগান কর্ত্তে পার্ব্ব? দিনে দিনে অন্তর অধিকতর আকুল হয়ে উঠ্‌ল। পৃথিবীর বুক যেন শিহরিত হয়ে উঠল? তরুলতা চারিদিকে শাখা, পল্লব ছড়িয়ে কার আগমন প্রতীক্ষা করছে। বুঝেছি আকাশে আষাঢ়ের নব-জলধর দেখা দিয়েছে।

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহিণী বেদন বাঢ়॥

নব মেঘোদয় দর্শন করে চাতক ছটফট করছে। বিরহ বেদনায় গৌর প্রেমিকও পাগল হয়েছে। বিদেশ হতে বর্ষার প্রারম্ভে প্রবাসী সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করে। এ সময়েও গৌরসুন্দর ঘরের কথা ভুলে রইলেন। এমন বিরহে কতকাল প্রাণ বাঁচে? হে গৌর, তুমি কি অন্তরের ভাব বুঝে প্রেমামৃত বর্ষণ করবে না? বাহিরে পৃথিবীর বুক জুড়ানো নববারিদ বর্ষণ সুরু হয়েছে। আতপ তাপিত ধরণীর বুক শীতল হয়েছে, তরুলতা জীবন পেয়েছে, নবকুসুম শোভায় বৃক্ষ আনন্দ-মূর্ত্তি ধারণ করেছে, আর তোমার সেবক তার অন্তরে অনাদি বিরহ তাপ সে কি চিরকালই থাকবে? রসামৃত বর্ষণে কি তাকে নব জীবন দান করবে না, হে প্রেমামৃত বর্ষণশীল গৌরাঙ্গ বারিদ, বিন্দুমাত্র বর্ষণ

করেও ভক্ত চাতকের শুষ্ককণ্ঠ তৃপ্তির সুখানুভবে কৃতার্থ কর। হে চিরানন্দপ্রদ চৈতন্য মেঘ, কৃপাবন্যায় নিখিল বিশ্ব প্লাবিত করেও কেন এই চাতকের প্রতি অকরুণ? জীবন দান কর। এমন এক জীবন ধারার সঙ্গে আমার যোগ ঘটিয়ে দাও যেন কোনকালে আর বিচ্ছিন্ন না হয়। যেন প্রতি পদে ভঙ্গ যোগের সংশয় অফুরন্ত জীবন প্রবাহকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়। নিত্য তোমার স্মৃতির অমৃত স্পর্শে আনন্দময় অমর জীবনের মধ্যে ডুবে থাকি। নব মেঘ দর্শনে তোমার অন্তরে যে প্রেমময়ীর প্রেমস্মৃতি উচ্ছলিত হয়ে উঠে তোমার চরণ-তলার পাশে থেকে যেন তার বিন্দুমাত্র স্পর্শেও ধন্য হতে পারি।

সুভগ-শাঙন বরিখে ভাঙ্গন
বুন্দ সুন্দর নহি নহি।
বদত মোর চাতক চকোর
কীর কোয়েল অগণনি।
রটত দরদা তোয়ে দাদুর
অম্বুদাম্বরে গরজান॥

কি সুন্দর এই শ্রাবণ মাস। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মিলনের এই শুভ অবসর ঘুটঘুটে কালো মেঘে সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে। রিমি-ঝিমি বারিধার বর্ষণ হচ্ছে। কালো মেঘ দেখে ময়ূর কেও কেও করে ডাক-হাঁক জুড়ে দিয়েছে। কাকে দেখবার আশায় তারা সহস্র নেত্র বিস্তারের মত পুচ্ছগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক করে কাকে খুঁজছে। চাতক-চকোর শুকসারী কোয়েল আরও কত পাখী কার যেন আগমনের সাড়া পেয়ে ডেকে উঠ্‌ল। আকাশে মেঘের গর্জ্জন, জলে ভেকের কলরব। থেকে থেকে চপলার চপল আলোক। ধরণী শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত। শ্যামল বৃক্ষবল্লরীর কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। আজ বৃন্দাবনের বনভূমির নিরুপম সুষমা। সর্ব্বদিকে অন্ধকার কালিন্দীর জলকে আরো কালো করে তুলেছে। যে দিকে তাকাই শুধু কালোরই

রাজত্ব। যমুনার পুলিনে সকলের আগে ময়ূরগুলো নৃত্য করতে সুরু করেছে আর তাদের ধ্বনি শুনে অন্ধকার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কোকিলগুলো। ময়ূর বলে কেও—আর কোকিল বলে কুও, এদের ডাকাডাকি শুনে কালো ভ্রমরগুলোও ছুটে এল আর সঙ্গে সঙ্গে যেখানকার যত পাখী শুকশারী, চন্দনা, ভীমরাজ, বুলবুল, শ্যামা, দোয়েল কেউ বাকী রইল না তারা যমুনার পুঁলিনে এসে যেদিকটায় বর্ষা হর্ষদ কুঞ্জ সেদিকটায় আসর জমিয়ে বস্‌ল। তাদের কাছে বর্ষদ বর্ষার আবির্ভাব হয়েছে। এমন সময় করে বেণু কাল কানু সহচর সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখনকার ভঙ্গীটি বৈষ্ণব কবির ভাষায়ই শুনুন—

মুদির মরকত মধুর মুরতি
মুগধ মোহন ছাঁদে।
মল্লী মালতী মালে মধুকর
মত্ত মনমথ ফাঁদে॥
শ্যাম সুন্দর সুঘড় শেখর
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমরস
সতত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চিতচোরক ভাঁতি॥

লীলাময়ের মনে বর্ষার হর্ষ জেগেছে। ব্রজবাসীর মনোচোরা আজ বংশীবটের মূলে বসেছেন সখাদের সঙ্গে কত কি রঙ্গরস করে "ভাই তবে তোমরা ঘরে যাও আমি খানিকবাদে যাবো।" সখাদের যাওয়ার পরই কালো কানুমোহন বেণুটিকে হাতে করে ব্রজনাগরীর আকর্ষণী-

রাগিণী বাজাতে লাগ্‌লেন। যে কুলনাশা বাঁশী একবার বাজালে তো আর রক্ষা নেই। শ্রীরাধা আর তার সখীদের যে যেখানে ছিলেন বাঁশীর সুরলক্ষ্য করে আনমনা হয়ে ছুটলেন যমুনার ঘাটে। অভিসারে আসবার কিছু না কিছু বাধা ঘটেই। আজ বর্ষার দিনে ভারি সুবিধা হয়েছে। দিনের বেলাতেও আর কোন বাধা নেই। আজ এমন অন্ধকার কে কার খোঁজ নেয়।

গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়াই কোই লখই নাহি পার॥
চৌদিকে অথির পবন তরু দোল।
জগভরি শীকর নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরী নগরপুর বাট
মন্দিরে মঁন্দিরে লাগল কবাট

শ্যামসোহাগিনী ভানুনন্দিনীর কতই না শোভা। সে অনুরাগিণীর কথা গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন—

শরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন
খণ্ডন বদন বিকাশ
অধরে মিলায়ত শ্যাম মনোহর
চিত চোরায়নি হাস॥
আজু বনি শ্যাম নব বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু য়ূথশত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই॥
কবরি বকুল ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি

কিঙ্কিনি রনরণি বোল
পদ পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ
নীছনি গোবিন্দ দাস ॥

এই অপরূপ রূপরাশি লয়ে কিশোরী বংশীধারীর পাশে দাঁড়াতে কেমন হলো ? বৃন্দাবনে যমুনার পুলিনে বংশীবটের নিকটে আবির্ভূত হলেন। কারণ—

ও নবজলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ।
ও বর মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশবান ॥
ও মত্ত মধুকর রাজ। ইহ নব পদ্মিনী সাজ ॥
ও নব তরুণ তমাল। ইহ হেম যূথী রসাল।

পৌর্ণমাসী আগে থেকেই বর্ষাহর্ষদ কুঞ্জে সুন্দর দোলা তৈরী করে রেখেছেন—বৃন্দার অভ্যর্থনায় রাধাকৃষ্ণ রসালাপ করে করে সেইদিকে এলেন।

মন্দং মন্দং বৃন্দয়োদ্দিষ্ট মিষ্টং
বর্ত্মাশ্রিত্য স্বশ্রিয়া রজ্যমানম্
যান্তৌ নর্ম্মোদন্তরঙ্গৈররণ্যং
বর্ষা হর্ষাভিখ্যমাপ্তাবভাতাম্।

তখনকার সৌন্দর্য্য দেখে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, মেঘ স্পর্দ্ধা করে গর্জন করে উঠল, কিন্তু শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর শোভায় পরাজয় স্বীকার করে তখনই দুঃখে কেঁদে কেঁদে অশ্রুধারা বর্ষণ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

বিশ্বনাথ বলছেন—

নোপর্য্যাবামেতয়োঃ স্থাতুমহে´।
যাবো বা ক্ব ব্যোম সর্ব্বং নিরুদ্ধম্।

এতদ্বাসৈবেতি কম্পেরভূতাং
সত্ত্বঃ পাণ্ডুভূয় চিক্রিন্দিষু তৌ ॥

যে দোলটির কাছে এসে দুজনে দাঁড়ালেন সেটি কেমন—

গজদন্ত বিরচিত সুবর্ণ খচিত।
নীলপীত রক্তসিত মণিতে জড়িত ॥
সুকোমল তূলি তাহে দিব্য উপাধান।
ফুলের ঝালর আর ফুলের বিতান ॥

বৃক্ষশাখা পট্টডোরীতে টাঙ্গানো এই রত্নহিন্দোল। কতগুলি বাজন্ত ঘুঙুর তাতে বাঁধা রয়েছে। শ্রীরাধাপ্রিয় সখীগণ বল্লেন—কানাই আর কেন, এই দোলায় তুমি আরোহণ কর আর আমরা তোমায় দোলায়ে দেখি কেমন দেখায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন ও তা কি হয়, আমি একা ওতে চেপে কিছু শোভা নেই, তোমাদের সঙ্গিনী ওই কিশোরী যদি সঙ্গে থাকেন তো আমাকে যা বলবে তাতেই রাজী। এ কথায় শ্রীরাধা একটু কেমনতর করে মুখ-খানাকে ভার করে বল্লেন—ইস্ নিলাজ কানাই, ওকথা বলতে কি তোমার একটু সঙ্কোচও হল না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো কেন ? আমি যে পরের রমণী। শ্রীকৃষ্ণ হেসে হেসে বলছেন সুন্দরী, এ আবার কেমন কথা, তোমরা যে পরের রমণী এ কথাতো আমি স্বপ্নেও জানিনা। পর-নারী বলে জানলে আমি তার সঙ্গে পিরিতিই করি না। আমাকে যারা আপনার বলে জানে তাদের সঙ্গেই আমার পিরিত। শ্যামের কথায় সকলেই হেসে উঠলেন—বাঃ রে, এ আবার কেমন কথা আমরা বুঝি তাহলে কৃষ্ণকে খুব আপনার বলে জানি। ললিতা একটু মুখ নাড়া দিয়ে বললেন—বলি হাঁগা, ওই গোপনারীদের সঙ্গে তোমার বুঝি স্বপ্নে স্বপ্নেই বিয়ে হয়েছিল। তাই বুঝি এরা তোমার আপন নারী। ললিতার কথায় শ্রীকৃষ্ণ একটু থতমত খেয়ে গেলেন। শ্রীরাধিকা তখন সুবিধা পেয়ে পরিহাসের সুরে বল্লেন—

সখি মোরা তবে কেন থাকি অন্য ঠাঁই—
চল চল ব্রজরাজ ভবনেতে যাই
রাজা রাজরাণী হবে শ্বশুরশাশুড়ী।
আদর হইবে কত ব্রজের ভিতরি ॥

বিশাখা হাসির মাত্রাটা আরও একটু বাড়িয়ে বল্লেন—রাধে সেখানে যাওয়া অমনি নয়। সেখানে গেলে কি হবে জানিস, এই শ্যামের শয্যাতেই তোকে শুতে হবে। তাতে তোর অভ্যাস নেই—পেরে উঠ্‌বিনি। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় এই দোলার উপর চেপে বোস না ভাই। শ্রীরাধাও কম রসিকা নন। তিনিও হাসির রাশি ছড়িয়ে বলে উঠ্‌লেন, বেশ লো বেশ তাই ভাল সই তাই ভাল—তা একটি কাজ কর ভাই, তোতে আমাতে তো আর ভেদ নাই? তা তুই গিয়ে আমার হয়ে দোলায় চেপে বোস্। তোর চাপাতেই আমার চাপা হয়ে যাবে এখন। বিশাখা দেখলেন বেজায় বেগতিক। রাধার সঙ্গে কথায় পারা ভার। তিনি চতুর কানাইকে এক ইঙ্গিত কল্লেন আর তিনিও কিশোরীকে কোলে কর দোলার উপর চেপে বসলেন। তখন—

নব ঘন কানন শোহনকুঞ্জ। বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। শারীশুক পিক গাওয়ে রসাল ॥
তহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল। তাপর বৈঠলি কিশোরী কিশোর ॥
ব্রজরমণীগণ দেওত ঝকোর। গিরত জানি ধনী করতহি কোর ॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দ দাস তহি দেখত রঙ্গ ॥

সখীগণ দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে দোলায় দোল দিতে দিতে ঝুলনের গান ধরলেন। তাদের আনন্দ তখন অসীম। সহচরী সব দু'দিকে দাঁড়িয়ে দোলা দেন ক্রমে ক্রমে।

গতায়াত করে দোলা বারে বারে
দেখি চমৎকার লাগে।
যেন সুরঞ্জিত সুন্দর তরণী
জলধি তরঙ্গ বেগে।
দোলাতে আছয়ে যাবত কিঙ্কিণী
রুনুঝুনু করি বাজে।
যে রব শুনিয়া সারস সকল
পড়ে অতিশয় লাজে ॥

আকাশে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশ হচ্ছিল, মেঘেরও গর্জ্জন ঘন ঘন বৃক্ষগুলিকে কাঁপিয়ে তুললো।

চপলার চক্‌ক জলধরের কড়কড়া বিদ্যুদ্বরণী রাধারাণী ভয়ে প্রসারিত করে শ্যাম জলধরকে জড়িয়ে ধরলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন মেঘ থাকহ কুশলে।
কখনো যা পাই নাই তাহা তুমি দিলে ॥
সখী সব কৃষ্ণকোলে কিশোরী দেখিয়া
কহিতে লাগিল অতি সুখিত হইয়া ॥
একি আমাদের আজি মঙ্গল বাসর
প্রসন্ন হইয়াছে বুঝি যাবত অমর ॥
নিরবধি যাহা দেখিবারে সাধ করি।
কিন্তু তাহা সিদ্ধ নাহি করে সহচরী ॥
আজিতো মেঘেতে তাহা সিদ্ধ করি দিল।
দেখিয়া নয়ন মন সব জুড়াইল ॥
একি বেড়িয়াছে মেঘে স্থির সৌদামিনী।
অথবা তমাল তরুমাধবী কাঞ্চনী ॥

হিন্দোলা দোলাও সবে অধিক করিয়া।
হেনই থাকুক রাই ত্রাসিত হইয়া॥
দেখি দেখি আমাদের জুড়াকু নয়ন।
জনম সফল করু এ রঘুনন্দন॥

সখীগণ মহানন্দ মনে ঘন ঘন হিন্দোলা দোলাতে লাগ্‌লেন আর সেই আনন্দ ঘন যুগল-মিলন দেখ্‌তে লাগলেন। এস এস ভাই, আমরা মানস নয়নে ভাবনিধি গৌরাঙ্গের অনুগত হয়ে ঝুলনের যুগল মিলন দেখে নয়ন জনম সফল করি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অলংকার বিন্যাস

অলঙ্কার কথার সঙ্গে সুগম পরিচয় অঙ্গের ভূষণরূপে। সাহিতে অলঙ্কার স্বর্ণাদি নির্মিত পদ্মরাগাদি মণিখচিত নয়, ভাষার অলঙ্কার ভাষার দ্বারাই বিলসিত—আর তাহাতে বার বার একটি কথা ব্যবহার করিয়া বা কোনো কিছুর সঙ্গে উপমা দিয়া বা তুলনা করিয়া কখনো সন্দেহ, কখনও অধিকগুণ বলিয়া, কখনও পরিণাম ফল বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখাইয়া আরও কতভাবে যে পণ্ডিতগণ ভাষাবাণীকে সুমণ্ডিত অলংকৃত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করিবার সামর্থ্য নাই। প্রণ বনাদ-ব্রহ্ম হইতে নিখিল ধ্বনাত্মক জগতের আবির্ভাব। ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। তাই "অলঙ্কার কৌস্তুভ" কাব্যপুরুষের শরীরাদি বর্ণনা করিয়া বলেন—

শরীরং শব্দার্থৌ ধ্বনিরসব আত্মা কিল রসো
গুণামাধুর্যাদ্যা উপমিতিমুখোঽলঙ্কৃতি গণঃ।
সুসংস্থানং রীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো
যদাস্মিন্ দোষঃ স্যাচ্ছ্র বণকটুতাদিঃ স ন পরঃ॥

শব্দ ও অর্থচমৎকারিত্ব লইয়া কাব্যপুরুষের সুগঠিত শরীর। এই শরীরে প্রাণ ধ্বনি। রস আত্মা। কাব্যনিষ্ঠ মাধুরী গুণ। উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার। সুসংস্থিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতেছে গৌড়ী প্রভৃতি ভাষার রীতি। সুলক্ষণ কাব্যপুরুষের শ্রবণকটুতাদি ক্ষুদ্র দোষ, দোষের মধ্যে না ধরিলেও চলে।

সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় উহাতেও যথাস্থানে শব্দ ও অর্থচমৎকারিত্ব রহিয়াছে এবং কাব্যপুরুষের অলঙ্কারাদির মত প্রতিটি কথার অলংকার আছে। এই অংলকার

চয়ন বেদ ও উপনিষৎ কাননে নিত্য নবায়মান আনন্দবোধের সহায়ক। মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ও পুরাণসংহিতয় সুপ্রচুর অলংকার বিন্যাসে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় মনীষার চমৎকৃতিপূর্ণ সাংখ্য যোগাদি দর্শনের আচার্য্যগণ—এমন কি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি, অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য, কামসূত্রকার বাৎস্যায়নমুনি প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থরচনায় বিষয়-বিশেষ বর্ণন কৌশলে অলংকার ব্যবহার করিয়াছেন নির্বাধরূপে। সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্য ও পুরাণে সর্বত্র অলংকার প্রয়োগ প্রাচুর্য। অল্প কথায় যিনি সংস্কৃতে কিছু বলেন বা লিপিবদ্ধ করেন উহা শারীরবিজ্ঞান, বাস্তুবিজ্ঞান, ইতিহাস-কথা বা উপকথা যাহাই হউক না কেন, অলঙ্কার ভিন্ন কিছুই হইবার নয়।

যাঁহার একপাদ বিভূতি বিশ্বভুবন, ত্রিপাদ যাঁহার অমৃতময়, সেই পরমপুরুষ বিরাট্ ভগবান্ বিষ্ণুর মহিমা বেদ, উপনিষদ্, পঞ্চরাত্র, ভাগবত যেখানেই বর্ণিত হইয়াছে অলংকার যে সেখানে প্রধানস্থান গ্রহণ করিয়াছে উহা আর বলিতে হইবে না। অব্যক্ত অনন্ত বিরাট্ বিভু ব্যক্ত সান্ত প্রিয় প্রভু। তাঁহাকে প্রীতির বিষয় করা যে অলঙ্কারের সার্থকতা, তাহা বেশ উপলব্ধি হয় বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনায়।

মহাকবি কেহ উপমাদি অলংকারের গৌরবে, কেহ বা শব্দার্থের চমৎকৃতিতে, আর কেহ বা পদলালিত্যে স্মৃতির কোঠায় চিরদিনের জন্য স্থান করিয়া লইয়াছেন। প্রাকৃতনায়কনিষ্ঠ কাব্যের চমৎকৃতিও ব্রহ্মানন্দ সহোদর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের উপজীব্য অপ্রাকৃত রসঘন পরব্রহ্ম। কাজেই এই সাহিত্য স্বকীয় রস-চমৎকৃতিতে যে আপামর সর্ব্বজনের হৃদয়গ্রাহী হইয়া বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিষ্ণু-বৈষ্ণবাশ্রিত পারমার্থিক-রসপরিপুষ্ট অগণিত কাব্যনাটকাদি অলঙ্কৃত

সাহিত্য বিলাসও ধ্বনিমুখর অলঙ্কার সুমণ্ডিত হইয়া পরম প্রেম-প্রোজ্জ্বল স্বরূপ সন্ধান দিয়াছে ইহা মুক্তকণ্ঠেই বলা যায়। জগন্নাথকৃত রসগঙ্গাধরের কথাই বলি—

> স্মৃতাপিতরুণাতপং করুণয়া হরন্তী নৃণা
> মভঙ্গুর তনুত্বিষাং বলায়িতা শতৈবিদ্যুতাম্।
> কলিন্দ গিরিনন্দিনীতটসুরদ্রুমাবলম্বিনী
> মদীয় মতি চুম্বিনী ভবতু কাঽপি কাদম্বিনী॥

যাঁহার স্মরণেও প্রখর সংসার-তাপ দূর করে—অভঙ্গুর শত শত অচলা চপলা সেবিত কালিন্দীতটে কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত—অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক সেই মেঘ আমার মতিকে চুম্বন করুক। কাদম্বিনী এখানে শ্রীকৃষ্ণ। কাপি কোন এক, বলার উদ্দেশ্য মেঘের ধম শ্যামবর্ণ, রস, বর্ষণ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণে থাকিলেও তাহা হইতে অধিক ফলদায়ক অতএব প্রসিদ্ধ। কাদম্বিনী হইতে ব্যতিরেক। প্রথম তিনটি পদে তিনটি বিশেষণেই ব্যতিরেক অলঙ্কারের পোষাক। মেঘ দৃষ্ট হইয়া বর্ষণ দ্বারা প্রখর সূর্য্যতাপ দূর করে, ব্যক্তিবিশেষের অন্য তাপ দূর করে না। এই মেঘ সর্ব্বকালে সকলের তাপ দূর করে তাহাও শুধু স্মরণমাত্র। লৌকিক মেঘ চঞ্চল, চপলা-সেবিত অপ্রাকৃত মেঘ কৃষ্ণ স্থির দামিনী-রূপা গোপীনিসেবিত অতএব সর্ব্বাংশে ভিন্ন। প্রাকৃত মেঘ আকাশে থাকে, এই মেঘ যমুনার তটে কল্পবৃক্ষের তলায় অতএব ব্যতিরেক। ব্যতিরেক রূপক, অতিশয়োক্তির মিলনে বিচিত্র অলঙ্কার বৈভব এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ এই শ্লোক।

প্রাকৃত কবির কথা যাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—কাব্যরচনার প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে যশঃলাভের অভিসন্ধি, অর্থলাভের প্রত্যাশা প্রভৃতি। অপ্রাকৃত কাব্য রসাস্বাদন বিচারপরায়ণ ভাগবতের কথা অন্যরূপ। তিনি বলেন—

যশঃ প্রভৃত্যেব ফলং নাস্ত, কেবলমিষ্যতে
নির্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণগুণ লাবণ্যকেলিষু।
চিত্তস্যাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দলয়স্ত যঃ
স এব পরমো লাভঃ স্বাদকানাং তথৈব সঃ ॥

পারমার্থিক কাব্যনির্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণের গুণ লাবণ্য প্রভৃতিতে চিত্তের প্রগাঢ় আনন্দমগ্নতাই রচনাকারী ও স্বাদক উ পরমলাভ।

কাব্যের লক্ষণ কবির লক্ষণ ইত্যাদি বহু মতসাপেক্ষ বিষ লইয়া হঠাৎ কোনো কথার অবতারণা না করাই ভাল। এ স সকলেরই একটা মানস সংস্কার মোটামুটি আছে তবে পারিভ কবি অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টি এবং কাব্য আস্বাদনের উপযোগী প্রাক্তন স যাহার আছে এমন ব্যক্তিকে বলা যায়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত কবির নির্মিতিকেই কাব্য বলা হইয়াছে। "নির্মিত" কথার তাৎপর্য্য অসা চমৎকারিণী রচনা। ইহা দ্বারা রসাপর্ষক দোষরহিত যথাসম্ভব লঙ্কারং রসাত্মকং শব্দার্থ যুগলং কাব্যং" এই কথার উদ্দেশ্য বুঝা এই প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশে মম্মটাচার্যের কথা স্মরণীয়। তিনি তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি ইতি। অলঙ্কা হইলে কাব্যতো হয়ই—কোনো ক্ষেত্রে অলঙ্কার না থাকিয়াও কাব্য হয়, তাহার প্রমাণ আছে।

ভাষাপ্রকাশের রীতি চিরকালই অপরের চিত্তমনোহারিণী এ গুম্ফিত মাধুর্যমণ্ডিত ভাবগম্ভীর শ্রুতিমধুর করিবার জন্য সংস্ অপেক্ষা রাখে। কাব্যের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিধানে তাই নানা পদ প্রয়োগের চাতুর্য্য অনুসৃত হয়। এই পদপদার্থ উপন্যাস প্র বৈচিত্র্য হইতেই শব্দালঙ্কার ও অগণিত অর্থালঙ্কারের উদ্ভব হই মণ্ডন ব্যাপারে অলংকার বাণী কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিত্যক্ত বা অনাদরণীয় তো হয়ই নাই, বরং রসিক মনোহারী

প্রায়শঃ সমাদর লাভ করিয়াছে। অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্যে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় বলিয়া কাব্যরস বিচারপরায়ণগণও আলংকারিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কাব্যসমালোচনা, রসবিচার, ধ্বনিতত্ত্বসন্ধান অলংকার শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কবিকর্ণপুর তো সোজাসুজি তাঁহার গ্রন্থকে "অলংকার কৌস্তুভ" নাম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

আরও শুনা যায়—

বদনে নববীটিকানুরাগো নয়নে কজ্জলমুজ্জলং দুকূলং।
ইদমাভরণং বিলাসিনীনামিতরদ্ভূষণমঙ্গদূষণায়॥

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে অন্য অলংকার ভারস্বরূপ হয়। বরং বৃক্ষ-বল্কলও অভিনবশোভা মাধুর্য্য অভিব্যক্ত করে। সেইরূপ ভাবপ্রচুর কাব্য অলঙ্কার মণ্ডিত হয না। হইলেও লালিত্য ধারণ করে। যেখানে প্রীতি নিরুপাধি সেখানে অলংকার অপ্রয়োজন—মিলনের বিঘ্ন। সেইরূপ ভাবসম্পদ গৌরবান্বিত প্রেমপ্রেরণা সমুচ্ছ্বাসিত ভক্তিরসকাব্যে অন্য অলংকার স্থানে স্থানে বিঘ্নও উৎপাদন করে। স্বভাবোক্তিই শ্রেষ্ঠ অলংকার। নিরুপম বস্তুকে যতই বর্ণনার প্রচেষ্টা চলে ততই রূপক আর উপমার ঘটা বাড়িয়া যায়। কখনও বা সন্দেহ, কখনও বা উৎপ্রেক্ষা দ্বারা তাহাকে ধরিবার চেস্টা হয়। পরিণামে আক্ষেপই অবলম্বিত হয়। দানকেলি চিন্তামণির একটি শ্লোক দেখুন—

ফুল্লচম্পিকাবলিরিয়ং কিং নো ন সা জঙ্গমা,
কিং বিদ্যুল্লতিকাততি ন'হি ঘনে সা খে ক্ষণদ্যোতিনী।
কিং জ্যোতির্লহরী সরিন্নহি ন সা মূর্ত্তিং বহেৎ ধ্রুবং
জ্ঞাতং জ্ঞাতমসৌ সখীকুলবৃতা রাধা স্ফুটং প্রাঞ্চতি॥

এখানে সন্দেহ করা হইয়াছে আবার নিজেই তাহার উত্তর দিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। শ্রীরাধার অভিনব রূপের নব নব মাধুর্য্যভঙ্গি ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে কবির কথায়। অনুরাগ ধ্বনিত হইতেছে নতুবা প্রতিক্ষণে নব হইয়া হৃদয়ের বিস্ময়স্ফারতা হইবে কেন? এই

রসাস্বাদন চমৎকৃতিই রসের সার বলিয়া অলংকার শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শ্লেষ, অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন কিন্তু রসেরই প্রাধান্য বলেন এবং রসধ্বনিই যে কাব্যের আত্মা স্পষ্ট ভাষায় তাহা ঘোষণা করেন। রস অঙ্গ নয়—ইঁহার মতে রসই কাব্য—অঙ্গী। রসধ্বনিই আত্মা। অতএব সকল অলঙ্কার রসবোধের সহায়করূপে বিচারিত হইবে। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই। অগ্নিপুরাণের কথাটি এখানে স্মরণীয় বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্! কাব্য বাক্যের বৈচিত্র্য প্রধান হইলেও রসই উহার জীবন। রসধ্বনিশূন্য কাব্য কাব্যই নয়।

ধ্বন্যালোকে উক্ত আছে—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

নিপুণ প্রতিভাভাজন মহাকবির বাক্যে এমন সব ধ্বনিগর্ভ অর্থ থাকে যাহা ললনার অঙ্গের লাবণ্য ও অঙ্গসন্নিবেশদ্বারা ব্যক্ত অথচ শরীর হইতে অতিরিক্ত এক বিশেষ গুণের মত।

কবিকর্ণপূর অলঙ্কার কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে এই ব্যঙ্গ লাবণ্যামৃতের সন্ধান দিয়াছেন—

স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
অতিশয়িত পদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতে ॥

যে ধ্বনি উত্তম কাব্যের পদ ও পদার্থ হইতে ভিন্ন, যাহা দ্বারা আলঙ্কারিকের ব্যঞ্জনাবৃত্তি বিস্তার লাভ করে বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎকৃষ্ট ব্রজসুন্দরীগণের আনন্দাশ্রুবর্ষণকারী মুরারির সেই মুরলীধ্বনি জয়যুক্ত হউক। ধ্বনি অর্থ উত্তমকাব্যের ব্যঙ্গভূত এক অনির্বচনীয় তত্ত্ব কর্ণপূরের ভাষায়—

ধ্বনিরুত্তমকাব্যতত্ত্বং ব্যঙ্গভূতং যৎকিমপি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী বিচিত্র অলঙ্কার প্রাচুর্য্যে নাটক, কাব্য, বিলাপ ও স্তবমালা গ্রন্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের যে কোনও একখানা কাব্যের সমালোচনাও সুদীর্ঘ কাল চলিতে পারে। অপ্রাকৃত রসধ্বনিতৎপর ভাগবতগণ কৈতবরহিত হৃদয়ে রসঘনানন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দকে সকল ভাব অলংকারে পরিভূষিত দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের পদনখমণি জ্যোতিতে উদ্ভাসিত অন্তর, রসিক ভক্তগণ তাঁহাদের প্রেষ্ঠ ও প্রাণেশ্বরীর অলঙ্কার সঞ্চয়নেই মগ্নচিত্ত। প্রাকৃত নায়কনায়িকাশ্রয়ে প্রবৃত্তি তাঁহাদের সমীপে আকর্ষহীন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তৎপূর্ববর্ত্তী ভাগবত-রসিকগণের অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের রূপবর্ণনায় যেরূপ চাতুর্য্যসহকারে কাব্যালংকার সমাহৃতি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, উহা সহৃদয় কাব্যসমালোচকের প্রণিধানযোগ্য। প্রধান প্রধান সর্ব্বঅলংকারে তিনি আরাধ্য ভগবানকে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণীর প্রশংসা করিয়া বলেন,—

অন্তঃ প্রেমঘৃতস্মিতোত্তম মধুনর্ম্মেক্ষণৈঃ সংযুতা
শব্দার্থোভয়শক্তিসূচিত রসাদিন্দূল্লসৎ সৌরভা
আভীরী মদনার্ক তাপশমনী বিশ্বৈক সন্তর্পণী
সা জীয়াদমৃতাব্ধিদর্পদমনী বাণী রসালা হরেঃ।

শ্রীহরির বাণীই রসালা। ঘৃত মধু শর্করা কর্পূরাদি মিলনে রসালা হয়। বাণী রসালায় আন্তর প্রেমঘৃত। মধুরস্মিত উত্তম মধু নর্মমিশ্রিত দৃষ্টি শর্করা। শব্দশক্তি দ্বারা যে অর্থসূচিত রস উহা কর্পূর। আভীরীগণের কামসূর্য তাপনাশিনী এই কর্পূর সুগন্ধযুক্ত বাণী রসালা জয়যুক্ত হউক। এখানে রসালা ও বাণীর অভেদ বলাতে রূপক আর বাণী হইতে রসালার বৈলক্ষণ্য হেতু ব্যতিরেক অলংকার অন্বেষণীয়।

আরাধ্যের রূপবর্ণনাসেবায় নানা অলঙ্কার মণ্ডিত কাব্যোপচার প্রদান-পূর্ব্বক তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন,

অপার মাধুর্য্য সুধার্ণবানি
নানাঙ্গ ভূষাচয় ভূষণানি।
জগদ্দৃগাসেচনকানি শৌরে
র্বর্ণ্যানি নাঙ্গানি সহস্রবক্ত্রৈঃ॥

এই শ্লোকেও স্বভাবোক্তি রূপক এবং আক্ষেপালঙ্কার দ্রষ্টব্য। অপার মাধুর্য্যামৃত সাগর, অঙ্গভূষণেরও ভূষণ। জগতের দৃষ্টির অভিষেকামৃত শূরনন্দন কৃষ্ণের অঙ্গসমূহ সহস্রবদনেও বর্ণনা করা যায় না।

বাউল গান

বাউলের গান অনেকেরই ভাল লাগে। আমার লাগেনা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। সেদিন একটি সভায় বাউল গান হইতেছিল। বন্ধুর অনুরোধে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে হইয়াছিল। এই আমার প্রথম শ্রবণে বাউলের প্রতি প্রথম অনুরাগ তাহা নয়। বাউল গান বাউলের মুখে আরও অনেকবার শুনিয়াছি, বাউল দেখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাদের অনেকেরই যে এক একটা বিশেষ সাধন-প্রণালী আছে তাহার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও দূরীভূত হয় নাই।

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আমার ঠাকুরদাদার কাছে এক বাউল মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁহার নাম ছিল আশানন্দ বাউল। খুব সাধারণ-ভাবে থাকিলেও তাহার ভাব ছিল উত্তম, আর তিনি ছিলেন অসাধারণ সাধক পুরুষ। একখণ্ড হলুদে রংএর কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একগাল দাড়ি তাঁহার মুখশ্রীকে যেন মুনি-ঋষির গাম্ভীর্য দিয়াছিল। অথচ তিনি যখন কথা বলিতেন তখন মনে হইত—এক সরলচিত্ত বালক যেন তাহার সরল প্রাণের কথা বলিতেছে। আমরা খুব অল্পবয়সের ছিলাম, তাঁহার অনেক কথাই বুঝিতাম না—তবু মনে ভাবিতাম তিনিও আমাদের মতই একজন। আমাদের মতই অল্পজ্ঞ আর অতি অল্প বয়সের। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, তিনি ছিলেন গভীর ভাবনিষ্ঠ। তাঁহার একটি আখড়াবাড়ী ছিল। সেখানে রাজা ছিলেন আশানন্দ বাউল। আশে-পাশে যত প্রতিবেশী তারা ছিল আখড়া-বাড়ীর প্রজা, আর আনন্দ উৎসবে অংশীদার উদ্‌যোগী কর্মী।

গোবর্ধন যাত্রা উপলক্ষ্যে সেখানে পাহাড় সাজানো হইত, কৃষ্ণলীলার সং প্রদর্শনী হইত। কদিন পর্যন্ত যাত্রাগান কীর্তন প্রভৃতি আনন্দে হাজার হাজার লোক তৃপ্তিলাভ করিত। বাউল বড় দেখা দিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিষ্য লইয়া প্রায় তিনি ঘরের মধ্যে থাকিতেন। দেখা যাইত ভোগ আরতির সময় বাউল বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে তেল মাখা বংশদণ্ডসার দোতারা বা গোপীযন্ত্র। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবীও ক্ষুদ্রাকৃতি মধুর ঝঙ্কৃতি মূলক খঞ্জনী হাতে তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিতেন। বাউল যখন কীর্তনে আপনভোলা হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিতেন, মনে হইত দিব্যালোকে আনন্দলগ্ন উপস্থিত হইল। শ্রোতা ও দর্শক অনেকে অধৈর্য্য হইয়া সেই নৃত্যে যোগ দিত। তখন শতকণ্ঠে কৃষ্ণ-গোবিন্দ-গোপাল নামে আখড়া মুখরিত হইয়া উঠিত —মঙ্গল রোলে। এইতো তাঁহার বহিরঙ্গ দর্শন।

কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। বাউলের গুণে তাহারা মুগ্ধ, আর মহিমা কীর্তনে সহস্র মুখ। তাহারা বলিতেন—আশানন্দ হাত দিয়া বাতাসা হরির লুট দিতে থাকিলে পাত্র আর শূন্য হয় না, বাতাসা ফুরায় না, যত দেন ছড়াইয়া ততই পাত্র ভরিয়া উঠে। ভোগের পর মন্দিরে যাইয়া একবার তিনি দৃষ্টিপাত করিলে যত লোক প্রসাদ গ্রহণ করুক না কেন প্রসাদের আর অভাব হয় না। কত রোগী তাহার ঔষধ নয়, শুধু জলপড়াতে সুস্থ নীরোগ হইয়াছে। তিনি এমন সব গাছের মূল জানেন যে, তাহা ধারণ করিলে কঠিন কঠিন ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। একবার একটা লোক সর্পদংশনে মরিয়াই গিয়াছিল, বাউলের কাছে আনার পর তিনি লোকটির কানে কি একটা পাতার রস দিলেন আর সেই মৃত লোক যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায় কোন্ প্রসূতি গর্ভবেদনায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ, কে যেন ছুটিয়া আসিয়া বাউলকে সেই সংবাদ জানায়—আর সঙ্গে সঙ্গে বাউল হাতে তুড়ী দিয়া বলেন 'যা যা খালাস হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে হরির লুট দিতে বলিস্। এমন সব

অদ্ভুত ঘটনা বাউলের আখড়ায় নিত্য ঘটিত। সেদিন কে একটি মরা বাছুর টানিয়া আনিয়া আখড়া বাড়ীর দোর গোড়ায় ফেলিয়াছে। সকাল বেলা বাউল ফুল তুলিতে বাহির হইবেন দেখিলেন সেই গোবৎসটিকে। তাহার দয়া হইল, তিনি কাছে গিয়া বলিলেন 'ওঠ ওঠ'। বাছুর ছুটিয়া তাহার মায়ের কাছে গেল।

কয়েকজন গঞ্জিকাসেবী সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিয়া আখড়ার ছোট একটি ঘরে বসিত। কোনো কোনো দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে স্থানটি ধোঁয়াটে হইয়া থাকিত। বাউলের কিন্তু স্বভাব-আরক্ত চক্ষু কোনোদিন অধিকতর আরক্ত বলিয়া দেখা যায় নাই। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিত।

একদিন আসিলেন দূরদেশযাত্রীর একটি দল। তাহারা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়াছেন, আশানন্দের গুরুভ্রাতার শিষ্য ও শিষ্যা ইহাদের কয়েকজন। সেদিন উৎসব চলিল সারাদিন। খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়ন চন্দন আর ফুলের মালার ছড়াছড়ি। কত ফুল যে আঙ্গিনায় ছড়ানো হইল, আর শতবার সেই বিহ্বল নরনারীর প্রেমালিঙ্গন দেখিয়া যেন কেমনতর লাগিল। তাদের প্রমত্তচিত্তের ঐকান্তিক আনন্দ সঙ্গীত লহরী, তাহাদের সহনৃত্য, মধুর কণ্ঠে কীর্তন উন্মাদনা একটি অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিল সেদিন। বুঝলাম বাউল তাহার নিজের একটা বিশেষ ধরণের ভাব বহন করে—যেটি সাধারণের কাছে সর্বদা বোদ্ধব্য নয়। তাহাদের এই প্রাণঢালা প্রীতির ভূমিকায় উন্নীত হওয়ার জন্য যে সহজ সাধনা, তাহা অতীব গূঢ় রহস্যাবৃত অথচ অফুরন্ত প্রাণময়।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনায় প্রেমোন্মাদনার আদর্শ বলিতে প্রবৃত্ত কৃষ্ণদাস বাউল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরণে আকৃষ্টহৃদয় রঘুনাথের পরিচয়ে 'চৈতন্যের বাউল কে রাখিতে পারে'

বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া অদ্বৈত প্রভু জগদানন্দকে দিয়া যে তর্জা সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি বলেন—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কার্যে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

বাউল বলিয়া অদ্বৈত সদগৃহস্থ নিজেরও পরিচয় দিয়াছেন। সন্ন্যাসী-শিরোমণি মহাপ্রভুকে 'বাউল' বলিয়া তাঁহার মত্ততার সূচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সংসারাসক্ত সাধারণ আত্মভোলা জীব-গণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি 'আউল' কথাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তৎকালেও আউল বাউলের পার্থক্যের একটা সন্ধান করা যাইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতেই আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজীয়া, প্রভৃতি বহু গোষ্ঠীর কথা শুনা যায়। ইহাদের নিষ্ঠা ও চরিত্র শাস্ত্রীয় সাধনার পথ হইতে ব্যতিক্রম। সাধনচর্যায় এমন কতগুলি ব্যবহার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত যাহা যে কোনো সুসংগঠিত সমাজে অচল। শাস্ত্র সদাচার দার্শনিকপ্রসিদ্ধ মতবাদ ছাড়াই ইহাদের নিজস্ব নিয়ম মীমাংসা ও আচারক্রম দেখা যায়। তাহাদের বেশ, ভাব, চর্যা প্রভৃতির পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি রাধাকৃষ্ণ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের মতই জীবনধারণ করেন। কোথাও পীত বহির্বাস কৌপীন, আর কখনও আলখাল্লা জাতীয় অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়া কোনো এক তারের যন্ত্র হাতে বাউলকে দেখা যায়। ভাবপ্রমত্ততা তাহাদের বিশেষ লক্ষণ। গান করেন বাউল—

তাইতো বাউল হৈনু ভাই
এখন বেদের ভেদ বিভেদের
আরতো দাবি-দাওয়া নাই।

সহজীয়া সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণায় বৌদ্ধ সহজযানের কথা

স্বীকার করিতে হয়। বাংলার তান্ত্রিক রূপায়ণে বৌদ্ধপ্রভাব সহায়তা করিয়াছে বহুলাংশে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত প্রদেশগুলি অনেকাংশে স্বতন্ত্রতা রক্ষাকরিয়াই ছিল। ভাবপ্রবণ বাংলার মাটিতে অনুকরণধর্ম স্বাভাবিক মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে সহজযানের চর্যা নানাকারে অনুসৃত ও অনুকৃত হওয়ার ফলে সংসারবিরাগী বিভিন্ন প্রকার সাধকগোষ্ঠী দেখা দেয়।

চৈতন্যের আবির্ভাব সামাজিক ও ধার্মিক জীবনে একটা বিরাট্ পরিবর্তন আনিযাছিল। মেলা-মহোৎসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মেলন সংকীর্তন ধর্মান্তর গ্রহণ মতান্তর পরিবর্তন শুদ্ধীকরণ বেশান্তরগ্রহণ ত্যাগ বৈরাগ্য-আদর্শ-সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিশেষ করিয়াই নিয়মিতভাবেই ঘটিতেছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরেও শ্রীনিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র সেই সমাজের অধিনায়ক স্বরূপে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। আর্যেতর সমাজের বা সমাজচ্যুত মতবাদ নির্মুক্ত বহু লোক বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় সাধুসমাজে স্থান লাভ করিবার সুযোগ পায়। বার হাজার নাড়া ও তের হাজার নেড়ী তাহার সঙ্গে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই সমাজে গান্ধর্ব-রীতিতে বিবাহ প্রচলন করিয়া তিনি একটি নতুন গোষ্ঠীর পত্তন করেন। হিন্দুসমাজ তাহার প্রচেষ্টায় আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল এবং এই গোষ্ঠীকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। সমাজসংস্কারক-গণের অগ্রদূত বীরভদ্রের কথা আমরা অনেকে ভুলিতে বসিলেও বৈষ্ণবগোষ্ঠী ভুলিতে পারে না। বাউলেরা আজও গৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গে বীরভদ্রকেও স্মরণ করেন।

তাহারা গান করেন, নিত্যানন্দের ঘাটে অদান খেয়া বয়, সেখানে পার হইতে কাহাকেও আর কড়ি দিতে হয় না। গুরুর কৃপা বাউলের কাছে পরম সম্পদ। গুরুবাদের প্রাচীন পন্থা হইতে ইহারা নতুন একটি দিক্ আবিষ্কার করিয়াছেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি গুরু হইতে পারে। এখানে হিন্দু-মুসলমানেরও কোন বিচার

নেই। আত্মনাথ বাউল বলেন "গুরুর হাতের প্রদীপ লইয়া দেখ্‌রে অথাই গুহায় বইয়া, আত্মযোগে সতেজ হইয়া তবে পরম মরম পাবি"। এই মরমিয়ার আত্মকথা তাহার গুরুবাদের ভিত্তি। এই গুরুকে পাইবে বলিয়া সে বসিয়া থাকে। সে গান গায়—

"গুরুর চরণ পাব বলেরে বড় আশা ছিল।
আশা নদীর তীরে ব'সে আশায় আশায় জনম গেল।
চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ বরিষে অন্য দেশে
বল চাতক বাঁচে কিসে।"

এই গান চিরন্তনী আশার গান, প্রাণের গান, মর্মের বাণী। গুরুর কাছেই পরপারের টিকিট পাওয়া যায়। এখানে না আসিলে তাহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় না। তাহার ভোলা মন বৃথাই অন্যত্র ঘোরাফেরা করে। সে গান করে—

"ইষ্টিশন হয় গুরুর চরণ
টিকিট কর ও ভোলামন।"
টিকিটে না করলে পরে
কেম্‌নে যাবি বৃন্দাবন।"

মানুষের মধ্যে যে আরও একটি প্রাণময় পুরুষ আছে তাঁহাকেই সে খোঁজে। সে বলে—

তত্ত্বে ফত্ত্বে মন মানে না
মনের মানুষ চাইই চাই।"

এই মানুষ খুঁজিবার আশায় তাহার গতির বিরাম নাই। সে আক্ষেপ করিয়া বলে "মানুষের মধ্যে মানুষ আছে, আরে তারে চিন্‌লি না।" তাঁহাকে কোথায় পাইবে এই বলিয়া সে অস্থির। সে বলে "আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাব তারে।" নিত্য-মানুষের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ভোলামন শান্ত হইয়া অন্তরতম সত্ত্বার

দিকে উন্মুখ হয়। এই ভাবোন্মুখীকরণ ধর্ম—বাউলের সঙ্গীতেই ইহার প্রতিষ্ঠা। সহজিয়ার গান আর বাউল সঙ্গীত দুইএর মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলেই উহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পদাবলীকীর্তন বা রসকীর্তনের সহিত একতারার যে স্থূল পার্থক্য তাহাও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। লীলা বর্ণনপ্রধান রসকীর্তন, আর ভাববর্ণনপ্রধান বাউল সঙ্গীত। বাউলেরা রাধাকৃষ্ণ প্রেমসঙ্গীত করেন না—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে যে গানই তাঁহারা করুন না কেন, উহার মধ্যে ভাবাংশকে রঙ্গিন করিয়া তোলাই বাউলের চাতুর্য। কীর্তন রচনার প্রধানতম অভিব্যক্তি লীলারস-পরিবেশদক্ষতায়। বিরহ, ভাবরচনা, সঙ্গীত-লহরীর সংযোজনা, রস-কীর্তনের পূর্ণাবয়ব চিত্রসৃষ্টি। চিত্তমনোহারী খণ্ড খণ্ড ভাবমাধুর্য সংমিশ্রণে বাউল সঙ্গীত মমবাটিকা বিচিত্র শোভায় সমৃদ্ধ করিয়া থাকে। সহজিবাপদে বহুপ্রকার গ্রন্থিযোজনা দেখা যায়। এইগুলি তাহাদের সাধন সঙ্কেত।

মানব দেহেই তাহারা চোদ্দভুবন কল্পনা করেন। দেহই তাহাদের ক্ষেত্র ও বৃন্দাবন। এই দেহেই তাহাদের স্বর্গ ও নরক। ইহা লইয়াই সাধন এবং সিদ্ধি। দেহজাত কোন পদার্থ ইহাদের দৃষ্টিতে অপবিত্র নয়। সাধনায় অটলভাব অভিলষিত। গোপন সাধনার কথার সঙ্গে দেহ সম্বন্ধকে তাহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই; অথচ দেহাতিরিক্ত সত্ত্বায় উন্নীত হওয়ার জন্যই তাহাকে অটল হইতে হইবে। "জলেতে নামিবি জল না ছুঁইবি" প্রভৃতি সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। সে স্নান করিয়াও চুল ভিজাইবে না। রান্না করিয়াও হাড়ি ছুঁইবেনা। সে সতী হইতেও চাহে না, অসতীও হইতে চাহে না, পতির সঙ্গে প্রেম করিবে অথচ জানিতে দিবে না। সহজিয়া ও বাউল এই দুইয়ের মধ্যেই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য। তবে একটি দেহকে লইয়া, অপরটি ভাবকে লইয়া বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। শেলী এবং কিট্স্ এই দুই

কবির মধ্যে যে পার্থক্য পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে উহার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সহজিয়া ও বাউলের ধারাবাহিক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতীয় দর্শন প্রাণসত্ত্বা, জৈবসত্ত্বা ও অধ্যাত্ম-সত্ত্বার যে নিপুণ বিচার করেন কোন দেশে সেরূপ বিচার নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অন্তর্জগতের লুকানো সত্ত্বাকে বাহিরে আনিয়া ভোগের লালসা অধ্যাত্মবাদীর সহজাত, দেহে আত্মার ব্যাপ্তি দেহাভিন্ন রূপেই তাহার অভিব্যক্তি; কাজেই দেহকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার অনিত্য দেহকে অবলম্বন করিয়া যে প্রচেষ্টা উহাও যে ভঙ্গুর তাহাও অজানা নাই। এই জন্যই দেহভিন্ন এমন এক অভিব্যক্তির প্রয়োজন, যেটি দেহ হইয়াও দেহধর্মী নয়, আত্মসত্ত্বা হইয়াও দেহের ন্যায় ব্যবহার্য। এই আত্মঅনাত্ম যোগাযোগেই বাউল গানের তাৎপর্য। ইহা দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, অসম্ভব বস্তুর সন্ধানেই বাউল বাতুল হইয়াছেন।

বাউল বাতুল নয়, বাউল ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা তাহার সঙ্গীতে একটি মধুর মঞ্জীর ধ্বনির রণনে ফুটিযা উঠিয়াছে। তাহার আশা, উৎকণ্ঠা, লালসা এবং আর্তি অন্তরে বিরামবিহীন সঞ্চারে ঝংকার তুলিয়াছে। তাহার খমকে গমক দোতারার ঝংকার আর খঞ্জনির চাঞ্চল্য মিলিত হইযা অন্তরে প্রেমের মঞ্জরীকে নাচাইয়া তুলিযাছে। সহজিয়ার সহজ দৃষ্টিতে ভিতর বাহির একাকার হইযা গিয়াছে। সে অভিলষিত কিশোরীকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই শুনি "উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী নয়নতারা"। বাউলের চোখে বাহির দুয়ারে লেগেছে তালা, তোর ভিতর দুয়ার খোলা। মায়া নদীর এপার-ওপারের ব্যবধান তাহাকে আকুল করিযাছে। প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে গান করে—

"তুমি ওপার হতে বাজাও বাঁশী
আমি এপার হতে শুনি

অভাগিয়া নারী আমি
সাঁতার নাহি জানি।"

নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের আশেপাশে বহু প্রসিদ্ধ বাউল বাস করিতেন। জীবনে ঔদাস্থ, সংসারে বিতৃষ্ণা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, আর জনসঙ্গত্যাগ ছিল তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। লৌকিক ব্যবহার হইতে জীবনটিকে তুলিয়া একপাশে ধরিয়া রাখাই ছিল তাহাদের স্বভাব। এই নিরালা প্রাণের মাধুরী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রেখাপাত করিয়াছে। একটানা সকল সুখদুঃখনিরপেক্ষ বাদল ধাবার মধ্যে তিনি বাউলকে আবিষ্কার করিযাছেন। তাঁহার একতারার গান শুনিয়াছেন।

"বাদল বাউল বাজায় বাজায
বাজায রে একতারা।"

শান্তিনিকেতনে একাধিকবার তিনি বাউলের গান শুনিয়াছেন। বাউলের ছন্দ, সুর তিনি সঙ্গীতে, কাব্যে রূপ দিযাছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতে বাউল সুরের অনেক গান আছে। কীর্তন, ঢপ, রামপ্রসাদী, প্রভৃতির মত বাউলসুর নিজস্ব মাধুর্যে একক। ভাটিযালি, পল্লীসঙ্গীত, জারী, তরজা, প্রভৃতি বাউলের মধুরতা হরণ করিতে পারে নাই। উদাস প্রাণের একটানা প্রেরণা কোন্ সুদূরের সংবাদ বহন করিযা আনে বাউল সঙ্গীত, তাহা সহসা বুঝিযা ওঠা যায না।

লিরিক কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিলেও দেখা যাইবে ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সংবেদন উহা অন্যত্র দুর্লভ। ফকিরের কেরামতি আছে, ঝাড়, ফুক্, জড়ি, বুটি, দোযা আছে কিন্তু তাহার এরূপ মনমাতানো পাগলকরা গান নাই। আমাদের বাউলের অভাবনীয ক্ষমতার সঙ্গে তার সঙ্গীত আছে, আর আছে, প্রাণের অতলে আনন্দ শিহরণ আনিয়া দিবার মত দিব্য বল।

তারের যন্ত্রে সুর সমন্বয়ের বাতায়ন চিরমুক্ত। একতারার একটি

তারেই বাউলের বিভিন্ন রাগিণী ও ছন্দের সমন্বয় হয়। আবার অনুরূপ-ভাবেই তাহার মনের দেউলে 'বাউল' বিভিন্ন দেবতার পূজার সমারোহ করেন। এখানে কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সমাজের সীমা তাহার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, আর করেও না। তাহার মন-পাখী অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় মুক্তির গান গাহিয়া, আর মর্তের মানুষকে তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ গরিমায় লুব্ধ করিয়া। মাটিতে লুটাইয়াও ধূলি লাগে না তাহার গায়। দেহের গান গাহিয়াও সে অনাসক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয় প্রতিটি মানুষের মনের কোণে। ইহ-কাল, পরকাল, বন্ধন ও মুক্তি, আসক্তি ও অনাসক্তির দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জীবনই বাউলের আদর্শ।

জনমনে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব

আচমন করি সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী ছন্দে—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা

পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীবচক্ষুরাততম্।

মন্ত্রটি বেদবেদ্য পরমবস্তুরই সূচনা। বেদানুগত সকল গোষ্ঠী বেদান্তী, স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব, আচারী, অনাচারী, সমান মনে প্রসন্নতা পবিত্রতা লাভ করে এই ভাবনায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের সূত্র এই সব মন্ত্রের মধ্যেই আবিষ্করণীয়।

এই সাহিত্য অনাদি অনন্তধর্মী। আরম্ভবাদ, কালধর্ম, খণ্ডের সঙ্কীর্ণতাবাদ বা সীমাধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ইহার উপর আরোপ করা বৃথা। লৌকিক বস্তুতান্ত্রিক নয় বলিয়া আরম্ভবাদ অপাকৃত, সর্বমানব সম্বন্ধী বলিয়া সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে, আর ত্রিকাল সত্য মঙ্গলসম্বল বলিয়া সীমাধর্মাতিক্রমী।

"সত্যং পরং ধীমহি।"

সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃত সার্থকতা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। জড়ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে কলা-সৌন্দর্য সৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উহাতে সমাজ-কল্যাণ সাধনের কথা অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক। ইহা ভারতীয় চার্বাকবাদের প্রতিচ্ছবি। প্রাচ্যের সাহিত্যতীর্থে সত্য শিব ও সুন্দরের ত্রিবেণী সঙ্গম। নিরালা সত্যকে মঙ্গলায়তন সৌন্দর্যের পরমাধাররূপে দর্শনে ও উপলব্ধিতে সাহিত্যের পরম উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত। ভাগবতের আদি ও অন্ত এই ঘোষণা করে।

তদ্বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্‌ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি
যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
(ভাঃ ১।৫।১১

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্‌
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোনুগীয়তে॥
(ভাঃ ১২।১২।৪৯)

—উপনিষদ্‌ মহাসত্যসার বোধসত্ত্বা জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। রসতত্ত্ব ভাবনায় সাহিত্য পূর্বাপর সর্বাবয়ব পূর্ণাভিষিক্ত। সৃষ্ট জগতের সঙ্গে ভিন্নাভিন্ন রসতত্ত্বাভিলাষীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি সংপ্রসারিত। উহা অনন্ত বৈচিত্র্য সম্ভারে সম্ভৃত হইয়া বৈষ্ণব সাহিত্যরস-চেতনায় সমৃদ্ধ করিয়াছে —স্বচ্ছ সবল মানসধর্মী দার্শনিক কবিকে। "কৃষ্ণাৎ পরং তত্ত্বং কিমপি অহং ন জানে।"

হিমালয়ের সমুত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গস্থ বদরিকা আশ্রমের সরস্বতীসলিল-কণিকাভিষিক্ত ভাবনাধারা সংহিতা ব্রহ্মসূত্র পুরাণ পঞ্চরাত্রকে বাহন করিয়া নামিয়া আসিয়াছে—নির্বাধ চঞ্চলগতিতে সর্বভারতের অঙ্গনতলে। নারায়ণের পদাশ্রয়ী সাহিত্যসম্পদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে দাক্ষিণাত্যের সুদূর সাগরের পারে—সর্বমানবের পরমকল্যাণবীজাধানে। ফল ফলিয়াছে, অগণিত আড়্‌বার, সন্ত, সাধক চূড়ামণি, ভক্তের ভাবনায় পারমার্থিক প্রকাশ-সমৃদ্ধ লোকোত্তর কালজয়ী সাহিত্য গৌরব। এই সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লেশমাত্র নাই—ইহা জাতীয়তার সহায়ক নয় বলিবার উপায় নাই, কেন না লৌকিক জাতীয়তা স্বীকার না করিয়াও

অলৌকিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের—ভগবদ্ভক্ত জাতীয় ঐক্য বিধানে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব অতুলনীয়।

আমরা পাইয়াছি তেঙ্গুর, কেঙ্গুর, দ্রাবিড়াম্নায়, সহস্রগীতি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবপদ পদাবলী, আরো কত বিচিত্র প্রবন্ধ সন্দর্ভ। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাষার প্রশ্ন নাই। কানাড়া, তামিল, মহারাষ্ট্র, গুজরাটি, হিন্দী, গুরুমুখী, অসমিয়া, ওড়িয়া, বাংলা কোন্ ভাষার কথা বলি?

একনাথ বলেন, কেহ, যেন মনে না করেন এই পারমার্থিক রস-বিস্তারে কেবল সংস্কৃতেরই অধিকার। দেবভাষা না হইলে বুঝি আর কোনো ভাষায় ভাবামৃত পরিবেশন সার্থক হইবে না। তাহা হইতে পারে না। কারণ এই ভাষায় যাহার পূজা সেই রসময় ভগবানের সমীপে সকল ভাষা পরিচারিকার সমান অধিকার।

তিনি বলেন—

সংস্কৃত বাণী দেবে কেলী।
প্রাকৃত কায় চোরাপাসূন ঝালী॥
অসোত যা অভিমান ভুলী
বৃথা বোলী কায় কাজ॥

সংস্কৃত ভাষা দেবতার সৃষ্টি আর প্রাকৃত ভাষা চোরের সৃষ্টি এই কথা সত্য নয়। ভগবানের কথা যে ভাষায় হয় তাহারই গৌরব—অন্য বৃথা কথার ভাষার আদর হইতে পারে না।

বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক রসচমৎকৃতির অভিব্যক্তি এই সাহিত্যের অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছে, আর এক অদ্বৈত পরম আনন্দময় অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিময় পুরুষোত্তম ভগবান্ তাহার রসাধার, উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে কবির কৃতিত্ব সাহিত্যিকের অভিমান অস্বীকৃত হইয়াছে। কেবল নিরভিমানের শুচিতা ছড়াইয়া ইহার পরমাভিজাত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিরভিমানিতার দৃষ্টান্ত দেখি কবিরাজ কৃষ্ণদাসের ভাষায়—

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে,
তাহার চরণ ধুঞা মুঞি করি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ
তোমরা এ অমৃত পেলে সফল হৈল শ্রম ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য বিভিন্ন পরিবেশে নবযুগের প্রবর্তন করিয়া কি-ভাবে জনগণের চিত্তভূমিকে সমান্দোলিত করিয়াছে উহা সমালোচকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। দেশে দেশে ভক্তগোষ্ঠী সন্তশ্রেণী তাহার সাক্ষ্য বহন করেন।

সমাজে কোন কোন সমস্যা উদ্ভূত হইলে বা বিভেদের ঘূর্ণিতে সমাজ-জীবন চূর্ণিত হইবার উপক্রম হইলে বৈষ্ণব সাহিত্য সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও ধৈর্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া জনসমাজকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে। নরসি মেহতার গান—মহাত্মা গাহিতেছেন—

বৈষ্ণব জন তো তিনে কহিয়ে
যো পড় পাঁড়াই ন জানে রে।

এই সঙ্গীতে নিজের মর্মকথার তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের নিজস্ব বাঙ্ময় রূপটি তাহার আন্তরিকতায় অভিব্যক্ত। উহা সংস্কৃত বা বাংলা যে কোন ভাষায় হউক তাহাতে কিছু দোষ হইতে পারে না। এই সাহিত্যের সমালোচনাও প্রাকৃত মনোবৃত্তি দেহপরতন্ত্রতাকেন্দ্রিক হইতে পারে না—কাজেই তথাকথিত কাব্য সমালোচক হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচকের অনন্যসাধারণতা বিশেষ বিবেচ্য।

পরিদৃশ্যমান জাগতিক সৌন্দর্যের প্রশংসায় প্রাকৃত কবি মুখর। অতিশয় উক্তিতে তাহার ঔজ্জ্বল্য, আকর্ষক গুণ, অলংকারের সুসজ্জা বিলাস, তাহার বর্ণনার পরিপাটি, শব্দ ও অর্থের যোজনায় নানাভাবে তাহাকে গ্রহণের প্রচেষ্টা, সাধন, অভ্যাস, অনুশীলনে প্রসাদাদি সদ্গুণ-

সম্পন্ন কাব্য ও সাহিত্যের উদ্ভব। উহা কাব্যপুরুষের দেহ ও আত্মা অথবা প্রাণরূপে বিচারিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। শব্দের সাবলীলতায় অর্থের স্বচ্ছতায় বর্ণনার সাহজিকতায় লালিত্যে কাব্যসাহিত্যের অন্তর্নিহিত সত্যের আভাস ফুটিয়া উঠে—তাহাতেই সামাজিকের প্রাণে মনে দেহে পুলকশিহরণের সহযোগী হইয়া বাক্যমনের অগোচর অপূর্ব অভিনব চমৎকৃতিপূর্ণ অনুভূতি লাভ হয়। উহা আস্বাদনকারীর প্রতীতি। নির্বাধ চিৎসত্ত্বার বিলাস। আনন্দময় সৌন্দর্যচেতন সত্ত্বা এখানে সত্য মিথ্যা লৌকিক সুখদুঃখের দ্বারা অনভিভূত অবস্থায় বাধা-হীন উন্মুক্ত-নিরপেক্ষ। পণ্ডিতগণ উহাকে রস আখ্যা দিয়া ব্রহ্মানন্দ সহোদররূপে বর্ণনা করেন। এবং ব্রহ্মানন্দ যে ইহার অধিক শুধু এ কথা বলিয়াই শেষ করেন না। উহার জাতিও ভিন্ন এবং পরিমাণও অফুরন্ত, সে কথারও নির্দেশ করেন। পারমার্থিক রসের পূজারী বৈষ্ণবগণ সেই ব্রহ্মানন্দ অবাঙ্‌মনসগোচর আনন্দের সংবাদে ভবনা-রাজ্যে সীমারেখা টানিয়া দিতে নারাজ। তাঁহারা দেখেন, রাধার অন্তরের প্রেম অনুরাগ রস বিভু হইয়াও সর্বদা বর্ধনশীল।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥

এই প্রেম হইতে গুরুবস্তু না থাকিলেও ইহা গৌরবহীন। নির্মল হইলেও কুটিলতার সৌন্দর্য ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধি-কারক। শ্রীহরির প্রতি রাধার এই অনুরাগ জয়যুক্ত হউক।

তাহাদের কথা আরও আরও আরও পরমাত্মার রস, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গাঢ়তররূপে আস্বাদ্য, আরও আরও আরও ভগবদ্-

রস, অন্তরে বাহিরে "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা ইষ্টস্ফূর্তি" গাঢ়তম প্রেমরসের চর্বণ আস্বাদনের কথা। এই রসের আস্বাদন—

তপ্ত ইক্ষু চর্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

শুধু তাহা নয়, ইহাতে 'যার হয় সেই জানে' এই স্বসংবেদ্য লক্ষণটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বলা হইয়াছে। বেদ্যান্তর বোধস্পর্শরহিত তো নিশ্চয়ই। ঐকান্তিকতা, শুদ্ধতা, নিষ্ঠা, নিরবদ্যত্ব প্রভৃতি কতভাবে যে উহার পরিচয় করাইবার আগ্রহ তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলেই বুঝা যাইতে পারে।

লৌকিক সাহিত্যকার ও কবির বাক্য হইতে মহাকবির বিশেষত্ব ধ্বন্যালোকে একটি সুন্দর শ্লোকে বলা হইয়াছে—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি
বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি
লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

সুনিপুণ প্রতিভার অধিকারী মহাকবির বাক্যে এই ধ্বনিগর্ভ অর্থ থাকে। উহা ললনার অঙ্গশোভা ও অঙ্গসন্নিবেশ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াও শরীর হইতে অতিরিক্ত এক বিশেষ লাবণ্যগুণের মত।

কবি কর্ণপূর 'অলংকার কৌস্তুভে' এই ব্যঙ্গ লাবণ্যের সন্ধান দিয়া বলেন,

স জয়তি, যেন প্রভবতি দৃশি
সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ
অতিশয়িতপদপদার্থো ধ্বনিরিব
মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ।

যে ধ্বনি উত্তমকাব্যের পদ ও পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, যাহাতে আলংকারিকের ব্যঞ্জনাবৃত্তির বিস্তার, বৈকুণ্ঠাদি ধাম, এমন কি ব্রহ্মানন্দ

হইতেও উৎকৃষ্ট ব্রজসুন্দরীগণের আনন্দাশ্রুবর্ষণকারী মুরারির সেই মুরলীধ্বনি জয়যুক্ত হউক।

প্রতিটি ভাষার অন্তরালে যে সত্যের পরিস্থিতি, তাহাকে লইয়াই বাচন চাতুরী, রচনার মাধুরী। তাহাকে জানানো বুঝানো সাজানোর পরিশ্রমেই কবি কাতরকণ্ঠ—আকুলপ্রাণ। উপলব্ধকে প্রকাশের কত ছন্দ, কত রীতি, আর কত ভাষা। তাই কবিশ্রেষ্ঠ গ্যেটের কথা বলি—

In Art's wide kingdoms ranges
One sole meaning, still the same,
This is truth eternal Reason
Which from Beauty takes its dress.

কবি আমাদের শিক্ষক, গুরু, জ্ঞান, বিজ্ঞান সৌন্দর্যের পথের পথিকৃৎ—"A rew Instructor and preacher of Truth to all men" এ কথা বলিযাছেন প্রসিদ্ধ লেখক কার্লাইল। বৈষ্ণব সাহিত্যিক নবীন গুরু নবীন ভাবের আদর্শ বিশ্বের অন্তরে বাহিরে আনন্দ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত পরম সম্বেদনাময় বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির স্রষ্টা। সেই পরমতত্ত্বের আভাস দিযা সুপ্রসিদ্ধ জার্মাণ দার্শনিক ফিক্টে (Fichte) অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহারই একটু আপনাদের সমীপে নিবেদন করি—

"There is a divine Idea pervading the visible universe, which visible universe is indeed but its symbol & sensible manifestation, having in itself no meaning or even true existence independent of it. To the mass of men this divine idea of the world is hidden."

তিনি আরও বলেন—"Literary men are the appointed interpretors of this divine Idea."

সত্যই তো যুগে যুগে সাধুসন্ত সাহিত্যিক প্রাচীনতম সাহিত্যেরও নব নব ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে যুগের প্রযোজনে সংবদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করেন। রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বল্লভ, রূপ, সনাতন, শ্রীজীব সেই যুগোপযোগী ব্যাখ্যাতাই বটে। সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশ্লেষক পণ্ডিত Schiller বলেন,

"From the pure ethers of his spiritual essence flows down the fountain of Beauty uncontaminated by the pollutions of ages & generations."

(Aesthetic Education of men)

চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব রচনার মূল উৎসের সন্ধানে সাহিত্যের গরজ কতখানি আছে তাহা আর কেহ বিচার বিতর্ক করিয়া দর্শনশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করুন, তাহাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু যে অনভিব্যক্ত পরমানন্দ সুব্যক্ত হওয়ার আকুতি হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে ছন্দায়িত হইতে থাকে, উহার পরিস্পন্দনের সঙ্গে মিতালী করিয়াই যে ধ্বনিপ্রধান বৈষ্ণবসাহিত্যের বিস্তার, এ কথা কিন্তু না বলিলেই নয়। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব সাধকের মর্মবাণীই মধুরতম ধ্বনিঝংকারে সাহিত্যাকার পরিগ্রহ করিয়াছে। ধ্বনির পরিণাম ভাষা, ভাষা প্রকাশে অক্ষর, অক্ষর ন্যাসে ছন্দ আর ছন্দে ছন্দে আনন্দ, রসতরঙ্গ কাব্য,আর সঙ্গীত। সঙ্গীতে সংকীর্ত্তনেই পরমানন্দঘন বিগ্রহের আবির্ভাব, গৌরগোবিন্দ দর্শন।

পদ পদাবলী সাহিত্য সুরম্য বৃত্তিগুলির সংস্কার সাধনে আত্মচেতনার স্ফুর্ত্তিভে উদ্বেলিত করিয়াছে কোটি কোটি মানব সন্তানকে যুগের প্রভাব মুক্ত করিয়া। তাহারা সঙ্গীতে, কীর্ত্তনে, পদবলীতে, অভঙ্গে,

সোরঠায়, ওবীতে, দোঁহায়, ভজনে প্রাণময় প্রিয়তমের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

পদাবলী রচনা করেন 'মহাজনেরা', তাই তাহাদের রচনা গীতিকা হইলেও আধ্যাত্মিক রসে পূর্ণ হইয়া আছে।

সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্রে পরম্পরাক্রমে অগণিত পণ্ডিত সাহিত্য সমালোচনা করিয়া ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বাববোধ সম্বন্ধে বিরাট গবেষণা করিয়াছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, প্রভৃতিতেও মানবজীবনে সৌন্দর্যভোগের বিচিত্র রীতির সঙ্গে পরিচিত করানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মানবের লালসা সম্যক্ নিবৃত্ত হয় নাই। জ্ঞান বৈরাগ্যে বিরক্ত মনের অনুভবের গৌরব স্মরণ করিয়াও মানবিক সাধারণ ভাব রসচমৎকৃতির পরেও নির্বেদের ভাবগৌরবে 'শান্ত'কেও রসরূপে স্বীকার করা হইয়াছে অলঙ্কার রসশাস্ত্রে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধের এক অভিনব সন্ধান রাখিয়া লীলাপুরুষোত্তমের সঙ্গে নরলীলার বান্ধবরূপে জীবের এক সত্য নিত্য চিরন্তন সংজ্ঞানের সঙ্কেত করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত, সর্বত্র শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দলীলা রসআস্বাদনপ্রমত্ত সেবকগণ, বন্ধুগণ, মাতা ও পিতৃগণের, আবার প্রেয়সীগণেরও নিত্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল লীলাসঙ্গীগণের, বিচিত্র ভাবনা, সেবা ও আনন্দানুভব সম্বলিত বিরাট সাহিত্যে কাব্য, নাটক, উপাখ্যান, চরিতাঙ্কন, ইতিহাস প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপ্রসার লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন শাখায় অগণিত গ্রন্থ বিভিন্ন কালের মনীষীগণ রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ যেমন মূলধ্বনি ভগবন্নামকে চিন্ময় ভাবনা করেন, তেমনই তাঁহার বিগ্রহ, পরিকর, ধাম, লীলা ও লীলাগ্রন্থকে অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া ভাবনা করেন। অতএব এই বৈষ্ণব সাহিত্যও চিন্ময় সাহিত্য। ইহার কর্তৃত্ব কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়।

গ্রন্থ লেখান মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥

ছোট বড় সকল বৈষ্ণব সাহিত্যিকেরই এই এক কথা—ভগবৎকৃপায় গ্রন্থ প্রকাশন। সাহিত্যরসিক ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দেরও করুণাকে স্বীকার করিয়া তিনি যে 'সাধারণীকরণে'র এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন উহা বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুপম।

সবার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
তাঁর বাণী শিষ্যে তারে বহুত নাচাই॥
শিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে॥

এই কৃপাপ্রাচুর্যে প্রকাশিত সাহিত্যের একটি শুদ্ধ রূপ আছে। মদমাৎসর্য হিংসা বিদ্বেষ নিন্দা এই সাহিত্যে স্থান পায় না, পাইতে পারে না। ভক্ত চরিতাখ্যানও ভগবল্লীলাকথারই মাধুরী আস্বাদন। ঐকান্তিকভাবে ভগবানের পাদপদ্মের মহাঐশ্বর্য মাধুর্য বর্ণনা, রসসৃষ্টির প্রক্রিয়ার প্রাধান্যই এই সাহিত্যের মুখ্যতম বিষয়। ব্যষ্টি প্রাণ সমষ্টির দিকে উন্মুখ হউক। অংশ অংশীর সন্ধান করুক চিৎকণা বিভুচিৎ সন্নিহিত হউক। দাস প্রভুর সহিত মিলিত হউক। সখার সঙ্গে সখার প্রেমালাপ চলুক। মাতা তাঁহার চিন্ময় গোপালকে লালন করুক। প্রিয়া রাধা দর্শনের উৎকণ্ঠায় গোবিন্দের অভিসারিণী হউন—আমরা অনুগমন করি, পদাঙ্ক অনুসরণ করি। "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি।"

বৈষ্ণব কাব্যের অনন্যসাধারণ অভিব্যক্তির ও ব্যঞ্জনার মাধুর্য

পর্যালোচনা করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্র বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝর্ণা বাহির হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রকাশের ভাষায় শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ শ্রীজীব সংস্কৃতকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। ফলে সেই সুরসাল সাহিত্য ভাণ্ডার জনসাধারণের সমীপে সুলভ হয় নাই অনেকে মনে করিতে পারেন। যেমন করিযা বাল্মীকি রামায়ণের সরসতা সাধারণের উপলব্ধির বিষয় না হইলেও রামচরিতমানসের অমৃতস্পর্শে সমাজের সর্বস্তরের মানব কল্যাণের সন্ধান পাইযাছে, অনুরূপভাবে বাংলায় ও শ্রীরূপ সনাতনের বাণীই পদ পদাবলী ও অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে সমগ্র বাংলার প্রাণ নন্দিত করিয়াছে এক নবজাগৃতির চমৎকৃতিতে।

ধর্মানুশীলন ও সাহিত্যানুশীলন যেন এক অভিন্ন সত্ত্বায় সম্মিলিত হইল—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম অবলম্বন করিযা যে বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইল উহাতে সমগ্র বাংলার মনের প্রণয় অভাস। ফাল্গুনের ফাগের মতই কথা-চরিত -উপাখ্যান-মঙ্গল-সাহিত্যের উপরেও বিকীর্ণ হইল। প্রেমভক্তির প্রভাব-গৌরবে এই যুগের শিবায়ণ চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল এবং অন্যান্য বিচিত্র সাহিত্যেও সমভাবে ভক্তির ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে এক অখণ্ড প্রেমস্থাপনেই। এই যুগে সাহিত্যসৃষ্টির সাফল্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ধর্ম ও সাহিত্যকে পৃথক করিবার চেষ্টা করিলেও ইহা বেশ বুঝা যায়, কোনো কালের কোনো লৌকিক কবিও সহসা তৎকালের দেশাচার লোকাচার ও ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত হইয়া সাহিত্যস্রষ্টা হইতে পারেন না। বিশেষ করিয়া ধর্মসাহিত্য যেভাবে জনগণের মনের উপর শীঘ্র গতিতে প্রভাব বিস্তার করিত তেমন করিয়া আর কেহ নয়। কবিমানস তাহার রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহার বিশ্বাস

তাহার দর্শন তাহার লেখনীকে চালনা করে। কাজেই কেমন করিয়া কবি অবিশ্বাসের বেসাতি লইয়া স্রষ্টা হইতে পারে? সত্য বলিয়া বিশ্বাস্য বস্তুকে লইয়াই সার্থক রচনা সম্ভব। আর উহাকেই কুশল-রীতিতে প্রকাশিত করিয়া সাহিত্যিকের সাফল্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মহিমায় মুখরিত বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যোত্তর যুগের শত শত কবির কল্পনালতায় যে অনিন্দ্য সুষমামণ্ডিত কাব্যপ্রসূন বিকশিত হইয়া বাংলার সাহিত্যকাননকে চিরন্তনী শোভা দান করিয়াছে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করি। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় মনোশিক্ষা পাঠ করি।

কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাও তাহাতে॥

ভক্তিই সাধন, ভক্তিই ভাব, আর ভক্তিই প্রেম। প্রেমেরই রস, আর রসাস্বাদনেই ভগবান বশ। অতএব ভক্তিতেই গ্রহণ, ভক্তিতেই ভোগ, আর ভক্তিতেই 'সাধারণীকরণ' সাহিত্যের সংপ্রসারণ—সৎ-প্রতিষ্ঠা।

অনুশীলন

মাধুর্য্যমাত্রের অনুশীলনেই প্রীতির সার্থকতা। বস্তুর স্বরূপগত বিভিন্ন গুণগরিমা থাকিলেও তাহার যে গুণ আস্বাদকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া দেয়, অঙ্গে রোমহর্ষ ও পুলকাদির সহিত অপূর্ব্বাস্বাদন প্রচুর আনন্দ বিশেষ প্রকাশিত করে সেইটিই বস্তুর মাধুর্য্য। মাধুর্য্য ভিন্ন আর যাহাতেই প্রীতির গতি বা দৃষ্টি থাকুক্ না কেন একমাত্র মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রীতি সম্পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রীতির সম্পূর্ণ বিকাশ এই মাধুর্য্য অবলম্বন করিয়া। মাধুর্য্যময় প্রীতির পসরা লইয়াই বাংলার ঠাকুর প্রীতিরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কোমল হৃদয় বাঙালীর দ্বারে ভিখারীর মত বেড়াইযাছেন। যদিও আজ আঘাতের উপর আঘাত পাইযা বাঙালীর হৃদয় কঠোর হইযা উঠিতেছে, যদিও বাংলার দৈন্য প্রতিদিন বাঙালীর হৃদয দগ্ধ করিযা দিতেছে তথাপি শতসহস্র জ্বালার মধ্যেও তাহার সেই চারশত বৎসর পূর্ব্বের আনন্দ ধারার স্মৃতি প্রাণে প্রস্তর মুক্ত পার্ব্বত্য নদী ধারারই মত অবাধ গতিতে জাগিয়া উঠে। সুন্দর মূর্ত্তি, সাহজিক প্রেম, অপূর্ব্ব আস্বাদ-ময় শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও আনন্দ বিগ্রহ ভক্তগণ সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া দেশে সত্যই প্রেমের হাট বসাইযাছিলেন। প্রেমের স্বভাব কুৎসিতকে সুন্দর করিযা দেখা, পাপকে পুণ্য করিয়া তোলা, বিযুক্তকে মিলনের আনন্দ সূত্রে গ্রথিত করা। প্রেমের ঠাকুর নদীযায় সেই লীলার সূচনা করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহারই অভিনয় করিয়া বেড়াইয়াছেন। ভাগ্যবান যাঁহারা সে লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও মিলনের পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। হায়, আমরা যে সে আনন্দ হইতে কত দূরে পড়িয়া

আছি। কেবল চারশত কালের দূরত্ব নয়, কত যুগ যুগান্তরের অপরাধ সঞ্চয় করিয়া একটা পর্ব্বতের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া আছি। আমাদের উপায় কি হইবে ? এ দূরত্ব কি ঘুচিবে না ? এ পর্ব্বত কি সরিয়া যাইবে না ? আমরা যে দিন দিন প্রেমহীন হইয়া বিশ্রী হইয়া যাইতেছি। পুণ্যকে পদতলে দলিয়া পাপের কালি অঙ্গে মাখিয়া ভূতের রাজার অভিনয় করিতে চলিয়াছি ? আমরা যে মিলনের সুখময় সূত্র হইতে অযথা বিক্ষিপ্ত কুসুম সমূহের ন্যায় অসময়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি। কোথায় সেই মিলন সূত্র ? একটি একটি করিয়া বাঙালীর প্রাণ মিলন সূত্রে গাঁথিয়া আর কি দেবতার পূজার মালিকা রচনা করা যাইবে না ? সেদিন যেমন ভারতের নানা-স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের পদার্পণে মধুর মঙ্গল কীর্ত্তন ধ্বনি দিক্ সমূহের পবিত্রতা বিধান ও ভক্তবৃন্দের সুন্দরানন উদ্ভাসিত করিয়া আনন্দকেন্দ্রে মিলিত করিয়াছিল তেমন করিয়া কীর্ত্তনের সুরে কি মিলিত হইয়া আমরা ধন্য হইতে পারিব না ? কীর্ত্তনের সুরে আর কি শুনিব না—

"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে
সারঙ্গধর ! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥

চৈতন্য ভাগবত

কি সে বিরাট জনতা ! লক্ষ লক্ষ মানব প্রেমের মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন সমুদ্রে তরঙ্গের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অমঙ্গল দূরে অতিদূরে ভয়ে ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। দেবতাগণও মানবের সঙ্গী হইয়াছেন। মানবে দেবতায় মিশিয়া গিয়াছে। মানব না দেবতা তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে না। আহা কি অপূর্ব আস্বাদন। এমন জীব নাই যার চিত্তবৃত্তি এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনরস আস্বাদন করিয়া আপনাকে চিরকালের জন্য গৌরাঙ্গসুন্দরের দাসত্বে নিয়োগ না করিতেছে। রমণী-গণ জয়কার করিয়া হরি হরি বলিতেছেন। পরম লম্পট স্বভাবও প্রভুর হরিবোল ধ্বনিতে কাঁদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। কুটিল

স্বভাব সরলভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেমে বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। অভিমানের পাহাড় প্রীতিতে গলিয়া সুরধুনীধারার ন্যায় পবিত্র আনন্দ ধারার অনুকরণ করিতেছে। প্রেমের ঠাকুর কাহাকেও বাকী রাখিলেন না। দেশে দেশে তীর্থ দর্শন করিবার ছলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাওবা আপনার প্রেমময় পার্ষদ প্রেরণ করিলেন। এমনি করিয়া সমগ্র উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিলেন। পশ্চিমে গুজরাট, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট আসাম পর্যন্ত বাকী রহিল না। প্রভু আমার যে স্থানে পদার্পণ করিলেন সেই দেশবাসীকেই প্রেমে নাচাইলেন। প্রেমভক্তি ভারতের সকল প্রদেশের প্রাণের ভিতর রাজত্ব স্থাপন করিল। হায় কালের প্রভাবে সেই প্রীতির রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ। যেমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম ভারতের মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিতে পারে তেমন করিয়া আজও তাহা বুঝিতে পারিলাম কই ? ভাগ্যদোষে যে প্রেমধর্ম্ম সকল জীবকে একত্র মিলনের পথে দাঁড় করাইবে বলিয়া আশা তাহাই দেখিতেছি ঘৃণা, ঈর্ষা ও ভয়ের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। মুখের কথায় যদি প্রীতি প্রীতি বলিয়া চীৎকার করি আর কার্য্যে যদি "দূরে থাক" নীতির অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে মিলন চিরকালই অসম্ভব থাকিয়া যাইবে। সঙ্কোচকে দূরে ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ণ বিশ্বাসে, আত্মসমর্পণেই মিলনের প্রতিষ্ঠা। প্রীতি বিনা বিশ্বাস অসম্ভব। যাহাদের পদতলে নির্য্যাতিত করিয়াছ তাহারাই আজ তোমার পথের কাঁটা হইয়া বিদ্ধ করিতেছে। আজ তাহাদের প্রীতি আহ্বানে ডাকিয়া বুকের কাছে লইয়া এস। দেব মন্দিরের দূরে যাহাদের রাখিয়াছ কেমন করিয়া তাহারা তোমার মতন পবিত্র হইবে। মন্দিরের কাঁসর তাহাদের সমবেত করুক। সকলে গৌরসুন্দরের প্রেম পরশরতন পরশে সুবর্ণে পরিণত হউক।

জীব কি চায়? সুখ, সংসারের কোথাও আছে কি? প্রভুত্বে সুখ নাই

সম্পদে সুখ নাই। যাহারা ভোগ করিয়াছেন তাহারাই বলিয়াছেন, ভোগে সুখ নাই। ত্যাগেই সুখ—প্রিয়ের জন্য ত্যাগেই সুখ। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য যে পরিমাণ দুঃখ বরণ করিয়া লইতে পারিব ততই আত্মপ্রসাদ, সে পরিমাণই সুখাস্বাদন। হে গর্ব্বিত, হে অভিমানী, হে ধনী, ওগো কুলীন, তোমাদের গর্ব্ব, মান সম্পদ মর্য্যাদা তোমাদেরই ভালবাসার গৌরাঙ্গের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। এইটিই আজ তোমার বিশিষ্ট সাধন। ইহাতেই তোমার পুষ্টি আর ইহাতেই তোমার তুষ্টি বা সুখ। ইহারই নামান্তর প্রীতির অনুকূল অনুশীলন।

ভাবের আকুলতা

ভাব সততই ফুটিয়া উঠিবার জন্য আকুল। পেছনে অনন্ত কালের প্রেরণা নিরন্তরই উহাকে ফুটাইয়া রূপ দিবার জন্য অগণিত আঘাত করিতেছে। এই আঘাতের সমষ্টিই এক একটি জীবন। যত রূপ ভাব ও তত। অথবা এক এক রূপে অনন্ত ভাবের সমাবেশ। এই ভাবগুলির অন্তরে আবার বিশেষ রকমের একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা আছে। এই জন্যই ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা মাত্রই আমরা চীৎকার করিয়া উঠি বলি, এ খামখেয়ালী চলিবে না। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারি যে, এ খামখেয়ালীর মধ্যেও একটা নিয়ম আছে। তবে উহা একটা নিয়ম না মানিয়া চলিবার নিয়ম। এই দ্বিতীয় প্রকারের নিয়মের অনুবর্ত্তী মানুষের কখনও ইচ্ছা করিয়া হওয়া স্বাভাবিক নয়। কখনও দেখা যায়, কোন বিশেষ ব্যক্তি ঐ অস্বাভাবিক নিয়মেই চলিবার ব্রত লইয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অভিনব ভাবে চলিবার জন্য দায়ী ব্যক্তিগত ভাবে শুধু তাহাকেই করিলে চলিবে না। উহার জন্য দায়ী তাহার অতীত জন্মের স্মৃতি স্বপ্ন আর তাহার চারি-

ধারের রং-বেরংএর ভাবের প্রেরণা। এমন একটা ভাবের কিরণ জীবনের ধারাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে যে, তখন জীবন নদীর সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায় না ;. বরং ভাবই সেখানে নিজের ষোল আনা বাহাদুরী দেখাইয়া লয়। কবির রূপ তাহার মানস প্রতিমার রূপ নাও হইতে পারে। এমনও হয় যাহার ছবি আঁকিতে বসিয়াছিলেন, ঠিক তাহার রূপ ঐ ভাষাতে বর্ণনা করা যায় না। রূপের কারিগর যে তুলি আর বর্ণ বহুকষ্টে যোগার করিয়া বসিয়াছিলেন, হয়ত তাহার কোনটাই কাজে লাগিল না। গায়ক বহুদিন ধরিয়া সাধনা করিলেন রাগিণীর রূপ দেখাইবেন। গান গাহিবার সময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ ; সকলই নিস্ফল। এই সবগুলির ভেতর একটা কিন্তু সাধারণ কথা আছে। উহা ভাবের আকুলতা। অনাদি অতীতের কোন অজানা মুহূর্ত্ত হইতে তাহার স্পন্দন চলিয়াছে। কত আশা কত ভরসা। অদম্য উৎসাহ। অকুণ্ঠ গতি। চলিবেই। নাচিতে হইবেই। এ নৃত্য দোদুল ছন্দের সহিত বিশ্বশুদ্ধ সকলকেই নাচিতে হইবে। তাহার নিজেকে প্রকাশ করা না হইলে চলিবে না। বালকের মুখে সে ফুটিয়া উঠে। কত ছন্দে কত না রঙ্গ। যুবকের চেষ্টায় তাহার বিকাশ। কত না আশা আর কতই না আকাঙ্ক্ষায়। ভাব ভাবে এবারে আমি বিশ্ব জয় করিব। যাহা কিছু আছে সবই আমার হইবে আর আমিও সকলের হইয়া চিরকাল বিশ্ব জুড়িয়া থাকিব। সঙ্কোচ নাই কোন কুণ্ঠা নাই। কাল আসিয়া তাহাকে সরলভাবে ফুটিয়া উঠিতে বাধা দেয়, তাই সে চিন্তা বিবেচনা, সঙ্কোচের কুটিল পথে চলিতে থাকে। ভাব ফুঠিবেই। তাহাকে বাধা দিতে পারে কার সাধ্য ? তোমার আমার মনের মতন হইতে না পারে সেজন্য দোষ দিয়ে কি লাভ ? তাহাকে তোমরা দশ-জনের আশা আকাঙ্ক্ষা আর লোভের প্রেরণায় যেমন করিয়া তুলিয়াছ সে তেমনই ভাবে তোমার কাছে আসিয়াছে। তুমি তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লও, আর ঘৃণার চোখেই দেখ, সে মরিয়া যাইবার নয়।

বাঁচিবার জন্যই রূপ ধরিয়াছে, আর তার পূর্ণ রূপ পাওয়ায় শেষদিন পর্যন্ত জীবিত থাকিবেই। তুমি আত্মহত্যা করিতে পার, কিন্তু ভাবের টুটি টিপিয়া মারিতে পার না।

সাহিত্যে নানা যুগে বিভিন্নরূপে সেই একেরই প্রকাশ। নূতন রূপ দেখিয়া ভয় পাইতে পার, যেহেতু তাহাকে এইরূপে আর কখনও দেখা হয় নাই। পুরাণো রূপ দেখিয়াও যে ঘৃণা করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? কাজেই ভাব কোথা দিয়া প্রকাশ হইবে তাহা ভাবিয়াই আকুল। তখন তাহার গতি সুগতের গতি না হইলেও প্রগতি নিশ্চয়ই হইবে। এই গতিতে প্রাণের সারা খুব জবর। তবে জবরদস্তিটা কিন্তু কোনটারই ভাল নয়। যাতে এই ভাব বেশ করিয়া প্রাণ ভরিয়া পিপাসা মিটাইযা ফুটিয়া উঠিয়া সফল হইতে পারে, সেজন্য তাহাকে একটা স্থান দেওয়ার দরকার সকলেই অনুভব করিবেন। যে আকুলতা ভাবের গতির এই অভিনব রূপ দেখায় উহার গভীরতা কতখানি? সে কতকালের পুরাতন? শেষের দিন অন্ধকারের বুকে আগুন জ্বালাযে পথ চিনাযে দিবে তো? আমরা চাই চিরদিনের বন্ধুত্ব। ক্ষণকালের দেখা আর তারপর অনন্তকালের তৃষ্ণা তাহাতে আমাদের আশা মিটিবার নয়। পরিপূর্ণ ভোগ। অজস্র আমোদ। নির্বাধ সঙ্গ। তলিয়ে গিয়ে অর্থ খোঁজা ভট্টাচার্য্য মহাশয় করুন। শূন্যের দিকে চেয়ে চেয়ে জ্ঞানীরা অজেয়কে আরও ভীষণতম শূন্য করে তুলুন। তাহাদের শতবারের চেষ্টা নিস্ফল হয হউক। আমাদের ক্ষতি তাহাতে অতটুকুও নয়। আমরা চাই সহজ সরলভাবে সেই রূপকে যাঁহার সহস্র বর্ণে গন্ধে আলোকে পুলকে আকুলতা ব্যাকুল হইয়া অতুল আহ্লাদে পলে পলে গলিয়া চলে। আকুলতার ধারায় প্রাণের ধারে মিশাইয়া নূতন হইয়া জাগিয়া উঠে। যুগযুগান্ত ধরিয়া নূতন হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই যায়। দেহ বা কাল অথবা কোনও ব্যক্তিবিশেষের যে অতটুকুও সঙ্কোচ করে না। প্রীতি যাঁহার নূতন

অভিব্যক্তি। অনন্তকালে তৃষা মিটাতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। প্রতিজ্ঞা তাঁহার আপনাকে ধরা দিবার। বাসনা তাঁহার পরকে আপন করিবার। কামনা তাঁহার মরম দিয়া ভালবাসিবার। আমরা তাহাকেতো জানিনা? সে শত কোটিবার তোমাকে ডাকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তুমি কি তাহার খবর রাখ? ভিতরে বাহিরে তাহার নয়ন চিরকাল নিদ্রাহীন হইযা তোমারই দিকে চাহিযা আছে। তোমারই কথা ভাবিযা ভাবিযা তাঁহার হাসিমুখে বিষাদের ছাযা লক্ষ্যের বিষয হইয়া পডিযাছে। তোমারই জন্য তাঁহাকে কু-লোকে কত কথা বলিযা গালি দিতেছে। "তোমার নাকি কোন গুণ নাই? কোনো রূপ নাই? তুমি নাকি কঠোর বিচারক? আমি ত কখনো তোমাকে এভাবে দেখি নাই। তুমি যে সকল ভাবের মধ্য দিযাই তোমার মধুর কোমল স্বরূপটিকেই প্রকাশ করিযা দিতেছ। আর কেন, ভাব ভোলা তোমার ভাবের খেলার শেষ নাই। কতদিন তুমি আর এ ভবের ভব চালাইবে। তোমার চরণে আমরা ভবের ভযে শরণ লইতেছি। আমাদিগের অন্তরে তোমার সেই ভাবের সাডা দাও যাহাতে তোমার মোহন করুণ স্বভাবটি ফুটিযা উঠে। ওগো ভাব চোর আমাদের অন্তর পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হও।"

শিশির রুচির

যব্ দেখি পৌষহি মাস।
তব্ তেজলু জীবনক আশ ॥

হে সাধক, পৌষমাসে গৌরাঙ্গ-বিরহ-বিধুরের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ ছড়াইয়া গিয়াছে—পৌষ-পার্ব্বণে অতি দীন দুঃখীও একটু সুখ একটু আনন্দ পাইবে বলিয়া আশা করিয়া রহিয়াছে। গৌর-বিরহীর কিন্তু চিরদিনই দুঃখ, আর এই দুঃখটুকু বুকে করিয়াই সে ধন্য। সে ভাবিতেছে, না জানি কোন্ দেশে এই শীত ঋতুতে গৌরসুন্দর আমার বিহার করিতেছেন! সে দেশ না জানি কেমন? সেখানেও কি আমাদের দেশের মতই হিম পড়ে? প্রবল শীতের বাতাসে সে দেশে কি এ দেশের মতই জনগণের সকল অঙ্গ কাঁপাইয়া দিয়া যায়? তরুলতার পত্র পল্লব কি এমনই করিয়া শীতের প্রকোপে ঝরিয়া পড়ে? ওগো! আমার গৌরসুন্দর শীতের বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কি? যে প্রভু সনাতনের অঙ্গের ভোট কম্বলের দিকে বার বার কৃপা-নয়নে চাহিয়া তাঁহার ভোট কম্বল-খানা পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইয়াছেন—যিনি শ্রীগম্ভীরার মন্দির মধ্যে শায়িত শ্রীশঙ্করের অঙ্গে আপন ছিন্ন-কন্থা জড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন—যিনি কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া স্বদেশ ও বন্ধু দূরে রাখিয়া সকলের অগোচরে আজও বিহার করিতেছেন, তাঁহার সন্ধান তোমরা একবার লইবে কি?

যো দেশে পহু পরচারি ভেল
গেল তা সব দুঃখ রে।

মঝু প্রাণ পামর বিরহ জর জর
দেহ জনু তরু শুষ্ক রে ॥

যাঁহার অন্তরে বিরহ বেদনা জাগিযাছে তাহার অবস্থা এইরূপই হইযা থাকে। তাহার নিকট পৌষের প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকের ন্যায প্রতিভাত হয।

সাধারণতঃ দেখা যায রসশাস্ত্রকারেরা এবং সাধারণ কবিগণ কাব্য-রসের বিচিত্র সম্পত্তি বসন্তকালের ও বর্ষাকালের বর্ণনাতেই অধিক পরিমাণে ব্যয করিযাছেন। শরৎকালেরও কিছু কিছু বর্ণনা আছে, তবুও তাহাতে রসিক-রসিকার বসন্তকালের উল্লাস বিশেষ প্রকটিত হয নাই। শুধু তাহাই নহে, শীত ঋতুব বর্ণনায এই সকল কবিগণ বিশেষ উল্লসিত হযেন নাই। তাহাদিগের অনেকের এই ভাব মনে আছে যে, শীতঋতু জডতাই আনযন করিযা দেয, কিন্তু উল্লাস বিশেষ প্রকাশ করিযা দেয না। ভক্তি-রস শাস্ত্র এইরূপ ভেদ-দৃষ্টিতে ঋতু নিচযকে দর্শন করেন নাই। তাহারা ভগবদ বিরহেব সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশেই বৈচিত্র্য অনুভব করিযা পরবর্ত্তী সাধকগণকে অনুগ্রহ করিযা আস্বাদন করাইবার জন্য বর্ণনা করিযাছেন। কাজেই দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, মাসে মাসে, লীলা মাধুর্য্যের অনন্ত বিচিত্র আস্বাদনে ভক্ত সাধকগণের ভাবময অন্তর রস পরিপুষ্ট। এই ত মাঘ মাস আসিতেছে একবার গৌর সুন্দরেব সম্বন্ধ লইযা ভাবিযা দেখুন দেখি এই মাঘ মহিমা। বিষ্ণুপ্রিযা ঠাকুরাণী, শচীদেবী ও নদীযা নাগরিকের অন্তরের সহিত একতান হইযা ভাবিযা দেখিলে কেহ কি আর মাঘ মাস হাসিযা কাটাইতে পারিবেন? বিষ্ণুপ্রিযা দেবী বলিলেন—

পহিলহি মাঘ গৌরবর নাগর
দুঃখ সাগর হাম ডাবি।
রজনীক শেষে সেজ সঞে ধাওল
নদীয়া করিযা আন্ধিযারি ॥

নদীয়াবাসীর দুঃখের আর অবধি নাই। নদীয়ার জনগণের নয়নের-মণি জীবন-সর্ব্বস্ব এই মাঘ মাসে হারাইয়া গিয়াছে। শচীর দুলাল সকলকে দুঃখের সমুদ্রে ফেলিয়া সন্ন্যাস লইয়া বিদেশী হইয়াছেন। এই মাসে তাই গৌর-ভাবুকের আর কিছুমাত্র সুখ নাই। গৌরসুন্দরের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বতঃই নিতাইচাঁদের কথা, পরম দয়ার অবতারের কথা মনে পড়িয়া যায়। আমার প্রভুর প্রভু নিতাইচাঁদ এই মাঘ মাসেরই শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিখিল ভুবনের পাপ-তাপের ভয় দূর করিয়া লোক-লোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হায়! কোথায় গৌরসুন্দর, আর কোথায়ই বা নিতাইচাঁদ। হে পরম দয়াল প্রভু দুইজন, একবার কৃপা করিয়া দেখা দিবে কি? শুধু একটি-বার তোমাদের রাতুল চরণ দেখাইয়া—লোভে আকর্ষণ করিয়া শ্রীচরণের সেবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া লও। এই মানব জীবন ধারণ করা আমার সার্থক হইয়া যাউক।

"সজনি কিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ
এবে ভেল দুঃখ পরচুর॥"

গৌর সুন্দরের আবির্ভাবে যেমন প্রচুরতর আনন্দরাশি নবদ্বীপধামে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল তেমনই গৌর বিরহে প্রচুরতর দুঃখ আসিয়া বাসা করিয়া লইয়াছে। যে দিকে নয়নপাত করা যায়—শুধু হাহাকার—হতাশ্বাস—শূন্যতা আর ক্রন্দনের রোল!

নিজ সহচরীগণ রোয়ত অনুখন
জননী লুঠত মহী রোই।
হা হা মরি মরি করি করি ফুকরই
অন্তর গর গর হোই॥

গৌরবিরহসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে সকল নদীয়া বুঝি এই বিরহ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। সান্ত্বনা দিবার যে কোনই উপায় দেখিতেছি না।

না হেরিয়ে সো মুখ ফাটিয়া যে যায় বুক
প্রাণ ফাঁফর হোয় রি।
কেশব ভারতী মন্দমতি অতি
কয়ল প্রিয় যদি সোঁয় রি॥

যাঁহারা নিরন্তর গৌরাঙ্গলীলা রস-সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন তাহারাও ভাবনিধি প্রভুটিকে অনবরতই রাধা-গোবিন্দলীলা রস-আস্বাদনেই বিভোর দর্শন করিতেছেন।

রাধাভাবে নিত্য আবিষ্ট গৌরসুন্দর সুরধুনী তীরে আপন ভক্তগণ সহ গমন করিলেন। নবীন ভাণ্ডীর বৃক্ষের তলে অতিশয মনোরম স্থানটিতে গিয়া প্রভু ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিলেন। একে শীতের রাত্রি তাহাতে চন্দ্রের সুশীতল জ্যোৎস্নারাশি, থাকিয়া থাকিয়া হিমালয়ের পবন মৃদু মৃদু বহিযা যাইতেছে। প্রভুর কি জানি কিরূপ ভাব উদয় হইল। সুরধুনীর তীরেই শয্যা রচনা করিয়া প্রভু কাহার যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে এদিকে-ওদিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিয়া কাহার যেন আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রহিলেন। কখনও বা চন্দ্রকিরণে প্রতিবিম্বিত আপন অঙ্গের প্রতিচ্ছাযা দর্শন করিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। যেন কে আগমন করিয়াছেন। যেন তাঁহাকে আদর করিয়া অভিনন্দন করিয়া শয্যার নিকটে লইয়া আসিতে হইবে।

রসিক ভক্তগণ গৌরাঙ্গ লীলারসে ডুবিয়া গিয়া দর্শন করিতেছেন প্রভু আমার বাসক-সজ্জার ভাবে বিভোর। যমুনার তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জ কাননে শ্রীবৃন্দাদেবীর সুরচিত মন্দিরে শয্যা রচনা করিয়া বৃষভানু-সুতা অপেক্ষা করিতেছেন। যোগী-ধ্যানী যেরূপ আপন পরম দেবতার চিন্তায় নিখিল মনোবৃত্তিকে ডুবাইয়া দিয়া তাহার সন্দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া দিবস যামিনী জাগিয়া থাকেন সেইরূপ শ্রীরাধাও শয্যা রচনা করিয়া শ্যামসুন্দরের ধ্যানে ডুবিয়া রহিয়াছেন। অঙ্গাবরণ মাত্র নীল

নিচোল তাহাও আবার পবনের প্রতাপে অঙ্গ হইতে বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। সুকুমারী—রাজকুমারী আর কত দুঃখ সহ্য করিবে? চারিদিকে চাঁদের আলো মন্দিরও আঁধার নয় সেখানেও রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু যাহার আশায় এইরূপ বসিয়া থাকা তাহার মিলন ঘটিল কই? মাঝে মাঝে বৃক্ষ-পল্লবে পবন দোল দিয়া যাইতেছে ইহাতে রাধার অন্তরেও বিরহের দোল দিয়া দিতেছে। নয়নে ধারা রাধা বার বার সচকিত নয়নে শ্রীগোবিন্দর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের পানে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। প্রাণেশ্বরীর এই অবস্থা সন্দর্শন করিয়া প্রিয়সহচরী অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"হে প্রাণকৃষ্ণ, তোমার প্রাণে কি অতটুকুও দয়ামায়া নাই! তুমি অমন করিয়া রাধাকে আর কত কাঁদাইবে? একবার নিকুঞ্জ কাননে উদয় হও। প্রাণেশ্বরীর প্রাণ রাখ।"

রাধা পাগলিনীর মত হইয়াছেন। কখনও কৃষ্ণ মনে করিয়া তমালকেই বৃথা সম্বোধন করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই তমালের স্বরূপ পরিচয়ে বিশ্রব্ধ হইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

মাধব! সমুঝব তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥

কখনও অতি বিলম্ব দর্শন করিয়া একাকিনী কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন বুঝি প্রাণের কৃষ্ণ আজ নিকুঞ্জ-মন্দিরের পথ ভুলিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই এত বিলম্ব নতুবা তাহার না আসিবার আর কোনও কারণ ত দেখিতেছি না।

'এই বুঝি প্রাণনাথ আসিলেন' এই চিন্তা যতই গাঢ়রূপে অন্তরে জাগিয়া উঠিল ততই শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কর্ণযুগলে নূপুর সিঞ্জিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা-ভাব বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর রাধার বিরহ-তরঙ্গে যতই ডুবিতেছেন ততই অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে। তখন—

চৌদিশে চাঁদ চাঁদনী চাহি চমকিত
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে কানু নাহি মিলল
কী ফল কায বিলাস॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহি কীর্ত্তন
কান্তক কামন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর পহুঁ
ভণ যুগ-পাবন ধর্ম্ম॥

রসাস্বাদন লোলুপ শ্রীগৌর সুন্দর ভাব-গাম্ভীর্য্যে ডুবিযা রহিযাছেন, ভক্তগণের অন্তরেও শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর বাণী প্রতিধ্বনিত হইযা উঠিতেছে। তাঁহারা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন, রাধা ঠাকুরাণী বলিলেন—

বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিযা পোহাই॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিম-ঋতু পবনে মোর হিয়া চমকায়॥

প্রিয় সহচরী আর থাকিতে পারিলেন না। অমনি শ্যামসুন্দরের নিকট গমন করিয়া রাধার বিরহ সন্দেশ নিবেদন করিলেন। হে মাধব, আর দেরী করিও না। তোমার বিরহে প্রাণ প্রেষ্ঠা রাধার কি দশা হইয়াছে একবার দেখিয়া যাও। দরদর ধারায় নয়নের বারি বহিয়া যাইতেছে। বনের পশু পাখী পর্য্যন্ত রাধার আকুল ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছে।

শ্যামসুন্দর প্রিয় সহচরীর বাণী শ্রবণ করিয়া আকুল প্রাণে প্রাণেশ্বরীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। যখন রাধার "শিশির-রুচির" নামক কুঞ্জ-বাটিকাতে আগমন করিয়া শ্যামনাগর প্রিয়াজীর সহিত মিলিত হইলেন, তখন—

হেরইতে দুহু জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভব-সিন্ধু॥

একদিন বন-ভ্রমণের অবসরে বৃন্দাদেবী এই শিশির-রুচির নামক বনপ্রদেশ শ্রীরাধাগোবিন্দকে সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই বনে প্রবেশ মাত্র শীতে অঙ্গ কম্পিত করিয়া দিতেছিল, আবার উচ্চ সুবিশাল বৃক্ষসমূহের নিম্নদেশে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাব আশ্রয় হওয়াতে উহা অতি সুখময় স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। বান্ধুলী কুসুমে, দমনকে ও কুন্দ-কান্তিতে উদ্ভাসিত সেই বনপ্রদেশ ভরদ্বাজ ও হারীত পক্ষীর কলরবে রাধা গোবিন্দের পরমানন্দ বিধান করিতেছিল। বৃন্দাদেবী পরমাদরে রাধা-কর-কমল-বরে বিচিত্র গ্রন্থিযুক্ত এক কুন্দ-মালা সমর্পণ করিলেন। রাধা ঠাকুরাণী সেই কুন্দমালা নিজ করে ধারণ করিয়া গোবিন্দের গলায় পরাইয়া দিলেন। কুন্দ কুসুম স্বভাবত শ্বেতবর্ণ কিন্তু রাধার কর-কমলের আভায় উহা রক্তিমাভাযুক্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল, উহাই আবার গোবিন্দের কণ্ঠে বিলম্বিত হইলে ইন্দ্রনীলমণিকান্তিবিনিন্দিত অঙ্গের আভায় নীলকমলের শোভা ধারণ করিয়াছিল। শীত ঋতুর প্রবৃত্তি হইলে শ্যামসুন্দর সেই পূর্ব্ব পরিচিত শিশির-রুচির কুঞ্জ মধ্যে রাধা-সঙ্গে বিহার করিয়া বৃন্দাদেবীর নিকুঞ্জ-রচনা সাথক করিলেন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে সেই সকল লীলা নিত্যই স্ফূর্ত্তি পাউক।

শ্রীদামোদর প্রিয়

দামোদরং প্রপদ্যেহং শ্রীরাধারমণং প্রভুম্ ।
প্রভাবাদ্‌যস্ত তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ সেবিতো ভবেৎ ।

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীহরি ভক্তি-বিলাসগ্রন্থে স্কন্দ পুরাণ পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়া কার্ত্তিক ব্রতের নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব মাত্রেরই শ্রীদামোদরপ্রিয় কার্ত্তিক ব্রত অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। রাধারমণ দামোদরের কৃপালেশযুক্ত হইলেই তদীয় প্রিয়তম মাসকার্ত্তিক কৃত্যাদি লিখিয়া বা ব্রত আচরণ করিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা লাভ ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অতএব সবব প্রথমে আমরা ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরেরই শরণাপন্ন হইলাম।

গৌরগত প্রাণ শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামী কৃপা করিয়া যেরূপভাবে কার্ত্তিককৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন আজ আমরা তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিব। বৈষ্ণবগণ যদিও প্রত্যহ ভগবদর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন তথাপি অপার করুণাময়ী লীলা দামবন্ধনদ্বারা যে কার্ত্তিক মাস পবিত্রীকৃত হইযা রহিয়াছে সেই পুণ্য মাস সমাগত হইলে বিশেষ ভাবে প্রাতঃ স্নানান্তে শ্রীদামোদর দেবের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। প্রথম হইতে শেষ পুণ্যতিথি প্রাপ্ত হইয়া আরও বিশেষ বিশেষ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া এই মাস কাটাইতে পারিলে মানব জন্মের সফলতা অচিরে উপলব্ধি হইয়া থাকে। অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে শাস্ত্রে এই কার্ত্তিক ব্রতধারীর বিশেষ প্রশংসা ও বিপরীত ভাবাপন্নের অশেষ নিন্দা প্রকাশিত আছে। পিতৃকৃত্য, ঋষিকৃত্য, দেবকৃত্য, ভূতকৃত্য বা অন্য যে কোন কর্ত্তব্য মানবের আছে একমাত্র কার্ত্তিক ব্রত করিলে তাহার

সমগ্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আবার এই কার্ত্তিক ব্রতের অকরণে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইলেও সম্যক্ ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এইরূপ অনেক প্রমাণ আছে সকলগুলিই তুল্যবল তাহার একটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি ;

স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে যথা—

যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।

সর্ব্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥

সর্ব্ব তীর্থে স্নান সর্ব্বপ্রকার বস্তুর দান বা সদক্ষিণা যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অথবা যে কোন প্রকার পুণ্যকার্যের আচরণ সকল একদিকে, কার্ত্তিক ব্রতের সেবা অন্যদিকে। তুলনা করিলে কার্ত্তিকেরই মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বাদশ মাসের মধ্যে এই মাসই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, অতএব শ্রীভগবদ্ উদ্দেশ্যে এই সময় যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা অনন্তকাল পরম আনন্দের হেতু হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন করে। আরও বিশেষ এই, যেমন এই মাসের দেবতা, তেমনই এই মাস করুণাময়—

যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।

তস্যায়ং তাদৃশমাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ। (পদ্মপুরাণ

আমাদের দেশে নানাপ্রকার ব্রতাদির আচরণ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ব্রতের সহিত তুলনা যদিও অনুচিত, যেহেতু অন্যগুলি কামনা পরিপূর্ত্তির জন্য কৃত হইয়া থাকে—আর এই ব্রত ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি ইহাকে ব্রতদিগের নৃপতিরূপে বর্ণনা করিলে অতিশয় উক্তি হইবে না। যেহেতু অন্যান্য ব্রতের ফল একজন্ম স্থায়ী আর এই ব্রতের ফল শত শত জন্ম পর্যন্ত উপভোগ করা যায়। এমন কি কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় অক্রূরতীর্থে উপবাস পূর্ব্বক স্নান করিয়া যে ফল লাভ হয় এই কার্ত্তিক ব্রতের নিয়ম শ্রবণ মাত্রেই সেই ফলোদয় হইয়া থাকে। যথা—

অক্রূরতীর্থে বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিক্যাং সমুপোষ্য চ।

স্নাত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তচ্ছ্রুত্বা বৈষ্ণবং ব্রতম্॥ স্কন্দপুরাণ।

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তথা পিতৃপুরুষের তর্পণাদি যাহার আচরণ না করিলে শাস্ত্রানুসারে পাতিত্য দোষ জন্মে তাহা হইতে এই ব্রত মাহাত্ম্য অধিক। ইহার অনুষ্ঠানে পাতিত্য দোষ রহিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়—

অনিষ্ট্বা চ সদা যজ্ঞৈর্কৃত্বা পিতৃভিঃ স্বধাম্

ব্রতেন কার্ত্তিকে মাসি বৈষ্ণবস্তু পদং ব্রজেৎ॥

যদিও ভক্ত্যঙ্গের সহিত কর্ম্মাঙ্গের তুলনা কোন প্রকারে সুসঙ্গত নহে তথাপি সাধারণের প্রতি কৃপালু ভট্ট গোস্বামী পাদ যে কোনও প্রকারে ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত করাইবার জন্য শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিতে এই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। যেদিক্ হইতে বিচার কর না কেন, সর্ব্বপ্রকারেই ব্রতরাজের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইবেই। নানাপ্রকার নিয়ম থাকিলেও কার্ত্তিকে পাঁচটি সাধনাঙ্গের কথাই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথা ঃ—

হরি জাগরণং প্রাতঃস্নানং তুলসী-সেবনম্।

উদ্‌যাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে॥

পঞ্চভি ব্রতকৈরেভিঃ সম্পূর্ণং কার্ত্তিকে ব্রতী।

ফলমাপ্নোতি তৎপ্রোক্তং ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্॥

হরি জাগরণ, প্রাতঃস্নান তুলসীসেবন, উদ্‌যাপন ও দীপদান। এই পাঁচটি নিয়ম প্রতিপালন করিলেই কার্ত্তিক ব্রতের ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদ ফল প্রাপ্তি হয়। শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরেই তৎপ্রীতির জন্য জাগরণ করা কর্ত্তব্য অলাভে শ্রীশিব মন্দিরে, অশ্বত্থ অথবা তুলসী কানন মধ্যেও হরি জাগরণ করিবে। যথা—

বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্।

কুর্য্যাদশ্বত্থ মূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ॥

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যিনি কার্ত্তিক মাসে অরুণোদয়ে

জাগরণ করেন এবং শ্রীদামোদরের নিকট অবস্থান করেন তাহার সহস্র গোদান জন্য ফল লাভ হয়। যিনি শেষ প্রহর শ্রীভগবৎ সন্নিধানে জাগরণ করিয়া থাকেন শ্রীবিষ্ণুর পদ তাঁহার করতলগত যথা—

জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে।
দামোদরাগ্রে বিপেন্দ্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
জাগরং পশ্চিমে যামে যঃ করোতি মহামুনে।
কার্ত্তিকে সন্নিধৌ বিষ্ণোস্তৎ পদং করসংস্থিতম্ ॥

দ্বিতীয়তঃ স্নানের মাহাত্ম্যও বিশেষ বলা হইয়াছে। যথা—

তিলদানং নদীস্নানং সৎকথা সাধু সেবনং।
ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কার্ত্তিকে মুক্তিদায়কম্ ॥

এই প্রমাণে নদীস্নান মুক্তিদায়ক। আরও কথিত আছে যদি এমন কোনও স্থানে বাস করিতে হয় যে, সন্নিকট প্রদেশে কোনও নদী পাওয়া যায় না, অথবা কোন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া প্রাতঃস্নানে অশক্ত, এই অবস্থায় কেবল মাত্র জলস্পর্শ না করিয়াও শুদ্ধ হওয়া যায় তখন একমাত্র জগত-পাবন শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার মালিন্য বিদূরিত করিয়া থাকে। যথা—

আপদ্‌গতোযদাপ্যম্ভোন লভেৎ সবনায় সঃ।
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্ ॥

সমর্থ পক্ষে প্রাতঃস্নানই কর্ত্তব্য যেহেতু—

কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুগ-দান্তঃ সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী তুলসী সেবন দ্বারা কার্ত্তিক ব্রতধারী অচিরেই শ্রীরাধাগোবিন্দ কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তুলসী পালন মহিমায় এমন কি শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য লাভের কথা পর্যন্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায় যথা—

স্নানং জাগরণং দীপং তুলসী বন পালনং।
কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ॥

কার্ত্তিকব্রত গ্রহণ করিয়া পরিশেষে শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবশাস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ব্রত উদ্‌যাপনের বিশেষ বিশেষ নিয়ম জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীভগবৎপ্রীতির জন্য ব্রত সাঙ্গ করিতে হয়। যদি শাস্ত্রানুযায়ী উদ্‌যাপন বিধি সম্যক্ পালন করা না যায় বা কেহ তাহা করিবার উপযুক্ত ঋদ্ধিমান না হন, তাহা হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়। যথা—

উদ্‌যাপনং বিধিং কর্ত্তুমশক্তো যো ব্রতেস্থিতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজযেচ্ছক্ত্যা ব্রতসম্পূর্ণ হেতবে॥

যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজনেই ব্রাহ্মণ্যদেব শ্রীদামোদর তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ ব্রত ফল দান করিবেন। শ্রীভগবৎসমীপে, তুলসী বনে, বট ও অশ্বত্থমূলে, দীপদানের ফল শাস্ত্রে বারংবার কথিত আছে। তাহা আবার পুণ্য কার্ত্তিক মাসে দীপদানের মাহাত্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকার বীজাণু প্রভৃতির সন্ধান লইয়া এই মাসে আকাশ প্রদীপ দানের কর্ত্তব্যতা ও উপযোগিতা বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেছেন। শাস্ত্র বহু পূর্ব্ব হইতে পিতৃপুরুষের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য এবং তাহাদের একলোক হইতে লোকান্তরে যাইবার সময় আলোক দেখাইবার জন্য নানাপ্রকার বিধি করিয়া দীপদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালযে।
উজ্জ্বল জ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তোব্রজন্তু তে॥

বৈজ্ঞানিক যাহা বিজ্ঞানসম্মত স্বীকার করেন, ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা ধর্ম্মসম্মত বলিয়া বিধি দেন, ভক্তিশাস্ত্রও তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদিও এখানে উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যিনি যেটুকু লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন,

তিনি সেটুকুরই অধিকারী হইবেন। দীপদান মহিমা বলিতে স্কন্দপুরাণ অনেক কথাই বলিয়াছেন। যথা—

শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে কেশব প্রিয়ম্।
দীপদানেন বিপেন্দ্র ন পুনর্জায়তে ভুবি॥
রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে।
তৎফলং কোটি গুণিতং দীপদানেন কার্ত্তিকে॥
ঘৃতেন দীপকো যস্য তিলতৈলেন বা পুনঃ।
জ্বলতে মুনিশার্দ্দ্ল অশ্বমেধেন তস্য-কিম্॥

আরও সুন্দর একটি কথা পিতৃপুরুষগণ প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটি এই—আমাদের কুলে পিতৃভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর সন্নিধানে প্রদীপ দান করিবে তখনই আমরা মুক্তিলাভ করিব। যথা—

শ্রূয়তে চাপি পিতৃভির্গাথা গীতা পুরা দ্বিজ।
ভবিষ্যতি কুলেহ স্মাকং পিতৃভক্তঃ সুতোভুবি॥
কার্ত্তিকে দীপদানেন যস্তোষয়তি কেশবম্।
মুক্তিং প্রাপ্স্যামহে নূনং প্রসাদাচ্চক্র পাণিনঃ॥

যত প্রকার দান আছে সর্ব্বাপেক্ষা কার্ত্তিকে দীপদানেরই মহিমা অধিক। এমন কি স্বয়ং দীপদান না করিতে পারিলেও যদি পরের প্রদীপ শ্রীভগবানের মন্দিরে বিগ্রহ সম্মুখে প্রজ্বলিত করিবার সৌভাগ্য ঘটে তাহাতেও অপার কৃপার ভাজন হওয়া যায়। যথা—

নতদ্ভবতি বিপেন্দ্র ইষ্টৈরপি মহামখৈঃ।
কার্ত্তিকে যৎফলং প্রোক্তং পরদীপপ্রবোধনাৎ॥

পদ্মপুরাণ কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে সুন্দর একটি উপাখ্যান আছে তাহা দ্বারা বেশ উপলব্ধি হয়, কেমন করিয়া ভক্ত্যঙ্গের আভাসের দ্বারাও

দুর্লভ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে একাদশী তিথিতে প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে, এমন সময় এক মূষিকা শ্রীভগবৎ মন্দিরে স্থিত সেই নির্ব্বাপিত প্রায় দীপের অবশিষ্ট স্নেহ পদার্থ গ্রহণ করিবার জন্য যেমন চেষ্টিত হইয়াছে তাহার তুণ্ডের যোগে অমনি প্রদীপ বর্ত্তিকা সরিয়া যাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শুনা যায়, এই মূষিকা পরজন্মে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শেষে পরম গতি লাভ করিয়াছিল। যথা—

একাদশ্যাং পরৈর্দ্দত্তং দীপং প্রজ্জ্বাল্য মূষিকা।
মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপ সা॥

একটি দীপদানের মাহাত্ম্য হইতে দীপমালার দান যে অধিক মহিমাময় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবেনা। বিশেষ জিজ্ঞাসু শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস দেখিয়া লইবেন।

কার্ত্তিকে অন্যান্য কর্ত্তব্যেরও নির্দেশ আছে যথা—

গীতাশাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যোনয়েন্নরঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ময়া দৃষ্টা কলিপ্রিয়॥

কার্ত্তিকে গীতা শাস্ত্রাধ্যায়ীর পুনর্জন্ম লইতে হয় না। ইহা ভিন্ন শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে প্রদক্ষিণ, গীতবাদ্য, নৃত্য শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ, গজেন্দ্র মোক্ষণ পাঠ বা শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র পাঠাদি করিয়া কার্ত্তিক ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। যথা—

নিয়মেন কথা বিষ্ণোর্যে শৃন্বন্তি চ ভাবিতাঃ।
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদম্বা কার্ত্তিকে গোশতং ফলম্॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥
শ্রেয়সা লোভবুদ্ধ্যা বা যঃ করোতি হরেঃ কথাম্।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কুলানাং তারয়েচ্ছ তম্॥

আরও—

য পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশ পূরণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

নিত্য একটি মাত্র ভাগবতের শ্লোকপাঠ করিলেও অষ্টাদশ মহা-পুরাণ পাঠের ফল কার্ত্তিক মাসে লাভ হইয়া থাকে। সময়ে বৈষ্ণব সঙ্গকরা অশেষ ফলদায়ক কারণ শাস্ত্রে বলিতেছেন,

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ ॥

ভূমিশায়ী হইয়া হবিষ্যভুগ্ হওয়ারও ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। স্থান বিশেষে ব্রতাচরণে ফলাধিক্য হয় বলিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন—

যত্র কুত্রাপি দেশে যঃ কার্ত্তিক স্নানদানতঃ।
অগ্নিহোত্র সমফলঃ পূজায়ঞ্চ বিশেষতঃ ॥
কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণো গঙ্গায়াঞ্চাপি তৎসমঃ।
ততোহধিকঃ পুষ্করে স্যাদ্দ্বারকায়াঞ্চ ভার্গব ॥
কৃষ্ণসালোকদোমোসঃ পূজাস্নানৈশ্চ কার্ত্তিকে।
অন্যাঃ পূর্য্যস্তৎ সমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা ॥
দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্ যতঃ কিল।
মথুরায়াং ততশ্চোর্জ্জে বৈকুণ্ঠ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে ॥

যে কোন দেশে কার্ত্তিক স্নানদানে এবং শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে অগ্নিহোত্রসম ফল লাভ হয়। কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাতীরে কোটিগুণ। তাহা হইতেও অধিক পুষ্কর ও দ্বারকায়। অন্য পুরী সকলেরই তাহার সমান ফল। যেহেতু মথুরা মণ্ডলে শ্রীভগবান্ দামোদর হইয়া ভক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন সেই জন্য উর্জ্জাব্রতের সময় মথুরা বাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মহিমায় মথুরা মণ্ডলই পরমাবধি। রাত্রির শেষে শ্রী ভগবানের প্রবোধন করিয়া মঙ্গল আরত্রিক প্রভৃতি দর্শনের নিয়ম গ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই এই

উর্জ্জাব্রতের আর একটি নাম নিয়ম-সেবা। নিয়ম—সেবার এই সময় বিশেষ করিয়া কলাই, শিম, কলমীশাক, বেগুন প্রভৃতি ভোজন করিবে না। প্রত্যহ শ্রাদামোদরের অর্চ্চনাদি করিয়া শ্রীদামোদরাষ্টক পাঠ করিবে। এই প্রকার নিয়মসেবা অঙ্গীকার করিলে শ্রীরাধা দামোদর অচিরেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম শ্রীরাধা কুণ্ডে স্নান করিলে ভগবান্ বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে গৃহের বহিঃপ্রদেশে যমদীপ দিতে হয়, এই বিষয়ে পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণ পক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।
যমদীপং বহির্দ্দত্যাদপমৃত্যুর্বিবনশ্যতি॥

তৎপর কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে শ্রীধর্ম্মরাজ পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
স্নানমবশ্যং কার্য্যং নরৈর্নরক ভীরুভিঃ॥

অমাবস্যাতে দিবাভোজন না করিয়া প্রদোষ সময়ে যথোচিত শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিবে। যথ,—

দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্।
প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ যথাক্রমম্॥

এই দিবসই প্রদোষে দীপমালা দ্বারা শ্রীভগবন্মন্দিরাদি সজ্জিত করিতে হয়। ইহারই অপর নাম দীপাবলী বা দেওয়ালি। শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা করিয়া গো সকলের তুষ্টি বিধান করিতে হয়। যথা—

প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্যদ্যূতঞ্চৈব সমাচরেৎ।
ভূষণীয়াস্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহবাহনাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন ভূধরঃ
শুক্ল প্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোত্র বৈষ্ণবৈঃ॥

গোবর্দ্ধন পূজা সম্বন্ধি প্রতিপদ তিথিতে সন্ধ্যাকালে শ্রীবলি মহারাজের পূজা করিতে হয়। তাহার ব্যবস্থাদি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে

দ্রষ্টব্য। শুক্ল দ্বিতীয়ায় কার্ত্তিকমাসে যমরাজ পূজার কথাও স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে আছে। যথা—

উর্জ্জে শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে যমমর্চ্চয়েৎ।
স্নানং কৃত্বা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি॥

কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীই গোপাষ্টমী বলিয়া খ্যাতা। এই গোপাষ্টমীতে বৎসপালক শ্রীব্রজরাজ কুমার গোপ হইয়াছেন। অতএব

তত্র কুর্য্যাদ্গবাং পূজাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং
গবানুগমনং কার্য্যং সর্ব্বান্ কামানভীপ্সতা॥

উত্থান বা প্রবোধনী একাদশীর মাহাত্ম্যে নানাভাবে ও ভাষায় পুরাণ সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিথির সেবা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। পুরাণ বলিতেছেন—

জন্ম প্রভৃতি যৎপুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎসর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্॥

বোধবাসর নির্ণয় প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বিচার করা হইয়াছে। সেই সকল বিচার সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে। উত্থানের পর শ্রীভগবানের রথযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যথা—

বেদস্তুত্যাদিনা স্তুত্বা স্বস্ত্যস্ত্বিত্যাদিনা প্রভুম্।
সংপ্রার্থ্য গীতবাদ্যাদি ঘোষৈরারোহয়েদ্রথম্॥

ভগবান্ রথে আরোহণ করিলে বিবিধ বাদ্যাদি সহকারে রথস্থিত ভগবানকে রাজা স্বয়ং নগরে ভ্রমণ করাইবে। যুধিষ্ঠির নারদ সংবাদের এই বাক্যটি বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচ্য। রাজা স্বয়ং রথস্থ ভগবানের নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিবেন এইটিই বিধি। যথা—

মহাতূর্য্যরবৈ রাত্রৌ ভ্রাময়েৎ স্যন্দনে স্থিতম্।
উত্থিতং দেবদেবেশং নগরে পার্থিবঃ স্বয়ম্॥
দীপোদ্দ্যোত করে মার্গে নৃত্যগীতসমাকুলে॥

রাস্তায় রাস্তায় বাজনা থামাইবার ব্যবস্থা ইহাতে নাই। যাহাতে তাহা না হয় তাহা দেখাও কর্ত্তব্য।

দ্বাদশীতে পারণ করিয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রত সাঙ্গ করিবে। নানা প্রকার দানাদি করিলেই ব্রত সফল হইয়া থাকে, অন্যথা একমাত্র ব্রাহ্মণ বাক্যেই সকল সফল হয় জানিবে। যথা—

সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু যথোপকরণং বিনা।
বিপ্রবাক্যং স্মৃতং সম্যক্ ব্রতস্ত পরিপূর্ত্তয়ে॥

ইহারও অন্তে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়ার কথা শাস্ত্রে আছে। যথা—

বৃথা বিপ্রবচো যস্ত্ত গৃহ্নাতি মনুজোঽবুধঃ।
অদত্ত্বা দক্ষিণাং পাপো যাত্যসৌ নরকং ধ্রুবম্॥

একাদশী হইতে পঞ্চদিবস ব্যাপিয়া ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিবে। ইহা ভিন্নও অন্যান্য কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ আছে। যথা—

আরভ্যৈকাদশীং পঞ্চদিনানি ব্রতমাচরেৎ।
ভগবৎ প্রীতয়ে ভীষ্মপঞ্চকং যদি শক্নুয়াৎ॥
যথা ধাত্রীব্রতং পৌর্ণমাস্তাং কুর্বীত কার্ত্তিকে।
তথা নবম্যাং শুক্লায়াং অক্ষয়ং নবমীব্রতম্।
পৈতামহাদি কৃচ্ছ্রাণি মাসো পোষণমেবচ।
সমর্থঃ কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ জ্ঞাত্বা পাদ্মাদিতো বিধিম্॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম গোস্বামী ও মহাজন গণেরও তিরোভাব তিথি আদির যথোচিত স্মরণোৎসব করা প্রত্যেক কার্ত্তিক ব্রতধারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর, দাস গদাধর, নরোত্তমদাস ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর ও কালাকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি এই কার্ত্তিক মাসকেই তিরোধানের সময় করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া কার্ত্তিকমাস ধন্য হইতে ধন্যতম হইয়াছে। এহেন শ্রীদামোদর

ও ভক্তপ্রিয় কার্ত্তিকমাস পাইয়াও যে ব্যক্তি বিনা ব্রতে কালক্ষেপ করে সে নিতান্তই দুর্ভাগ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বেদৈরধীতৈঃ কিন্তস্য পুরাণপঠনৈশ্চ কিম্।
কৃতং যদি ন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং ব্রতম্॥

আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সকলপ্রকার কামনা ভুলিয়া শ্রীদামোদরপ্রিয় কার্তিক ব্রতানুষ্ঠানে কৃতার্থ হই।

দর্শনের আলো

ভারত দার্শনিকের দেশ। অনেক কাল থেকে এদেশে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার অনুশীলন চলে আসছে। সে প্রাচীন কালের কথা যাঁরা বলে গেছেন তাঁরাও অনেকে এত প্রাচীন যে তাঁদেরও কাল নির্ণয় করা নিয়ে আজকালকার অনেক পণ্ডিত গভীর গবেষণা করে কত কত নাম কিনেছেন। খাঁটি বৈদিক যুগেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রথম প্রশ্নটি হয়েছিল—সেটি আজও নানা ভাষায় ও ভাবে, ছন্দে ও গানে মন্ত্রে ও ব্যাখ্যায়, গুরু আর শিষ্যের প্রাণে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি ও আনন্দ-ধারা প্রবাহিত করিয়ে দিয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আনন্দ না হলে কি তাঁরা এতকাল প্রাণ ধারণ করতে পারত, না গুরু শিষ্য সম্বন্ধটিই অক্ষুণ্ণ থাক্ত? তখনকার দিনে কেমন করে কার পদ্ধতি অনুসারে বৈদিক ঋষিকুল দেবতার আরাধনা কর্ত্তেন তা এখনোও কোনো পণ্ডিত নিঃসন্দেহ হয়ে স্থির কর্ত্তে পারেন নি। অনেকেরই সিদ্ধান্ত এই যে তাঁরা কেবল গান গেয়েই দেবতার আরাধনা কর্ত্তেন। পূজা আর যজ্ঞের ব্যাপার অনেক পরবর্ত্তীকালে। ঐ গান উপাসনার সাথে যোগ করা হয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি আজকালকার

সভ্যজগতে তখনও আলো জ্বলেনি। কাঁচা মাংস খেয়েই হয়ত তাদের তখনও জীবন ধারণ করা হচ্ছিল। যাঁরা ভারতে এসে অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ বলে অগ্নিকে আহ্বান করে প্রথম সমিধখানাকে আহুতি দিয়েছিলেন, তখন তাঁদের বাড়ী, তাঁদের ঘর, গাড়ী, পথ, দুর্গ প্রভৃতির যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে আর কেউ তাঁদের অসভ্য আখ্যা দিতে সাহসী হবে না। তখন তাঁদের কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁদের কৃষি, বাণিজ্য আর সমুদ্রে যাবার বড় বড জলযান প্রভৃতির কথা তাঁরা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। বৈদিক ঋষিকুল আর তাঁদের সঙ্গীগণ সকলেই একই রকমে আরাধনা করতেন বলে মনে হয না। বৈদিক সূক্ত, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি আলোচনা করার ফলে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, ঐ ঋষিদের ভেতর বড় দল ছিল ক্ষত্রিয প্রধান। এদের উপাসনা আর যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে প্রচুর সোমলতা পরে পশুর প্রযোজন হত। এঁদের দেবতার প্রধান ইন্দ্র। সাধারণ ভাবে দেখতে ইন্দ্রের মতন প্রভাব আর কোনও দেবতারই নয। ইন্দ্রই সূর্য্য, পৃথিবী আর সব ভাল ভাল বস্তুগুলোর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁর প্রভাব জলে, স্থলে, আকাশে পরিব্যাপ্ত আর অপ্রতিহত। তিনিই প্রথমোৎপন্ন মেঘরাশির বিনাশকর্ত্তা তাঁরই প্রবল পরাক্রমে সকল মাযীদিগের মাযা পরাভূত হযেছে। যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনা-মান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ। [ঋগ্বেদ ১ম সূত্র ৩২) বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টাদের ভেতর ভিন্ন একদল যাঁদের শাসনের গৌরব ভারতীয আর্য্যগণ আজও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছেন তাঁদের আমরা ব্রাহ্মণ প্রধান বলতে পারি। এরা বোধ হয়, প্রথম অগ্নি উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করে অগ্নির ভেতর দিযে দেবান্তরের আহ্বান করার নিয়মটি ভারতে চালিয়ে দেন। অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্ প্রভৃতি বাক্য এঁরাই প্রকাশ করেন। অগ্নির প্রয়োজন উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের প্রচার হতে থাকে আর জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্নির পরিচর্য্যা করা

বিশেষ ব্রত বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নানারকমের নাম আর উপাধি দিয়ে বিশেষ বিশেষ ব্রত যজ্ঞ বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নানা রকমের নাম আর উপাধি দিয়ে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে খুব ধূমধামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে থাকে। যজ্ঞের সময়ে যে ধূম উঠত আর অগ্নির যে ধাম (তেজ) লক্ষিত হত তা থেকেই বুঝি ধূমধাম কথাটি বিরাট ব্যাপার স্থচক হয়ে রইল। ব্রাহ্মণের অগ্নিই সর্ব্বস্ব। অগ্নিই পুরোহিত, ঋত্বিক্, দেবতা, আহ্বান কর্ত্তা, আর যাহা কিছু। যজ্ঞের প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত সকলই অগ্নি। অগ্নি ভিন্ন ইন্দ্র বরুণ, বিশ্বেদেষা, উষা, সবিতা, মিত্র, সূর্য্য, মরুদ্গণ বা অন্য যে কোন দেবতাই হউন না কেন, কেউই স্বাধীন ভাবে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে পারেন না। সকল দেবতাই অগ্নির মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। অগ্নিই তাঁদের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ বিশুদ্ধ আর পবিত্র করে যথাক্রমে দেবতাদের নিকট পোঁছে দেন। অগ্নিকে পরিচর্য্যা করবার জন্য ঋত্বিক্গণকে বলা হল, তোমরা উজ্জ্বল অগ্নিকে আহ্বান কর, "আজুহোতা স্বধ্বরং শীরং পাবক শোচিষং। আশুং দূতমজিরং প্রত্নমীড্যং শ্রুষ্টি দেবং সপর্যত। ওম সূ ৯। আজ শোধকদীপ্তি অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে যদি পাইলেই তবে সর্ব্বকর্মে ব্যাপ্ত দেবতাদের ক্ষিপ্রগামী দূত অতি প্রাচীন পূজ্য এই দেবতাকে অনতিবিলম্বে সুখী কর।

বিষ্ণুর উপাসক, ভিন্ন আর এক দল। এঁরা বিষ্ণুকেই অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার চাইতেও বড় বলে দেখালেন। সূর্যের উপাসনা আর অগ্নির আরাধনার সাথে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবের বিষ্ণুর মিলন হয়ে গেল। তখন সবিতার তেজে বিষ্ণুর প্রভাব, সূর্যমণ্ডলে বিষ্ণুমূর্ত্তি আর অগ্নির মুখে বিষ্ণুর হবন চলতে লাগল। তখন এক সীমানায় বিষ্ণু অগ্নি অন্য সকল দেবতা তাঁদের মধ্যস্থলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং প্রথমঃ অগ্নির্বৈ দেবানাং চরমঃ। সূর্য্য একবার পূর্ব্বদিকে একবার পশ্চিমদিকে আর দুপুর বেলায় ঠিক

মস্তকের উপরিভাগে এই তিন স্থানে ভ্রমণ করে থাকেন। বিষ্ণুও সেইরূপ করলেন। ত্রেধা ইদং বিক্রমে, ত্রেধা নিদদধে পদম্। এই থেকে তিনি ত্রিবিক্রম হলেন। তার পর বলিরাজার কাছ হতে ত্রিপাদ ভিক্ষার জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশ পর্য্যন্ত তাঁকে ধারণ করতে হল।

ভূঃ, ভুবঃ আর স্বর্লোক পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর স্বর্গ এই তিন লোকে প্রধান তিন দেবতা। তাঁদের প্রতিজনের আবার সহকারী কয়েকজন। এইভাবে তিন গুণ এগারোতে তেত্রিশ আবার এই তেত্রিশকে গুণিত করে বলা হয় হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতা। এই অগ্নিরই সংখ্যা করা হয়েছে কঠউপনিষদে তিনটি। এই তিন প্রকার অগ্নি আবার বহুমূর্তি ধারণ করে বহু সংখ্যক হয়ে যান। বৃহদারণ্যকে দেবতার সংখ্যা করা হয়েছে একটু বিচিত্রভাবে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে দেবতার সংখ্যা সম্বন্ধে উপদেশ কর্ত্তে বলায় যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে তিনশত তিন পরে তিন হাজার তিন অবশেষে বল্লেন এই তেত্রিশ সংখ্যার মধ্যেই দেবতার মহত্ত্ব। তাঁরা কারা? এই প্রশ্ন হলে বলা হল—আটজন বসু, এগারজন রুদ্র, বারজন আদিত্য, এই একত্রিশজন, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি এই তেত্রিশ দেবতা। এই সংখ্যাগুলিকে কম করে প্রথমে ছয়, তারপর তিন, পরে দেড় আর সবশেষে এক সংখ্যায় এনে দাঁড় করান হয়েছে। বৃহদারণ্যকে ঋষি বলেছেন এই এক হচ্ছে প্রাণ আর সে-ই ব্রহ্ম। কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তাদিত্যাচক্ষতে। তবেই দেখা গেল ঋগ্বেদের সূক্তে ত্রীনি শতাত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্ বলে যে দেবতার সংখ্যা করা হয়েছিল তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশ (৩৩৩৯) সেই দেবতাগণই উপনিষদে একের সংখ্যায় এসে পর্য্যবসিত হয়েছে। এককে বহুকরে দেখা আর বহুকে একের মধ্যে দেখা এই নিয়েই বিজ্ঞান আর দর্শনের প্রচেষ্টা। ভারতের বিজ্ঞান আর দর্শনের বিশেষত্ব এইটুকু যে

তারা ধর্ম্ম ছাড়া একপা অগ্রসর হবে না। বিজ্ঞান যেখানে ধর্ম্মের হাত ধরে যেতে পারবে না, দর্শনের যে কূট তর্কের ভেতর ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাবে না, ভারতের বিজ্ঞান বা দর্শন সেখান থেকে ফিরে এসেই প্রাণশক্তি পেয়ে নেচে উঠবে। অনেকের মস্তবড় একটা ভুল রয়ে গেছে এই সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে। সেটি এই যে হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি আইন কানুন আর বন্ধনের সমষ্টি, যা দিয়ে কতকগুলি স্বার্থপর ব্রাহ্মণ সমাজকে এমন শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল কোন এক সুদূর অতীতে যে বন্ধনের দাপে স্বাধীনভাবে চল্‌তে অনভ্যস্ত হয়ে সমাজ বর্ত্তমানে বন্ধনের গাঁট খুলে দিলেও আর তেমন স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পারছে না। তার পুরাণো দিনের সংস্কার তাকে জব্দ করে রাখছে এই অতবড় স্বাধীন, মুক্ত জগৎটার কাছে। একথাগুলি যদি সত্য হত তাহলে বাস্তবিকই খুব দুঃখের কথা ছিল। যাঁরা এদেশের সত্যকার হৃদয়ের পরিচয় জানেন তাঁরা কেউ একথা বিশ্বাস করবেন না। তাঁরা জানেন ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু, সেটি উপলব্ধি করা যায়। বাইরের অনুষ্ঠানে তাকে দেখা যায় না। যতদিন অনুষ্ঠানে প্রাণে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল ততদিনই অনুষ্ঠান সমাজে চলেছিল। অনুষ্ঠানে প্রাণের সাড়া যখন পাওয়া গেল না তখনই তাকে হেয় বলে ত্যাগ করা হল। তা বলে ধর্ম্ম মরে ভূত হয়ে যায়নি। প্রাণের খুব গোপন কুঠুরিতে তার থাক্‌বার স্থান করে দেওয়া হল। কখন কখন তার আলো বাইরের বস্তুগুলোর উপর পড়ে সেগুলোকেও খুব মহিমান্বিত করে দেখিয়ে দিয়েছিল। ভারতের কাব্য কেমন করে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মেরই দিকে ধাবিত হয়েছে সেগুলো বারান্তরে আলোচনা করব। দর্শনের আলো কেমন করে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ আলোকিত করে সেই চিরমধুর, চিরসুন্দর, চির-কিশোরকে দেখাবার সাহায্য করছে সেটুকু আলোচনা করাই সর্ব-প্রথম আমাদের প্রয়োজন। যে দর্শনের আলোর প্রভায় পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ করবার উপযুক্ত হতে পারা যায়, সেইটিই মুখ্যভাবে আলোচ্য। গৌণভাবে

আর আর দর্শনগুলোরও সাথে পরিচয় করে নিলে একটি অভিনব সত্য আবিষ্কার হবে এই যে, প্রত্যেক দার্শনিকই অনুভব করে তারপর কথা বলছেন। কেউ একেবারে ভুল থেকে সত্যের দিকে যাচ্ছে তা নয়, অল্প সত্য থেকে বেশী সত্যে চলেছে। তাঁরা যে মহান্ সত্যের সন্ধান পেয়ে তাঁর সুন্দর রূপ দেখে তাঁর মঙ্গলময় গুণের পরিচয় পেয়ে বলে উঠেছে—মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

বৈষ্ণব দর্শন

দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ অধিকাংশ দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষতঃ নৈয়ায়িকের পারিভাষিক শব্দাবরণে সমাচ্ছাদিত এবং বিশেষ একটি রীতিবদ্ধ ধারায় বিরচিত। ন্যায়চক্ষুবিহীন হইলে বৈশেষিকের বিশেষত্ব বা সাংখ্যের সংখ্যা, যোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমীক্ষা, পূর্ব-মীমাংসার মন্ত্র প্রয়োগ প্রক্রিয়া, অথবা বেদান্তের রহস্য, কোনটাই দর্শন হবে না। দর্শনের অর্থ জ্ঞান অথবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, যাহাই হউক না কেন, ন্যায় নীতি বিরুদ্ধ হলে কোনরূপেই বিশুদ্ধ দর্শন হয় না। ন্যায়ের ভঙ্গী ও ভাষা সকলের অধিগম্য নয়। শুধু ভাষা সংস্কৃত হলে হয় না, মনও সংস্কৃত হলে তবেই দর্শনের পাদপীঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ক্রম প্রাচীনকালেই প্রবর্ত্তিত। হরিভদ্র সূরীর ষড়্দর্শন সমুচ্চয়, মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, প্রাচীন গ্রন্থগুলি অনেকে ভুলতে বসেছেন। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত ভাবনায় দুর্লভ এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। পরবর্ত্তি কালে কেহ কেহ তাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেছেন। উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম নিরূপণে তিনি যেরূপ যুক্তিজাল বিস্তার করে সৎ, চিৎ, আনন্দ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন, উহা

বৌদ্ধবাদ সমাচ্ছন্ন সেই যুগসন্ধিক্ষণে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের মর্যাদা সংরক্ষণে এবং সামাজিক বিপ্লব থেকে জাতিকে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করে চিরস্মরণীয় হয়েছে।

শাংকর ভাষ্য শারীরক মীমাংসা বেদান্ত সূত্রের অদ্বৈতব্রহ্ম নিরূপণে বিজয় দুন্দুভি। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক জীবতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং পরব্রহ্মের সহিত সেই জীবের সম্বন্ধ প্রভৃতি আরও বিভিন্ন দিক্ থেকে আলোচনা করেছেন। মায়ার তত্ত্বাবধারণ, তাহার কার্য্য ও ফল, ইহলোক, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিচার, মোক্ষ ও তার সাধন নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার দিগন্ত প্রসারিত ভাবসমুদ্রে বিচরণশীল মহামানবগণ যুগে যুগে নব নব দর্শনকেন্দ্রে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন। প্রতিদিন স্মরণ করি "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" গীতার ভগবান্ 'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' এই ঘোষণা করেছেন। বিষ্ণু যে পরম, চরম অন্তিম, সর্বব্যাপক সর্বাশ্রয, এ কথা বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, পঞ্চরাত্র সংহিতা ও তন্ত্র সকলশাস্ত্রে নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই বিষ্ণু ভগবানকেই নানারূপে আবির্ভাবিত ভাবনায় যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা বৈষ্ণব, আর তাদের মতবাদকে বৈষ্ণব দর্শন বলা যায়। বৈষ্ণব দর্শন বলে কোন পৃথক্ একটা বা ততোধিক দর্শন শাস্ত্র আছে বলা যায় না।।

সাংখ্য বেদান্তের ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন। আর যারা কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম নৃসিংহ নারায়ণ উপাসনা করেন তাঁরাও উপনিষদ্ সাংখ্য ও ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখা করেছেন। বিষ্ণুর পারতম্য ঘোষণার ফলেই দর্শন শাস্ত্রের এক অংশ বৈষ্ণব হযে গেছে। আর সে ভাবেই বৈষ্ণব দর্শন কথার উৎপত্তি হয়েছে। "সাধন বিনা সাধ্যবস্তু কেহ নাহি পায়।" সাধ্য নির্ণয়ের মূলে সাধনার কথা। বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব যেরূপই হউক না কেন, উহা লাভ করিবার মৌলিক সাধন ভক্তি।

অতএব বৈষ্ণব দর্শনের বিশেষ লক্ষণ ভক্তিবাদ। আর এ জন্য বৈষ্ণব দর্শনকে ভক্তি দর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য রামানুজ, ইনি নারায়ণের উপাসক। বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম ইঁহার দর্শনে বেঙ্কট নারায়ণ। শরণাগতি তাহার সাধন। আচার্যের মতে ব্রহ্মের বিশেষ আছে। এই বিশেষ ভেদাভাবেপি ভেদ সাধক ভেদ প্রতিনিধি। এই ভেদের সাধক ভেদের প্রতিনিধি বিশেষের গুণেই সর্প ও সর্পকুণ্ডলী স্বরূপত অভিন্ন হইলেও ভিন্ন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ঠিক এই রীতি অনুসারেই প্রাকৃত কোনো মণি বিশেষ যেমন প্রতিদিন স্বর্ণ প্রসব করেও অবিকৃত থাকে, তেমনি পরমব্রহ্ম নারায়ণ অবিচিন্ত্য অপ্রাকৃত শক্তি সমাশ্রয় বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অচিৎ জগৎরূপে পরিণত হয়েও স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকেন। নারায়ণ আত্মা, জীবজগৎ যেন তাঁরই শরীর। জীব, জগৎ নারায়ণ ভিন্ন হলেও অভিন্ন, শরীরী ও শরীর সম্বন্ধের মত। জগতের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার ভিন্ন পরম পুরুষোত্তম নারায়াণেরঅনুগ্রহে জীব সর্ব্বপ্রকার গুণের অধিকারী হতে পারে। পরমেশ্বরের সমতা লাভ করে অপ্রতিহত শক্তিও হয়। শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে মধ্বাচার্য জীব, জগৎ, কাল, কর্ম, ঈশ্বর এই পাঁচটির একান্ত ভেদ ও পরস্পর ভেদ স্বীকার করেন। শ্রীমদ গীতাভাষ্যে এবং বেদান্ত ভাষ্যে হনুমদবতার মধ্বাচার্য তার মতবাদ বিস্তার করেছেন। আচার্যের অনুগত জয়তীর্থ প্রভৃতি ন্যায় যুক্তির সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে অদ্বৈতবাদীর মতবাদকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বাংলাদেশে আজও মধ্বাচার্যের মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ একটা আলোচনা হয়নি একথা বলা যায়। এই দ্বৈতবাদী দার্শনিকের শিষ্যবর্গ ন্যায় শাস্ত্রের ভাষায় নানারূপ পূর্বপক্ষ তুলে বিচার শৈলীর দৃঢ়তা সম্পাদন করেছেন। আবার নানারূপ হেত্বাভাস উল্লেখ করিয়া প্রতিপক্ষ অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণ ও প্রতি

আক্রমণে যে এক বিরাট দর্শন-শাস্ত্রের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এ কালের মানুষ সেই সূক্ষ্ম ভাষার জালভেদ করে রস নির্য্যাস গ্রহণ করবে কিনা জানিনা। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান খণ্ডন করে আচার্য বলেন— বিমতংমিথ্যা দৃশ্যত্বাদ্ যদিত্থংতৎতথা ইত্যাদি। অনেক কথা, শংকরের মতে এই জগৎ মিথ্যা। তাহার কারণ জগৎ দৃশ্য। যাহা যাহা দৃশ্য তাহা তাহা মিথ্যা। জগৎ দৃশ্য। অতএব জগৎ মিথ্যা। এই অনুমানটিকে দোষারোপ করে মধ্বাচার্য বলেন, এই অনুমান অঙ্গীকার করিলে আশ্রয়াসিদ্ধ দোষ হয়। জগতের যখন অভাব তখন আশ্রয় অসিদ্ধ। অনির্বচনীয়ও অসিদ্ধ হয়। উপাধি খণ্ডন মায়াবাদ খণ্ডন প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ইহার মতবাদ অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র দ্বিবিধ তত্ত্ব স্বীকার করেন। তত্ত্ব সংখ্যানে বলা হয়েছে—

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু ভাবাভাবৌ দ্বিধেতরৎ॥

তাঁর মতে পদার্থ দশটি—(১) ভাববস্তু (২) অভাব (৩) গুণ (৪) ক্রিয়া (৫) জাতি (৬) বিশেষত্ব (৭) বিশিষ্ট (৮) অংশী (৯) শক্তি ও (১০) সাদৃশ্য। এই পদার্থগুলি শ্রীহরির অধীন। শ্রীহরিই একমাত্র স্বাধীন বা স্বতন্ত্র

মধ্বমতে মুক্তির সাধন ভক্তি। ভগবৎসেবায় ভগবানের প্রসন্নতা হয়, তাহার ফল মুক্তি। সারূপ্য সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তি জীবের প্রাপ্য। সেবা তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। পুত্রাদির নাম কেশব নারায়ণ প্রভৃতি রাখিলে সর্বদা বিষ্ণু নাম উচ্চারণ হয়, স্মৃতি পথে ভগবান সমুদিত হন।

আচার্য রামানুজ বলেন, উপাসনা পাঁচ প্রকার অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। অভিগমন অর্থে মন্দির মার্জনা ও লেপনাদি। উপাদানের তাৎপর্য গন্ধ পুষ্প ধূপদীপাদি সমর্পণ। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায অর্থ মন্ত্র জপ, নাম জপ, স্তোত্রপাঠ, কীর্ত্তন ও শাস্ত্র অভ্যাস। যোগ, একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদি।

আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কও বৈষ্ণব দর্শনে একটি বিশিষ্ট অধ্যায যোজনা করেছেন। কোনো কোনো মতে এই শ্রীনিম্বার্ক অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী। ইতিহাসের বিচারে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন নেই, কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক যে সাধনার ক্রম উপদেশ করেছেন, সেটি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয। এই মতবাদী আচার্যগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ আরাধনার উপদেশ করেন এবং নিজেদের মতবাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আখ্যা দিযেছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য শ্রীনারাযণ শ্রীবিষ্ণু শ্রীগোপাল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতির উপাসনার কথা উপদেশ করেছেন। নিম্বার্ক কিন্তু রাধাকৃষ্ণের উপাসনাই নির্দেশ করেন। অদ্বৈতবাদীব নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিষযে নির্ণয খণ্ডন পূর্ব্বক পরমানন্দকন্দ গোবিন্দ আরাধনার নির্দেশে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সুরসাল হযে উঠেছে। হরিব্যাসী গোষ্ঠী আবার যুথেশ্বরীগণের আনুগত্যে প্রধানতঃ রঙ্গদেবীর অনুগত হযে বৃন্দাবনে নিত্যকুঞ্জ ভবনে আনন্দলীনা রসমগ্ন সখীগণ পরিবেষ্টিত মহাযোগ পীঠে অষ্টকালীন সেবা মগ্ন থাকারও অভিলাষ করেন। "যুগল শতক" শ্রীভট্ট বিরচিত, "আদিবাণী" শ্রীহরিব্যাস কৃত গ্রন্থে সুখ সেবা সুখের সন্ধান পাওযা যায়। শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বয়ং ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যরচনায় যে ভূমিকা করেছেন তাহাতে এই মতবাদের মর্মবাণীর ধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। নির্বেদেন ভগবৎ প্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছা লম্পটেনাচার্য্যৈক-দেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দেন মুমুক্ষুণানন্তাচিন্ত্য স্বাভাবিক স্বরূপ গুণ-শক্ত্যাদিভিঃ বৃহৎতমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ঃ

তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রম বাক্যার্থঃ। ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে হতাশ হয়ে সকল সুখের আশা ত্যাগ করেই নির্বেদ লাভ করা যায়। এই নির্বেদ বা বৈরাগ্য উদয় না হলে পরতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয় না। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হবে আমাকে অনুগ্রহ করবেন আমি তাঁকে দেখবো এ ভাবের লোভ হলেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন মুক্তির অভিলাষুক জীব অচিন্ত্য স্বাভাবিক গুণময় ও শক্তিমান সকলের বড় রমাকান্ত পুরুষোত্তম ভগবান যিনি উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য তার বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। এই তীব্র ইচ্ছার মধ্য দিয়েই জীব কৃতার্থ হয়।

আচার্য বিষ্ণুস্বামীর অনুযায়ী বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক। শ্রীধাম বৃন্দাবনের রূপ সনাতন প্রভৃতি আচার্যগণের প্রভাব বল্লভাচার্য্যের মতবাদকে প্রভাবান্বিত কবেছে একথা অস্বীকার করা চলে না। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য ও তাঁর পুত্র শ্রীবিট্‌ঠল বিশেষ স্থান অধিকার করেন। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করে বল্লভ নতুন করে ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন এ কথা শুনে মহাপ্রভু সুখী হননি।

প্রভু হাসি কহে, স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥

বল্লভভট্ট শ্রীমন্মমহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে দেখা যায়—

বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য উপাসনা।
বাল গোপাল মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর গোপাল উপাসনায় মন হৈল ॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম নহে আমা হৈতে ॥

কিছুদিন পরের কথাও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহা ভিক্ষা কৈলা লঞা নিজগণ॥
তাহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সর্ব্ব-সিদ্ধ কৈলা॥

ভাগবতের ব্যাখ্যা সুবোধিনীতে বল্লভাচার্য্যের মতবাদ বেশ বুঝা যায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রায়শঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন। বাল্যলীলা হতে অসুর সংহাবাদির ব্যাখ্যায় তিনি সাধক ও সাধনার স্তর ক্রমমুক্তি সদ্যঃমুক্তি প্রভৃতির তাৎপর্য বুঝাইতে যত্ন করেছেন। বস্ত্রহরণ কথা রাসলীলার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁর মতবাদ উপলব্ধির দ্বার খুলে দেয়। তিনি গোপীভাবে নিতব্যগোলোকে গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিবারে সেবাভিলাষ পোষণ করেন। কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম তাঁর অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি। কোনো কিছুই তাঁর স্বরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাঁর মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈত নামে প্রসিদ্ধ।

ভক্তকবি তুলসীদাস রামচরিত মানস গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন। জীব যে রামের দাস তাহাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। শ্রীরামের সর্বেশ্বরত্ব পরমপুরুষোত্তমত্ব পরমব্রহ্মত্ব খ্যাপন করে সীতার পরা প্রকৃতি স্বরূপটি উপদেশ করেছেন। অযোধ্যার রাম কাশীক্ষেত্রে তুলসীদাসের লেখনীতে জীব, জগৎ ও প্রকৃতির সমন্বয় মূর্ত্তিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। তুলসীদাস সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে ব্যাপক রামকে দর্শন করেছেন। ভাগবতের রহস্য শ্রীরামচরিত মানসে সহজ সরল প্রাকৃত গ্রাম্য হিন্দীতে জনগণের অন্তরে বৈষ্ণব দর্শনের মূলকথাগুলি জাগ্রত করেছেন। লক্ষ কোটি মানব শ্রীরাম নাম—মাধুরী আস্বাদন করে বৈষ্ণব দর্শনের সারমর্ম অবধারণের সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীরামোপাসনায় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্ত দাসভাবে নৈষ্ঠিকতা, বজ্রাঙ্গীর পরমাদর্শে রামানন্দস্বামী তাঁর অনুযায়ীদের শিক্ষা দিয়ে বলিষ্ঠ ত্যাগবৈরাগ্য-ব্রতচারী একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন। দার্শনিক ভাবধারায় অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁরা দাস্যভাবের সংযোজনায় ভেদাভেদ সিদ্ধান্তকেই পরিপুষ্ট করেছেন বলা চলে।

বাংলার নৈয়ায়িক পণ্ডিতবর্গ যেমন নব্য ন্যায়ের এক বিশেষ ধারা-প্রবর্ত্তন করেন তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্য প্রমুখ ন্যায় শাস্ত্রকেও ভক্তির স্পর্শ দিয়ে বৈষ্ণব করে নিয়েছেন তেমনি একদল বৈয়াকরণিক ব্যাকরণ ও সাহিত্য রচনায় মঙ্গলাচরণাদিতে বৈষ্ণব ভাবধারাকে প্রসারিত করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণানুরক্ত ভক্তগণ কিন্তু তাঁদের প্রাণের দেবতা গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট সুদৃঢ় দার্শনিক বিচারের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করবার এক বিরাট্ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রূপসনাতন গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, জীব প্রভৃতি বৃন্দাবনাশ্রয়ী গোস্বামিগণ এবং তাদের কৃপাপুষ্ট কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আচার্য্যগণ বাংলায় দার্শনিক ধারার এক নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এই বাংলার নিজস্ব সম্পদ আধুনিকতম দর্শন বিজ্ঞান।

ভাগবত শাস্ত্রকে অবলম্বন করে জীব গোস্বামী সাতখানা সন্দর্ভ সংকলন করেছেন তাছাড়া সর্বসম্বাদিনী নামে সন্দর্ভের কোনো কোনো অংশের প্রপূরক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি নামে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি সন্দর্ভ এবং সপ্তম ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবত সিদ্ধান্ত জীব গোস্বামী প্রদর্শিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মৌলিক বিচার গ্রন্থ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমেয় রত্নাবলী, সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক), গোবিন্দভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের নির্দ্ধারণ করেন।

প্রাচীন মধ্বাচার্য প্রবর্ত্তিত ভেদবাদ দ্বৈত সিদ্ধান্ত ভক্তিবাদী মাত্রকেই স্বীকার করতে হয়। বলদেব মধ্বমতানুসারে তাঁর গোবিন্দভাষ্যে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন, আবার শ্রীজীব গোস্বামী প্রবর্ত্তিত বেদান্ত সিদ্ধান্তেরও সমন্বয় চেষ্টা তাঁর ছিল। বলদেব মধ্বমতেই বিষ্ণুর পারতম্য স্থাপিত করেছেন কিন্তু গোবিন্দ গোপালই যে বিষ্ণু একথা ঘোষণায় কিছু মাত্র কার্পণ্য নেই তাঁর। মধ্বমতে লক্ষ্মীদেবী ভগবৎ-কান্তাকুল শিরোমণি। বলদেব বিদ্যাভূষণ কিন্তু রাধাকেই ভগবৎ প্রেয়সীবৃন্দের প্রধানতমা বা আদ্যাপ্রকৃতি বলে স্বীকার করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ বিচারেই অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ। অনন্ত অচিন্ত্য তাঁর শক্তি। প্রধানতম অন্তরঙ্গ তিন শক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে এই শক্তি ত্রয় স্বরূপ শক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি। সর্ব্বত্র শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের সত্ত্বার উপলব্ধি হয় না। শক্তিমান শক্তিতেই প্রকাশিত। শক্তি ও শক্তিমান, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি স্বরূপে অভিন্ন হযেও ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই একই স্বরূপে অভিন্ন হয়েও ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই একই স্বরূপে ভিন্নাভিন্নত্ব উপলব্ধি বস্তুতত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তিতেই সমাধান হয়। এই নিমিত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য বলে সিদ্ধান্ত করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকের চিন্তাধারার অভিনবত্ব নানা দিক্ দিয়ে স্বাক্ষর রেখেছে। প্রাচীন কাল হতে চারিটি পুরুষার্থের কথা প্রসিদ্ধ এঁরা কিন্তু পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমতত্ত্ব শাস্ত্রপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপনিষদে প্রিয় আত্মার উপাসনার সূত্রধারা। পরম পুরুষোত্তমকে প্রিয় রূপেই বরণ করতে হবে। আর জীবনের চরম সার্থকতা তাঁর প্রিয়তা বিধান বা প্রীতি সম্পদ। এটা দর্শনশাস্ত্রে সার্থক যোজনা। আনন্দ মীমাংসার উপর বিভিন্নভাষ্যে ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্ধারণে অনেক সমালোচনা

দেখা যায়। সেই ব্রহ্ম যে রসস্বরূপ, আস্বাদক ও আস্বাদ্য রূপ, এই কথা কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বিশেষভাবে প্রদর্শন করেছেন। এ-ছাড়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে পুরুষোত্তম সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত একটি প্রীতির সম্বন্ধ ভাবনার কথা এঁরা বলেন। শান্ত মুনির ভাবের কথা শুনিয়াছি। হনুমান প্রভৃতির দাস্য ভক্তির কথাও শুনা যায়। বাংলার দার্শনিকের কথা কিন্তু আরও অগ্রগতি লাভ করেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দ রায়ের মুখে বলেন—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রদর্শিত সখীর আনুগত্যে পরতত্ত্বের দর্শন বাংলার দর্শন—প্রেমের দর্শন—গৌরাঙ্গের দান—বিশ্বের আকর্ষণ।

বৃন্দাবন তত্ত্ব

স্বধুর্ন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণি কনক সদ্ম সঙ্ঘৈঃ পরীতম্।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ প্রণয় ভর লসৎ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

নবদ্বীপ রম্যস্থল অভিন্ন ব্রজমণ্ডল
শ্রীধাম অতি জগ অনুপম।
নাম স্মরণে যার হয় প্রেম ভক্তি সার
হৃদয়ের নাশে পাপ তম॥

শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গৌড়মণ্ডলভূমির তত্ত্বালোচনা করিতে হয়। শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ লীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাও তাহাতে॥

ধামতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেশ ও কাল সম্বন্ধে একটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, Kant প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেশ ও কালের জ্ঞেয় সত্ত্বা (objective Reality) স্বীকার করেন নাই। ইহাদের মতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ

অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) কিন্তু দেশ ও কালের একটা রীতি সৃষ্টি করিয়া আমরা বস্তুর পরিচয় দিয়া থাকি ও উহাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকি।

এইরূপ Idealist আমাদের দেশেও আছে। আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার মতাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকেই দেশ, কাল, কর্ম্ম প্রভৃতি কোন বস্তুরই পারমার্থিক সত্ত্বা স্বীকার করেন না। এক ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু সকলই মায়া কার্য্য অবস্তু, অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে উহাদের ব্যবহারিক সত্ত্বা না মানিলে কোন কার্য্যই চলে না। ঈশ্বর বলিয়া যাহাকে বলা হয়, উহাও মায়াতে উপহিত চৈতন্য। অতএব সৃষ্টি, লীলা, অবতার প্রসঙ্গ সকলই মায়িক—উহাদের পারমার্থিক কোনও সত্ত্বা নাই। ব্রহ্মের পরাবস্থার রূপ—নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নিরঞ্জন।

যোগিগণ পরমাত্ম তত্ত্বানুসন্ধানে অন্তরে—হৃদয় আকাশে (উহাকেই ছান্দোগ্য উপনিষদে "দহর আকাশ" বলা হইয়াছে সেই "দহরাকাশে") আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা অন্য দেশ, কাল সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু নহেন। তাঁহারা হৃদয়ে আত্মার আনন্দেই বিভোর। অন্তরে পরমাত্মার সত্ত্বানুভব তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। এই যোগানুসন্ধান বৃত্তির সহিত ভক্তির মধুময় মিলনে হৃদয়ই বৃন্দাবনরূপে বর্ণিত ও অনুভূত হইয়া থাকে।

সাধারণ জন কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ বলিয়াই গ্রহণ করিতে চাহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনা বৃন্দাবন অন্যান্য দেশেরই মত একটি দেশ বিশেষ, লীলা সাধারণ বা কিছু অসাধারণ কর্ম্মসমষ্টি।

ভগবানের ধাম রহস্য বা লীলা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সে কথাটি এই, যে বস্তু যে জাতীয় সেই বস্তুর পরিমাপক যন্ত্রবিশেষ বা অনুমাপক প্রমাণ দ্বারাই তাহার পরিমাণ করিতে হয়। যেমন কাপড় মাপিবার গজকাঠি দিয়া তরল পদার্থ দুগ্ধাদির পরিমাণ করা যায় না, তেমনই তরল পদার্থের পরিমাপক

ভাণ্ড দিয়া কঠিন স্বর্ণ রৌপ্যাদি তুলিত করিতে যাওয়াও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত ভগবৎতত্ত্ব ও তাঁহার ধামতত্ত্ব পরিমাণ করিবারও তদনুরূপ পরিমাপক যন্ত্রের প্রযোজন। আচার্য্যপাদগণ বলিয়াছেন পরতত্ত্বানুসন্ধানে একমাত্র বেদ—শব্দ—অপ্রাকৃত—অপৌরুষেয় শব্দই নিঃসন্দেহ প্রমাণ। সেই বেদ ভগবানের ধামকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"

এই পরম পদ প্রকৃতির বাহিরে। প্রকৃতির রাজ্য আর কতটুকু? ইহা অতীব মহান্। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একাংশ। গীতায় কৃষ্ণ বলিলেন, "একাংশেন স্থিতোং জগৎ।" ঋগবেদ সংহিতা পুরুষসূক্তে বলিয়াছেন—

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া সেই মহাপুরুষমহিমা। ইহা হইতে সেই পুরুষ মহান। বিশ্বের নিখিল চরাচর তাঁহার একপাদ বিভূতি। আরও ত্রিপাদ বিভূতি অমৃতময় দিব্যলোকে বিরাজিত।

এক পাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতি পরব্যোমের কে করে পরিমাণ?

(চরিতামৃত।)

এই ত্রিপাদ বিভূতির মহিমা জ্ঞানীগণের মধ্যেও অনেকে পরিজ্ঞাত নহেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা দ্বারকায় কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় দ্বারী পরিচয় চাহিলেন। ব্রহ্মা মনে মনে ভাবিতেছেন "আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা—বেদের যোনি—সনকাদির পিতা, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা আমার আবার পরিচয় চাওয়া কেন?" কোনমতে পরিচয় দিয়া ক্ষুণ্নমনে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভগবান্ তাহার মনের সন্দেহ নিরসন করিবার ইচ্ছা করিয়া, অন্তরের

সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিবার জন্য দ্বারকার রাজসভায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণকে মূহুর্ত্তের মধ্যে আনাইলেন। শত-সহস্র অযুত সংখ্যক বদন-ধারী ব্রহ্মাগণকে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফরে পড়িয়া গেলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বুঝিলেন, তিনি ভগবৎতত্ত্বের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন, উহা বহু, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় নহে। পরম পুরুষের মহিমার পূর্ণ পরিচয় কেহ জানে না। একপাদ বিভূতির রাজ্য প্রাকৃত রাজ্য—নশ্বর রাজ্য—ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনের রাজ্য—পরম সত্যের সম্বন্ধে ইহা মায়ার রাজ্য। পরম সত্যরাজ্য নিত্য—শাশ্বত—সনাতন—অমৃতময়। এই আনন্দময় রাজ্য বিরজার পারে—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্॥

ভাগবত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ত্রিপাদ বিভূতিময় রাজ্যকে একটি অপূর্ব্ব কমলের ন্যায় অনুভব করিয়াছেন। এই অভিনব কমল বিরজা নদীর জলে অপূর্ব্ব দীপ্তি বিস্তার করিয়া বিরাজিত আছে, উহাকে ভক্তগণ ভগবানের ধাম বলিয়া অনুভব করেন। কমলের দল-সমূহের প্রতি স্তরে ভগবানের অবস্থানের বৈচিত্রও ইঁহাদের স্বীকৃত। কমলের উপরিভাগে ভগবানের পরম প্রিয় মিলন স্থান। এই কমলটি সহস্রদল। উহার কর্ণিকার উপরে ছয়টি কোণ বিশিষ্ট মহৎযন্ত্র। ছয়টি কোণে ছয়টি খুঁটি। উহারা কীলক বলিয়া কথিত। যিনি যে সাধনাই করুন না কেন, যখন যন্ত্র আঁকিয়া তাহার উপর শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করা হয়, তখনই জানিতে হইবে উহা সেই ভগবানের ধামগত মিলন-পীঠেরই আহ্বান। এই ধাম সাধারণ লোকলোচনের অদৃশ্য তাহার সত্তা অস্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে যে সকল দেশান্তরে গমন করিয়া সেই সকল দেশ প্রত্যক্ষ করা হয় নাই, সেগুলিকেও অস্বীকার করিতে হয়। ঐসকল দেশের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া যাঁহারা সেই দেশে গমন করিয়াছেন তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া অথবা গ্রন্থাদিতে

সেই দেশের বিবরণ পাঠ করিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যে সকল ঋষি সাধারণের অদৃশ্য ধাম দর্শন করিয়াছেন তাহাদের কথা এই—

সহস্র পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥
কর্ণিকারং মহদ্ যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্॥

এই পরম রমণীয় বৃন্দাবন ধাম ভগবানের অতীব প্রিয়! ইহাকে ভগবানের দেহ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে।

পঞ্চ যোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃত বর্ষিণী॥

আরও কত অবর্ণনীয় মহিমা এই ধামের আছে। ধাম ভগবানের স্বরূপের ন্যায় বিভু।

প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান
সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম॥
তাহার উপর ভাগে কৃষ্ণ লোকখ্যাতি।
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি গোকুল ব্রজ লোকধাম।
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥

ভগবান যোগমায়ার অবলম্বনে মরজগতে নামিয়া আসেন। যোগমায়া—কৃপাশক্তি—মিলন ঘটকিনী জীবের দুয়ারে ভগবানকে মিলাইয়া দেন।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

ভগবানের প্রকাশিত স্বরূপে—অনাবৃত স্বরূপে বিহারের কালে তাঁহার অপ্রাকৃত—প্রকৃতির অপর পারের—অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ধাম অনাবৃত স্বরূপে লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়া ভৌম বৃন্দাবনরূপে প্রকাশ হয়। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য ইহা সকলের—সাধারণের কাছে পাওয়া ধাম। অপ্রকাশিত ধাম জীব-জগৎ যোগে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়, আর এই প্রকট বিহারের সুযোগে প্রাকৃত রাজ্যের জীব পশু-পাখীও অনাবৃত আনন্দ স্বরূপের প্রেমের টানে পড়িয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া রসিক ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"বৃন্দাবন ঔর গোলোক তৌলে তুলসী দাস।
যো ভারী উহ্ রহ্ গিয়া হাল্কী চঢ়ে আকাশ॥"

শাস্ত্র বলিতেছেন—অতি সূক্ষ্মরূপে জীবের অন্তরে ভগবৎশক্তি খেলা করিতেছে। "সূক্ষ্মাণামপি অহং জীবঃ" স্থানান্তরে দেখা যায়, একটি কেশাগ্রের শতাংশের শতাংশ বলিয়াও এই সূক্ষ্মতার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল বলিয়া তত্ত্বদর্শী ক্ষান্ত হয়েন নাই। অথচ এই সূক্ষ্ম চৈতন্য স্বরূপই যতক্ষণ দেহকে জ্ঞান-চেতনাময় স্পন্দনে আনন্দময় করিয়া উদ্ভাসিত করিয়া রাখিতেছে ততক্ষণ এই দেহের কতই না যত্ন আদর। এই সূক্ষ্ম স্বরূপ আবার একটি দুইটি করিয়া অস্থি, মজ্জা, প্রভৃতি কতকগুলি আবরণে আবৃত। এই আবৃত চৈতন্যস্বরূপকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আমাদিগের প্রাণে টান কত! একবার ভাবিয়া দেখুন।

যাঁহাকে আমরা এত ভালবাসি সে কে? সে কি ঐ দেহ? না তাহা কখনও হইতে পারে না। মৃতদেহকে কে আদর করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে? যে তাহা করে, সে বাতুল—পাগল। আমরা ভালবাসি চৈতন্যকে—সে আছে ঐ দেহের পরতে পরতে লুকাইয়া—অন্তরের তলে ডুবিয়া তাহাতেই উহার অনুসন্ধান এত তীব্র—আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল। কেমন করিয়া সেই আনন্দ চৈতন্যকে বাধাহীন ভাবে—অনাবৃতরূপে বুকের কাছে পাইতে পারি তাহারই নিমিত্ত এরূপ চেষ্টা। তাহাতেই জীবের অন্তরে অনুসন্ধান। জীব যে সুখের খোঁজে—যে চৈতন্য স্বরূপের খোঁজ করিতে যাইতেছে উহা কতটুকু, চৈতন্য-সমুদ্রের যে এক ফোঁটাও নয়। উপনিষদ বলিয়াছেন "অস্য (আনন্দস্য) মাত্রামুপ-জীবন্তি লোকাঃ।" ছিঁটে ফোঁটাতেই জগৎটা বাঁচিয়া আছে। পূর্ণ আনন্দকে পাইয়াছে কবে?

বৃন্দাবনেই এই পূর্ণানন্দের পূর্ণ বিকাশ—অনাবৃত প্রকাশ। তাহাতেই পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ সকলেই এই বৃন্দাবনের দিকে আকৃষ্ট। উহা অনাবৃত আনন্দের বিচরণ ভূমি। পথে, ঘাটে, জলে, স্থলে, বৃক্ষে লতায় সর্ব্বত্র আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা।

সত্যদ্রষ্টৃগণ সুপ্রাচীন কাল হইতেই পরম সত্য বস্তুকে "আনন্দ" বলিয়া দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন-বিশ্বের—অণুপরমাণুর অন্তরে এক মহাকামনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই মহান্ কামনাময় সুরের মূল কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা এক কামনাময় পুরুষের সন্ধান পাইয়াছেন। এই কামপুরুষের আয়তন কামনা। আয়তন বলিতে 'পরিমাণ' 'সীমানা' 'বিস্তার' যাহাই মনে করা যাউক না কেন সকল দিক দিয়াই অসীমতাকে বুঝাইবার জন্যই কামকে সেই মহা-পুরুষের আয়তন বলা হইয়াছে। কামের শেষ নাই। হৃদয় সেই পুরুষের বাস স্থান। এই হৃদয় সমষ্টিও হইতে পারে ব্যষ্টিও হইতে পারে। কামায়তন মহাপুরুষের বাসস্থান জীবের হৃদয়। মন সেই মহানের

জ্যোতিঃ। সঙ্কল্প ও বিকল্প করাই মনের স্বভাব। এই সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্য দিয়াই কামনা বহ্নির বিকীরণ। অতএব জীবের মন জ্যোতিঃর পরম আশ্রয় এই কাম পুরুষকে জানিলে সকল বস্তুই জ্ঞাত হয়। এই কাম পুরুষের দেবতা স্ত্রী। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই কামময় মহান্ পুরুষের কথা আছে যথা—

"কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্য্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ * * * তস্যকা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ"। বাংলার শ্রীগৌরসুন্দর ভালবাসা দিয়া—প্রীতি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে এই কামময় পুরুষের স্ত্রী-দেবতা পুরুষের আনন্দলীলার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি বার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্যরূপেব্যতনোৎ পুনঃ সঃ প্রভূর্বিবধৌ প্রাগিবলোকসৃষ্টিম্ ॥

সাধারণতঃ মনে হয়, প্রথমে একটি পদার্থকে বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করিব, উহার স্বরূপ স্বধর্ম্মের পরিচয় জানিয়া লইব, পরে উহাকে ভালবাসিতে হয় ভালবাসিব। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে না। স্বরূপ মাধুরীই সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া দেয়। বস্তুর তত্ত্ব জ্ঞান, স্বরূপের পরিচয় হয় তাহার প্রীতির গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে। কোনরূপ বিচার বুদ্ধি প্রীতিকে পরিচালিত করিতে পারে না, উহারা প্রীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। যেখানে প্রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, বিচার বুদ্ধি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। বিচার বুদ্ধি থাকে না বলিয়া প্রীতির কিছু গৌরব হানি হয় না, ভালবাসার মহিমা কমিয়া যায় না। এই বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এবং প্রেম-মহিমা অনুভব করিয়াই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিক কবি ব্রাউনিং (Browning) বলিয়াছেন,—

"So let us say, not, since we know we love,
But rather since we love know enough."

"আমরা জানি অতএব ভালবাসি একথা না বলিয়া বরং বলিব যেহেতু ভালবাসি অতএব আমরা খুব জানি।"

শ্রীবৃন্দাবন মাধুরীতে যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বেদোক্ত কামময় পুরুষকে বৃন্দাবনে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কাম গায়ত্রী যার উপাসন ॥

অন্যস্থানে—

"কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করিল উদয়
ত্রিজগত কৈল কামময় ॥"

ত্রিজগৎকে কামময় করার স্বভাবটি নূতন আগন্তুক নহে। উহা চিরন্তন। এই কামময় লীলাও নিত্য। কামনার টানে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, গুল্ম, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, নর, দেবতা স্বয়ং ব্রহ্মা, রুদ্রকে পর্যন্ত টানিয়া কামময় মহান্ পুরুষের সহিত মিলিত করিবার জন্য পিয়াসী করিয়া তোলে। নন্দনন্দন স্বরূপ গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর রূপ নরলীলার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই স্বরূপের মাধুর্যও অসমোর্দ্ধ। এমন মাধুরী ভগবানের আর কোন স্বরূপেই ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ বা সুযোগ নাই। বৃন্দাবন ধামই এই

স্বরূপটিকে বিশেষ করিয়া বিকাশ করিয়া দিয়াছে—তাহাতে আবার ভৌম বৃন্দাবন। অতএব বৃন্দাবন ধাম আমাদিগের শরণ হউক।

বিকুণ্ঠপুর সংশ্রয়াৎ বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রস শ্রেয়সীম্।
চতুর্মুখ মুখৈরপি স্পৃহিতার্ণ দেহোদ্ভবা
জগদ্‌গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥

চতুর্মুখ ব্রহ্মাদি জগতের আদি গুরুবর্গও এই ধামের রজে অভিষিক্ত হইতে, এই চিন্ময় ভূমিতে তৃণ জন্ম লাভ করিবার জন্য কামনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা চারিমুখে ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন—রাজপুত্র হয়েন—সাধারণের বন্ধু, সুহৃৎ, আত্মীয়, কুটুম্ব হয়েন, সেই দেশবাসীর সৌভাগ্য অবশ্যই কীর্ত্তনীয়। ব্রহ্মাও এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াই বলিলেন,—

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্‌ঘ্রি রজোভিষেকম্॥

হউক না কেন বন তবুতো বৃন্দাবন। না হয় উহা গো সকলের আবাস স্থান তাহাতে ক্ষতি কি? গোবিন্দ সেই তো সকলের রক্ষক। ধূলি হইলেই বা ক্ষতি কি? উহা যে প্রেমময়ী গোপীপদ রেণু! ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যময় সুখ অতি তুচ্ছ শ্রীবৃন্দাবন ধামই বরং অধিকতর সুখময়।

গোবিন্দের নিত্য সঙ্গী, বৃহস্পতির মেধাবান পরম প্রিয় শিষ্য ভক্ত-শ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহাশয় ব্রহ্মার বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া ব্রজসুন্দরীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়া উঠিয়াছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ॥

"ব্রজরমাগণের চরণরেণু ভোগি গুল্ম লতা ওষধি বৃক্ষের স্বজন হইয়া আমি বৃন্দাবন বাস করিতে পারিব কি ?

কথিত আছে, বৃন্দাবনে বাস লাভ করবার জন্য বৃন্দাবন ধাম মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যের প্রতীক ভগবানের বক্ষস্থল বিহারিণী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তপস্যা করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপঃ।" বৃন্দাবন বিহারীর মাধুরী পতিব্রতা শিরোমণি সাবিত্রী অরুন্ধতী প্রভৃতির মনও বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে।

ভগবানের নাভিকমলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা, নিত্য সঙ্গী হইয়া উদ্ধব, প্রিয়া হইয়াও লক্ষ্মীদেবী, বৃন্দবনের মাধুরীতে পরমাকৃষ্ট। তাহাতেই ব্রহ্ম সংহিতার কথা মনে পড়ে—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ
দ্রুমাঃ ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবন ধাম ॥

চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণি গণ দাসী চরণ ভূষণ ॥

কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্যধন ॥

অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥

সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীত ॥

সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদু যাঁহা মূর্ত্তিমান ॥

লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ ॥

এই সকল গুণেই সকলের মন কম্পাশের কাঁটার মত বৃন্দাবনের দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবস্থান করে। অন্যের কথাতো দূরে স্বয়ং ভগবান বৃন্দাবন বন-মহিমায় আকৃষ্ট। বলদেব ও কৃষ্ণ পিতামাতার সহিত বৃহদ্‌বন হইতে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার সময় যে পরম আনন্দ প্রকাশ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী গোপাল চম্পূ-গ্রন্থে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। ভাগবত বক্তা শুকদেবও পরমাবিষ্ট চিত্তে বলদেব ও কৃষ্ণের এই আনন্দ দর্শন করিয়া লীলা-শ্রবণাবিষ্ট পরীক্ষিৎকে প্রেম ভরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

বৃন্দাবনং গোবৰ্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীৎ উত্তমাপ্রীতি রাম মাধবয়োর্নৃপ ॥

বৃন্দাবন ধাম গোবিন্দের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। তরু, লতা, কুঞ্জবন, যমুনা পুলিন, কুণ্ড, গিরি, গোষ্ঠ সকলেই গোবিন্দ সেবার উপকরণ লইয়া সুসজ্জিত। নাটকে দেখিতে পাই

কৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্বাভাবিক শোভা সম্পদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন আমার সর্ব ইন্দ্রিয়কে পরমানন্দ প্রদান করিতেছে।

ক্বচিদ্ ভৃঙ্গী গীতং ক্বচিদনিল ভঙ্গী শিশিরতা
ক্বচিদ্ বল্লী লাস্যং ক্বচিদমলমল্লী পরিমলম্।
ক্বচিদ্ধারা শালী করক ফল ফালীরস ভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনম্॥

মধুঋতুর সমাগমে কুঞ্জবনে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে। উহারা গোবিন্দের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে সেবা করিবার জন্যই এই গুঞ্জন ব্রত ধারণ করিয়াছে। সুশীতল হিল্লোলে লতাকুল আন্দোলিত হইয়া গোপালের লোচন যুগলের আহ্লাদের জন্য নৃত্য কুশলতার পরিচয় দিতেছে! মল্লিকার সৌরভ গোবিন্দের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিয়াই মন্দ মারুতের সঙ্গী হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছে। এই যে দাড়িম্ব বৃক্ষে সুপক্ক ফল বিদীর্ণ হইয়া রসধারা প্রবাহিত হইতেছে উহা গোবিন্দের আস্বাদনের জন্যই তো? কুঞ্জ শোভার পরিসীমা নাই। অগণিত কবি, ভাবুক, রসিক, ভক্ত, দার্শনিক এই কুঞ্জ শোভা বিবিধ ভাবে অনুভব করিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দ বিলাসের উপকরণে কুঞ্জবন সুসমৃদ্ধ। নিত্য নবভাসে বিলাস আনন্দ। বসন্ত বিলাসের একটি দৃশ্য কবি গোবিন্দদাস কিরূপভাবে অনুভব করিয়াছেন, একবার ভাবিয়া দেখুন—

নব ঘন কানন শোভিত কুঞ্জ।
তহিবর বিকশিত কুসুমক পুঞ্জ।
নূতন পল্লব সৌরভ ভাল।
শারি শুক পিককুল বোলত রসাল॥

তঁহি বণি অপরূপ রতন হিন্দোর।
তঁহি পর বৈঠল যুগল কিশোর॥
ব্রজ রমণীগণে দেই ঝখোর।
পড়ব জানি ধনি নাগর আগোর॥
কত কত উপজল রস পর সঙ্গ।
গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥

ভাগবতে গোবৰ্দ্ধনকে হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সত্যই গোবর্দ্ধনের মত এরূপ সেবা আর কোথাও দেখা যায় না। গিরিরাজের মহিমা বর্ণনাতীত। গোবিন্দ-সুখের জন্যই তাঁহার জীবন। নিদাঘ তাপে পরিতপ্ত হইযা গোচারণ ক্লেশের পর বিশ্রাম লাভ করিবার ইচ্ছা হইলে গোবৰ্দ্ধন পরম রমণীয় সুশীতল মণি শিলার আসন পাতিয়া দেন। পক্ষিগণের সুমধুর কাকলিই স্বাগত। নির্ঝরের জলে গোবিন্দের চরণ প্রক্ষালন করাইযা প্রেম বিহ্বল মৃগ-কুলের পদক্ষিপ্ত দর্ভতৃণের অতি সুকোমল অংশ দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করা হয। কুণ্ডের কমলগন্ধিজল আচমনীয়—ধেনুগণের দুগ্ধ, দধি ও বৃক্ষের মধু প্রভৃতির মিলনে মধুপক প্রভৃতি দ্বারা গোবিন্দ সেবার উপকরণ প্রস্তুত হয়। এ সকল বস্তুই গোবর্দ্ধনে সুপ্রাপ্য। ধারাপাতে স্নানীয় জল, বৃক্ষ বল্কল বসন, সুগন্ধি হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ এবং প্রফুল্ল কুসুম সমূহে সেবা করিয়া গিরিরাজ চিরদিনই কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ধূপ, দীপ, আভরণেরও কিছুমাত্র অভাব পড়ে না। দেবদারু, মহামণি, গুঞ্জা, পুচ্ছ প্রচুর পরিমাণে পর্ব্বতের স্বানুপ্রদেশে পাওয়া যায়। ফল কন্দ ও মূলে গোবিন্দের বিচিত্র আহার্য্য রচনা হয়। তুলসী মুখবাসে কৃষ্ণ না জানি কতই আনন্দিত হন! পুষ্পবাসিত কুণ্ডের জল পুনরাচমনীয় ও পুষ্প চম্পকাদি দ্বারা আরত্রিক করিয়া হরিদাস বর্য্য গিরিরাজ গোবিন্দ সেবা করেন। ফুল্ল পল্লব শোভিত

বকুল ছত্র, মলয় মারুত হিল্লোলিত নব পল্লব ব্যজন, ময়ূরের অঙ্গভঙ্গি নৃত্য পুষ্পশয্যা শয়ন স্থান, কোকিলের কূজন মঙ্গল গান, গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণ সেবার উপকরণ সকলই আছে। ধন্য গিরিরাজ!

এবারে কুণ্ডের কথা! কুণ্ড বহু আছে, তন্মধ্যে গোবিন্দকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড প্রধান। গোবিন্দ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে গোবিন্দপ্রিয় সহচরগণের আনন্দ কুঞ্জ, আর রাধা কুণ্ডের চারিদিকে রাধাপ্রিয় সহচরীগণের বিলাস কুঞ্জ। এই সকল কুঞ্জশোভা ও মহিমা প্রাকৃত মন বুদ্ধির অগোচর একমাত্র কুণ্ড বিলাসিনী শ্যামরঙ্গিণীর দাসীগণের কৃপা লাভ করিলেই এই অপূর্ব্ব দর্শনীয় দর্শন হয় ও মাধুরী অনুভব হয়।

কিবা সে কুণ্ডের শোভা রাই কানু মন লোভা
চারি দিকে শোভে চারি ঘাট।
নানা মণি রত্ন ছটা অপূর্ব সোপন ঘটা
স্ফটিক মণিতে বান্ধা ঘাট॥

লীলা-মাধুরী দর্শন-লোলুপ ভাবনয়নেই সকল সৌন্দর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণের নিকট উহা প্রাকৃত জলাশয় মাত্র।

লীলানুকুলেষু জনেষু চিত্তেষুৎপন্ন ভাবেষু চ সাধকানাম্
এবম্বিধং সর্ব্বমিদং চকাস্তি স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু চ॥

দিল্লীর শাসকর্ত্তা, সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনের কেশী ঘাটের এক ধাপ সিড়ি সংস্কার করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঘাটের নিকট গমন করিয়া কি জানি অচিন্ত্য কৃপার প্রভাবে পাতশাহের ভাব নয়ন খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন—যে সকল বহুমূল্য মণিরত্নে ঘাটের অন্যান্য ধাপগুলি

সুন্দর ভাবে বাঁধানো আছে, তদনুরূপ মণিরত্ন রাজকোষেও সুদুর্লভ। বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তিনি পরম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যের গরিমা আর রহিল না।

মানস-গঙ্গা—ব্রহ্ম-হ্রদ প্রভৃতির মহিমা বর্ণনাতীত। বেদগুহ্য তত্ত্ব সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীভগবানের সেবার জন্য ধামে সুবিরাজিত। মধুর ভগবানের মধুর সেবা লাভ করিবার জন্য মুনি, ঋষি, বেদমাতা স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত কেহ স্ফুট, কেহ বা গোপন মূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন নিখিল ভগবদ্ধাম মধ্যে তাহার অভিনব মাধুর্য্যে মহিমান্বিত। রূপ, বেণু, লীলা ও প্রেম-মাধুর্য্য বৃন্দাবনের বিশেষত্ব। এই চতুর্বিধ মাধুরী আর কোন ধামে নাই।

বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী জলে রাজহংস কেলি করে
কনক কমল উৎপল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ অষ্টদলেতে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছে দুই জনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া পড়িছে খসি
হাস পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সেবা দিয়া রাখহ চরণে॥

আজ কাল অনেকেই শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনা করেন। অনেক-

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর নিকটেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলার একটা না একটা আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শ্রীরাধাকে জীব বলিয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এই চিন্তার ধারায় গা ভাসাইয়া অনেকেই এখন রাধা হইবার একটা আকাঙ্খা মনে মনে পোষণ করেন এবং কখন কখন সভা সমিতিতে তদনুরূপ উপদেশও দিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব যথার্থ ভাবে আলোচনা করিলে কিন্তু আমাদের এই ধারণা পরিত্যাগ করিতে হয়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরণে ধরিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বৃন্দাবন কাহার? তাহারা সমস্বরে বলিয়া দিবেন উহা রাধার। বৃন্দাবন রাধার রাজ্য। এই রাজ্যে রাই রাজা—পৌর্ণমাসী প্রধানমন্ত্রী। বৃন্দাদেবী বনাধিকারী। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ সেনাপতি রূপ গোস্বামীপাদের দানকেলি কৌমুদী নাটকে দেখা যায়—সকলের সম্মুখে রাধারাণীর অভিষেক হইতেছে—বৃন্দাবনের আধিপত্যে।

সেবা দয়া, ভালবাসা স্ত্রীলোকের ধর্ম। বৃন্দাবন সেবা, দয়া ও ভালবাসার রাজ্য। প্রত্যেক জীব চরিত্রের দুইটি দিক্ আছে। একটি পুরুষোচিত, একটি স্ত্রীজাতি সুলভ। পাশ্চাত্য মরমী Blakeও মানুষের এই দুইটি ভাব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রীতির অনুশীলনে আবার এই স্ত্রী ভাবের প্রাধান্যই স্বীকার করিতে হয়। "The Soul" নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য দার্শনিক Newman (নিউম্যান) বলিয়াছেন, "মানবাত্মার পরমানন্দ মন্দিরে গমন করিতে হইলে স্ত্রীলোক হইতে হইবে।" If the soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become a woman yes, however manly thou be among men it must lean to love being dependant and must lean on God not

solely for distress or alarm but because it does not like independence or loneliness.

বৃন্দাবন এই পরমানন্দ ধাম—প্রেমময়—সুখময় রাজ্য। এই রাজ্যে সুখে বাস করিতে হইলে রাধারাণীর অনুগত হইতে হইবে। রাধা হইলে চলিবে না—হওয়া যাবেও না। রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই রাধা হওয়ার কল্পনাও কখন করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন স্ত্রীরাজ্যে স্ত্রীজাতিরই অধিকার ও পরম আনন্দ।

মীরাবাঈ ও শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবাদ অনেকের মুখে শুনিতে পাওযা যায়। শ্রীপাদ ভক্তিমতী মীরাবাঈকে বলিয়া পাঠালেন, তিনি পুরুষ অতএব কোনও স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করিতে অসমর্থ। মীরাবাঈ সেই কথা শুনিয়া বলিলেন 'বড়ই অদ্ভুত কথা! বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কোনও পুরুষ আছে, তাহা জানিতাম না, অদ্য হইতে জানিলাম আরও একজন পুরুষ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন।

কেবল পুরুষোচিত সকল ভাবে তিলাঞ্জলি দিতে পারিলে বৃন্দাবনে থাকা যায় তাহাই নহে। এই প্রেম রাজ্যের মহামন্ত্র রাধাগোবিন্দের যুগল সেবা। আত্মসুখ গন্ধহীন—দেহ, মন, বাক্যে রাধা সুখে সুখী হওয়া চাই। আমি—রাধা হইব—কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব এইরূপ ভাবিলে অহং গ্রহোপাসকের সাধনার সহিত কিছুই পার্থক্য রহিল না। জীব গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন "অভেদ ভাবনা নৈবাঙ্গী ক্রিয়তে কিন্তু তদনুগত ভাবনৈব।" (ভক্তি-সন্দর্ভঃ)

অভেদ ভাবনা এই সাধনায় স্বীকার করা হয় নাই, বরং তদনুগত ভাবনাই অঙ্গীকার করা হইয়াছে। রাধাপদ দাসী ভাবনা—মঞ্জরী ভাবনাই ভাবনার সার। মঞ্জরীগণের স্বসুখ বাসনার গন্ধ মাত্র নাই।

মঞ্জরীগণ যুগল সুখাভিলাষিণী। যুগলের সুখেই তাদের সুখ।

স্বতন্ত্র সুখ স্বাদনের স্বপ্নও তাহারা জানেন না। ভোগের জন্য অভ্যর্থিত হইলেও প্রত্যাখ্যান করিয়া রাধার মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই ইহারা ধন্যা। এই মহিমাময়ীগণের স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে প্রেম রাজ্যের মীমাংসার চরম সিদ্ধান্ত। আমাদিগের মনে হয়, যতদিন জগতের নরনারী নির্বিশেষে এই মঞ্জরী পদে বিকাইয়া না যাইবেন ততদিন পর্য্যন্ত চরম শান্তির আশা অসম্ভব। বৈষ্ণব সাধক ঠাকুর মহাশয় ইহাদের প্রেম মহিমা বিচার করিয়াই বলিলেন—

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মম ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥

উহারা না জানি কোন্ এক ভিন্ন রাজ্যের উপাদানে গড়া, উহারা নিজে সুখী হইবার জন্য দেহ মন বাক্যে কোন চেষ্টাও করেন না। সকল কাজে সকল চেষ্টায় কেবল রাধাগোবিন্দ সুখ বিধানের জন্যই নীরব ভাবে আত্মোৎসর্গকারিণী এই মহিমাময়ী মঞ্জরীগণ।

এই মঞ্জরীগণের রীতি অনুসারে সেবা প্রাপ্তিই বৈষ্ণব সাধনার চরম লক্ষ্য। তাই নরোত্তম দাস গাহিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥

কালিন্দীর তীরে কেলী কদম্বের বন।
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন॥

শ্যাম অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥

গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ॥

নিত্যসখী ললিতা বিশাখা দেবীর আজ্ঞা অনুসারে যুগল-কিশোরের সেবাই পরম প্রাপ্তি। যদি বল তোমার এরূপ কি যোগ্যতা আছে যে, নিরন্তর অনন্ত কামনা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত তোমার মন লইয়া মায়াবদ্ধ জীব তুমি এই প্রেমসেবা রাজ্যের অধিকার লাভ করিবে? তাহার উত্তরে বলিব, আমার যোগ্যতা কিছুমাত্র নাই, তবে লোভ হইয়াছে এই সেবা পাই। লোভ কাহারও কথা শোনে না—যোগ্যা-যোগ্য বিচার করে না। আরও দেখ যিনি যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া বৃন্দাবন মাধুরী ও রাগমার্গ-ভক্তি জগতে দান করিবার জন্যই আবির্ভূত সেই—

কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

এইই কলিহত পতিত জীবের বল, এইই তাদের দুর্ব্বল প্রাণের ভরসা।

প্রেম আলোকে প্রকাশো জগপতি হে

"যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।"

কবিগুরুর কথাগুলির মধ্যে নৈষ্ঠিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, উহা তাঁর প্রেমদর্শনকে দর্পণের মত স্বচ্ছ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, "ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমায় জানায় অভাব আছে তা নয় কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমনভাবেই চলি যেন তিনি কোনখানেই নেই। এর কারণ কী? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মেনি, সুতরাং তিনি থাক্‌লেই বা কী না থাকলেই বা কী? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশী করে আছে।"

প্রেমের অভাবে তাঁর সত্বাকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয় এ কথাটি কত স্পষ্ট ভাষায় কবি প্রকাশ করেছেন পূর্বোক্ত উক্তি তার নিদর্শন। ঔপনিষদ সত্যকে রসরূপে দর্শনের আকূতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবিমানসে দেখা দিয়েছে। রসরূপে জানলে জানার সার্থকতা হয়, এ কথাও তিনি বহুবার বলেছেন। তিনি বলেন, "যিনি চরমসত্য তিনিই পরমরস অর্থাৎ প্রেমস্বরূপ।" এই প্রেমস্বরূপ বলেই সকল ভেদ সকল বিভিন্নতা ও বিরোধের সমাধান হয়েছে তাঁর মধ্যে। কবি বলেন, ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে কেন, কী হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না—প্রেম আপনিই আপনার লক্ষ্য। প্রেমকে পেতে হলে ত্যাগের প্রয়োজন অথবা প্রেমই ত্যাগের শিক্ষক এ কথাটার মীমাংসা করা খুব সহজ নয় বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে অনেক দিক দিয়ে

আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে' না। প্রয়োজনের তাগিদে যেটা ত্যাগ করতে হয় অথবা যেগুলো আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সেগুলোর সম্বন্ধে ত্যাগ কথার ব্যবহার চলেই না। যেগুলো নিজের অভিসন্ধি মেটাবার জন্য দেওয়া হয়, সেগুলোও ত্যাগ নয়। যেখানে সকল আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ হয়ে যায়, স্বার্থ-বুদ্ধি ভুল হয়, শুধু আপনহারা হয়েই যা দেওয়া যায়, সরল কথায় প্রেমে যা কিছু ত্যাগ করা যায়, সেটুকুই ত্যাগ। আর ত্যাগ করে যেখানে আনন্দ সেখানেই প্রেমপ্রকাশ। যেগুলো পাওয়ার জন্য নিজের দিকে টানবার জন্য অহংকারকে বড় করবার জন্য দেওয়া হয়, সেগুলো কখনো ত্যাগের কোঠায় পড়ে না। নিছক দেওয়ার জন্যই দেওয়া, ফিরিয়ে নেওয়ার কথা যখন ওঠে না, তখনই প্রেমের পর্যায় আলোচনার বিষয় হয়। কবি বলেন—"আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখিনে। সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি ...স্বার্থপর দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের সূর্য একেবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে!"

প্রেমের তত্ত্ব নিরূপণ করে কত কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রে। কবি তাঁর সহজ প্রাণের কথায় এই প্রেমের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন—"প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সবই ত্যাগ করেছেন. তিনিই প্রেমস্বরূপ।...প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।" সৃষ্টি আছে অথচ স্রষ্টা নেই, বিশ্ব আছে বিশ্বপতি নেই, প্রাণ আছে প্রাণের দেবতা নেই, মন্দির আছে বিগ্রহ নেই—এর চাইতে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে! সবচাইতে বেশী হয়ে যিনি আছেন তাঁকে সবচাইতে কম করে দেখা একটা কত বড় ভুল সেটা প্রাণবান্ লোক বুঝবেন। তাঁর অননুভব জীবনে বিরাট অভাব সৃষ্টি করে নিশ্চয়, তা ছাড়া এই অভাব দুঃখকে বেশী করে ডেকে

আনে। ঈশ্বর নেই একথা যারা বলে বেড়ান তাদের কথা স্মরণ ক'রে কবি বলেন—এই না থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না থাকার শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই এত বড় ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে!"

মুক্তি পুরুষার্থ। মানুষ মুক্ত হতে চায়। ত্যাগ-বৈরাগ্য যোগ-তপস্যা যে কোনো মূল্যে এই মুক্তি কিনতে চায়। মুক্তির মৌলিক মূল্য ত্যাগ—ত্যাগেই মোক্ষ। মোক্ষ পেলে কি হয় বা কি হবে, এ সম্বন্ধে কত লোকের জল্পনা কল্পনা। কবির দার্শনিক মন বলে "অহংকারই আমাদের ত্যাগের পথটাকে সোজা সরল হতে বাধা দেয়। যে পরিমাণে অভিমান অহংকার বৃদ্ধি পায় বন্ধনের নাগপাশ ততই শক্ত হয়। সে বন্ধন ছিন্ন করা সহজ হয় না। অভিমান অহংকারের বোঝা মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দিলে ত্যাগের পথটা সরল হয়ে আসে, আর পূর্ণ ত্যাগ বৃত্তির উদয় হলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু এই মুক্তি পেয়ে কি হয় এ সম্বন্ধে কবি বলেন—মুক্তি পেয়ে কী পাব? মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

এই বিশ্ব রচনায় বিশ্বপতি কেমন করে নিয়ত নিজেকে ত্যাগ করছেন সে কথা কবি বলেন,—"সৃষ্টি বিশ্বপতির আত্মত্যাগ ব্রত, নিজের শক্তিকে অনন্ত ধারায় প্রবাহিত করে সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে দান করছেন অফুরন্তভাবে। এই ত্যাগ এতবড় আত্মবিসর্জন প্রেম ভিন্ন সম্ভব নয়; তাঁকে প্রেমস্বরূপই বলতে হয়।" এই প্রেমযোগই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরম পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

'পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম মহাধন।'

এই প্রেমের সঙ্গে যোগ হবে প্রেমেই। প্রেম স্বতন্ত্র, কারও কাছে তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার নেই। স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রেমময় হতে হবে।

স্বাধীন না হলে প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব নয়। কাজেই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রেমসম্বন্ধ পাতানো হয়। গোপীগণের প্রেমের আদর্শ দেবর্ষি নারদ দিয়েছেন। তাঁর বিচারে এঁদের প্রেমের তুলনা নেই। মহাভাব-স্বরূপা রাধা প্রেমময়ী। তাই প্রেমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেয় সঙ্গে তাঁর মিলন-মাধুরী জীবের পরমলক্ষ্য চরম কাম্য। প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিগুরু প্রেমকেই জীবনা-দর্শ ব'লে গ্রহণ করেছেন। এই প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জীবন ভরে মূল্য দিতে হয়, আর সে মূল্য হয়েছে ভোগত্যাগ। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন—প্রেমের মূল্য প্রেম, অন্য মূল্যে উহা পাওয়া যায় না। কবিগুরু সামঞ্জস্য চিন্তা করতে গিযে বলেছেন, "জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি ; সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব একসঙ্গে মিলে থাক্‌তে পারে।" যুক্তির ফল যে কাটাকাটি আর কর্মের শেষ পর্যন্ত মারামারি এ কথা বলতে সঙ্কোচ হয়নি। যুক্তিবান্ তার্কিক আর শারীর শক্তি নির্ভরশীল কর্মপরায়ণ অভিমানী কর্মী কখনও মিলতে পারে না। প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়।

জীব গোস্বামী মহাপ্রভুর মতবাদের সারাংশ সংগ্রহ করেছেন। ভগবান এবং তাঁর শক্তির মধ্যে যে নিরাবিল সম্বন্ধ, সেটি ভেদ কি অভেদ এ সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছেন সেটি হয়েছে সবচাইতে বিস্ময়কর চমৎকৃতি। ভেদাভেদ সম্বন্ধটিকে তিনি বলেন, অচিন্ত্য ভেদাভেদ। কবিগুরু ভগবানের স্বরূপ, প্রেমের স্বরূপ বলতে গিয়ে এই ভেদাভেদ তত্ত্বটির সংকেত করেছেন। তিনি বলেন, 'ভগবান্ প্রেম-স্বরূপ কিনা—তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিযে এক করেছেন।'

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে তর্ক চিরদিন। উপনিষৎ তাঁকে সগুণ বলেন আবার নির্গুণও বলেন। এক বস্তু যুগপৎ এই বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত

কেমন করে হয়, এই নিয়েই যত তর্ক। এ তর্কের খাতিরে কত দল সৃষ্টি। যুক্তিবাদীরা পর পর আপন দলের মতবাদ পুষ্ট করবার জন্য কত লেখা লিখেছেন। কত বিবাদ আর কত সংবাদ এই সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম নিয়ে। বিরুদ্ধ কথাগুলির সমাধান প্রতিটি আচার্য বেদান্তভাষ্যে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর পুরুষ অথবা অপুরুষ অপ্রমেয় সে কথা মীমাংসার চেষ্টা চলেছে কত যুগ ধরে। Personal অথবা Impersonal তিনি, একথা সহস্রবার জিজ্ঞাসিত ও আলোচিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, হ্যাঁ তিনি নিশ্চয়ই পুরুষ Personal, আর কেউ বলেছেন, না কিছুতেই না, তিনি নির্গুণ নিরাকার নিরুপাধি, কাজেই Impersonal, কবিগুরু বলেন—'প্রেমের মধ্যে এই হ্যাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ আর একটা নির্গুণ। তার একদিকে বলে আমি আছি, আর একদিকে বলে আমি নেই'। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—উপনিষদের কথায় এই আনন্দ যে প্রেম সেটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সিদ্ধান্ত-রত্নে বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন, "জ্ঞানবিশেষে এব ভক্তিশব্দ কৌরবেষু পাণ্ডবশব্দবৎ। জ্ঞান নানাপ্রকার, জানা-দেখার পার্থক্য হেতু ভাবেরও পার্থক্য হয়। যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ যাঁকে অজ্ঞেয় বলা হয়েছে, তাঁকেও এমন করে জানা যায় যে, তাঁকে জেনে আর কোন দিক্ থেকে ভয় পেতে হয় না। সেই অভয় পরমপদ ব্রহ্ম। "তাঁকে শুধু জানা নয়—আনন্দের জানা প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্ঘন করে জানা।...প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না।"

কবির বক্তব্যটি নানাভাবে পরিস্ফুট হয়েছে জীবনে ও কাব্যছন্দে। সীমার মধ্যেই তিনি অসীমের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি স্পষ্টই বুঝেছেন তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা হয় না।

ভাগবতে আমরা শুনি—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তম্ মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপীকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

নন্দ গৃহিণী যশোদা জন্মরহিত অব্যক্তস্বরূপ মনুষ্যমূর্তি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত পরমব্রহ্ম কৃষ্ণকে আপন শিশুসন্তান ভেবে প্রাকৃতশিশুর মাতার মত তাঁহাকেও উদূখলে দড়ি দিয়ে বেধেছিলেন। এই সংবাদে অজ হয়েও অব্যক্ত হয়েও অধোক্ষজ হয়েও কেমন ক'রে পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ বাঁধা পড়েন তার উল্লেখ রয়েছে। কবিগুরু বলেন—"যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এতো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন"। ভাগবতে আছে "কৃপযাসীৎ স্ববন্ধনে।" কবির কথায় "এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা আমাদের পিতা।" আমরা বলব নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই কৃষ্ণ যশোদানন্দন। কবিগুরু প্রেমের অধীনতা যে কতবড় বৈষ্ণবের কথায় তার ব্যাখ্যা করে বলেন—"অধীনতা জিনিষটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে—ভগবান্ জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন, সেই পরমগৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব।"

বৈষ্ণব সাহিত্যে সেবাধর্মকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। সেবা ভিন্ন প্রেম সার্থক হয় না। সেবার মাধ্যমে প্রেমের অভিব্যক্তি। পরমেশ্বরে প্রেম আছে তাঁহার প্রমাণ তাঁর সেবা আছে। সেবক বলে, প্রেম আছে কিন্তু সেবা নেই, এ রকম ভাব মোটেই সহনীয় নয়। বিশ্বে সকলেই কোনো না কোনো সেবা করে। এই সেবা যদি প্রেমের সেবা হয়, তা হলেই ঈশ্বর প্রেমের পরিচয় হবে। কবিগুরু বলেন—"মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্ব-জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিষকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন।"

বৈষ্ণব কবি প্রেমের ঋণকে খুব বড় করে দেখেছেন। ভাগবতের কথায় ভগবান গোপীদের কাছে প্রেমের পরাজয় স্বীকার করেছেন। তিনি ঋণী হয়েছেন, সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে কাঁদাই সার হবে—হয়েছে। এ কথার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে, কাব্যে ইতিহাসে, প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্র প্রেমস্বরূপের এই ঋণদায়ের কথা বলেছেন—"একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে।"

শান্তির জন্য প্রার্থনা চলে। কে না জীবনে মরণে শান্তিকে চায়—কিন্তু শান্তি চাইলেই কি পাওয়া যায়? রোগী রোগের প্রতিকারের জন্য ঔষধ গ্রহণ করে, কত কিছু করে; তাতে যেটুকু শান্তি পাওয়া যায়, সেটাও খুব অল্পকাল স্থায়ী। রোগীর শান্তি চাওয়া আর স্বাস্থ্য চাওয়ার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান আছে। কবি বলেন—"আমাদের শান্তিতে চলবে না, প্রেম দরকার।" প্রেম যে সব সময় শুধু সুখই এনে দেবে সে কল্পনা অবশ্য করা হয় নি। প্রেম সুখও আনে দুঃখও আনে। তাই কবি ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেন—"হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না। প্রেম শান্তি রূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে, দুঃখ হয়েও আসবে।

মৃত্যু ও অমৃত্যু পরস্পর বিরোধী হলেও উভয়কে নিয়েই সংসার। মৃত্যুর ওপারে অনন্ত অমৃত। অমৃতের সন্ধান যাঁরা করেন তাঁরাও অমৃতময় হয়ে যান। মৃত্যুর মধ্যেও তাঁরা অমৃতের স্পর্শ লাভ করেন। প্রেমেই এই ভীষণতম মৃত্যুর অন্ধকারেও অমৃতের মধুর রূপ প্রকাশ করে। কবি বলেন, "এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম

পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি।" মিথ্যার আশ্রয়ে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্যকে নিয়েই প্রেম হয়। যেটা লৌকিক মোহ-উৎপাদক চিত্ত-বিভ্রান্তকর উহা কখনও প্রেম আখ্যা পেতে পারে না। প্রেমের সাধনায়, অমৃতের সাধনায়, সংযম বিবেচনা ও সৌন্দর্য থাকবে। কবির কথায়, হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। প্রেম যথাস্থানে প্রযুক্ত না হলে মৃত্যুলোকে খণ্ডিত হবে আর তার বিকারেরও শঙ্কা আছে। তাই কবি প্রেমকে "বিকার শঙ্কা" হতে উত্তীর্ণ করবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন—"আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে খণ্ডিত করছি; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহু বিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হ'ক।"

কাঞ্চীপুরী

প্রথম জীবনে গান শুনিয়াছিলাম—

গয়াগঙ্গাপ্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ॥

তীর্থগুলির মহিমা বুঝিনা কিন্তু নামগুলি ভাল লাগে। এবার কাঞ্চী দর্শনে বাহির হইলাম। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থের অন্যতম এই কাঞ্চীপুরী। মোক্ষদায়িনী সপ্তপুরী যথা—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরীদ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

(স্কন্দ পুরাণ)

(১) অযোধ্যা (২) মথুরা (৩) মায়া (৪) কাশী (৫) কাঞ্চী (৬) অবন্তী (৭) দ্বারকাপুরী এই সপ্তপুরী মোক্ষদায়িকা। মোক্ষলাভ করিবার লালসা আছে বলিয়া কোনদিন মনের কোণে খুঁজিয়া পাই নাই। তবু তীর্থ দর্শনের বাসনা আছে ইহা প্রতি পদেই অনুভব করিয়াছি। লক্ষ কোটি মানব যে সকল পুণ্যভূমি সন্দর্শনে দেহ এবং মনের তৃপ্তি লাভ করেন, সেগুলির ধূলিকণা যে অতিশয় দুরাচারকেও পবিত্র করিতে সমর্থ ইহা আমি বিশ্বাস করি, আর বিশ্বাস করি বলিয়াই মাঝে মাঝে তীর্থ দর্শনের অভিলাষ জাগে।

কাঞ্চীপুরীর মহিমা শুনিয়াছি। ভগবান্ শ্রীহয়শীর্ষ অগস্ত্য মুনিকে বলেন—মুনিপ্রবর, অতীব রহস্য কথা বলি শ্রবণ করুণ, কাশী ও কাঞ্চী তীর্থ ভগবান্ শঙ্করের নেত্রস্বরূপ বৈষ্ণব ক্ষেত্র বলিয়াই ইহাদের প্রসিদ্ধি। ইহাদের সেবনে শিব-সান্নিধ্য লাভ হয়। লপ্রাচীকা

লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীদেবীর দর্শনের নিমিত্ত দীর্ঘকাল কঠিন তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যার ফলে মহালক্ষ্মী শ্রীহস্তে কমল ধারণ করিয়া ব্রহ্মার সমীপে আবিভূ'ত হন। ব্রহ্মা দর্শন করেন—কমলাসনে শ্রীলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুর সহিত মনোহারিণী রূপে অবস্থান করিতেছিলেন।

কাঞ্চীতীর্থ কথা বিভিন্ন পুরাণে আছে। মহাদেব এই বিষ্ণুতীর্থে বহুকাল তপস্যা করিয়াছেন। বিষ্ণু আরাধনা ফলে শিব এখানেই ভক্তরাজ আখ্যা লাভ করেন। শিবভক্তও কাঞ্চীবাসগুণে বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।

এক শিব ভক্ত তাহার নাম হেরম্ব। তিনি বহু শিবতীর্থ ভ্রমণ করিলেন। কাশী হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত নানা তীর্থ দর্শনপূর্ব্বক কাঞ্চীতে আসিয়া উপস্থিত। পর্যটক ব্রাহ্মণ এই স্থানটির শোভা সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি আর অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করেন না। কায়মনোবাক্যে কাঞ্চীবাস করিয়া হেরম্ব শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইলে তিনি কাঞ্চীতেই দেহত্যাগ করেন। শিবদূতগণ তাহাকে কৈলাসে শিবধামে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে বৈকুণ্ঠপ্রিয় পার্ষদ বিষ্ণুদূতগণও আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণুদূতগণ বলেন—হেরম্ব বৈকুণ্ঠে যাইবে, ছাড়িয়া দাও। শিবদূতগণ বলেন—ইহাকে শিবলোকে লইয়া যাইব। দুই দলের বচসা হইতে বিবাদ আরম্ভ হইল। এমনকি শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। নিজ নিজ ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য পরিশেষে কৈলাস হইতে বৃষারূঢ় মহেশ অপর পক্ষে গরুড়াসন শ্রীবিষ্ণুও আসিয়া আবিভূ'ত হইলেন। উভয়ের দর্শন হইলে উভয়েরই আনন্দ হইল। নিজ ভক্তগণের যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। শ্রীবিষ্ণু তখন হেরম্বকে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং শ্রীশিবলোকে লইয়া গেলেন। শিবধামের সৌন্দর্য্য দর্শন করাইয়া হেরম্বকে তিনি নিজ বৈকুণ্ঠধামে লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণের আর

আনন্দ ধরে না। শিবস্থানে বাসের ফলেও তাহার গোবিন্দ দর্শন হইয়া গেল। এই কাঞ্চীতীর্থ দর্শনে স্পর্শনে চিন্তনে বা স্মরণে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ঋষিগণ এই তীর্থে বহু তপস্যা করেন। কথিত আছে, মহামুনি মরীচি এই তীর্থে পুত্রকামনায় তপস্যা করিয়া কশ্যপের ন্যায় মহাপুরুষ সন্তান লাভ করেন। অত্রি মুনিও এই স্থানেই তপস্যার ফলে সোম (চন্দ্র) দুর্বাসা এবং দত্ত (দত্তাত্রেয়) এই তিন পুত্র লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হন। মুনিগণের প্রসিদ্ধ তপস্যার স্থান এই কাঞ্চীপুরী।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইয়া এবার স্থানটি দেখিবার ভাগ্য হইল। মাদ্রাস হইতে চেঙ্গলপুত, অরকোনম্, তিরুপতি বালাজী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থে যাইবার বাস আছে। আমরা চেঙ্গলপুত হইতে মহাবলীপুর হইয়া বাসে কাঞ্চীভোরাম্ আসিয়া পৌছিলাম। এখানে একটি বিরাট ধর্মশালায় "রাজ-ভবন" চৌল্ট্রী ঘর ভাড়া করিয়া লইলাম। থাকিবার স্থানটি বেশ মনের মত পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

একটি শহরেরই দুই প্রান্তে দুটি প্রসিদ্ধ তীর্থ শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল হইবে। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী একটু দূরে। কলের জল থাকাতে কোনরূপ জলকষ্ট হয় নাই।

শিবকাঞ্চীর "সর্বতীর্থ সরোবর" চারিধারে বাঁধানো বৃহৎ সরোবর। ইহার ধারে ধারে মন্দির আছে। যাত্রীরা ধর্মার্থ এখানে মুণ্ডিত হয় এবং স্নান দান করে। মন্দিরগুলির মধ্যে একটি প্রধান মন্দির কাশী বিশ্বনাথের, কিছু দূরে একাম্রেশ্বর এই তীর্থের প্রধান মন্দির। বিরাট মন্দিরের গোপুর শোভা ও মণ্ডপ শোভা দর্শনীয়। বিচিত্র কারুশিল্পের নিদর্শন মূর্ত্তিগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম ঘেরায় গোপুর দ্বার প্রায় দশতলা উঁচু। এই দ্বারের দুই পার্শ্বে সুব্রহ্মণ্যম্ (কার্তিক) ও

গণেশের মন্দির ও মূর্ত্তি। দ্বিতীয় ঘেরায় শিবগঙ্গা সরোবর। জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎসব মূর্ত্তি লইয়া এখানে জলবিহার উৎসব হয়। খুব বড় মেলা হয় শুনিলাম। দক্ষিণ দিকে শ্মশানেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। আরো যে কত শিবমূর্ত্তি তাহার নাম বা গণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহার পরেই প্রধান মন্দিরদ্বার। একাম্রেশ্বর শিব শ্যামবর্ণ। প্রসিদ্ধ এই মূর্ত্তি সৈকতী। ইহাকে ক্ষিতি মূর্ত্তি শিব বলে। ইহার পিছন দিকে গৌরী ও শঙ্করের যুগল মূর্ত্তি আছে। শুনিলাম শিবের মাথায় জল দেওয়া হয় না। চামেলি তেল দিয়া অভিষেক হয়। প্রতি সোমবারে উৎসব মূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ প্রভৃতি হয়। পরিক্রমা পথে শিবভক্তগণ, গণেশ, অষ্টোত্তর শিবলিঙ্গ, নন্দীশ্বর, চণ্ডিকেশ্বর, চন্দ্রকণ্ঠ ও বালাজীর মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখা যায়। দ্বিতীয় পরিক্রমা পথে কালিকাদেবী, কোটিলিঙ্গ এবং কৈলাস মন্দির আছে। এই কৈলাস মন্দিরে শিব ও গৌরীর স্বর্ণময় প্রতিমা উৎসব মূর্ত্তি আছে। বাহিরে ৬৪ যোগিনীর মূর্ত্তি দর্শনীয়। বাম পার্শ্বে এক মন্দিরে স্বর্ণকামাখ্যা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা আছেন। সুব্রহ্মণ্যদেব কার্ত্তিক তাহার দুই পত্নী লইয়া অবস্থান করেন পৃথক এক মন্দিরে।

মন্দির প্রাঙ্গনে একাম্রেশ্বর নামটিকে সার্থক করিয়া বহুকালের প্রাচীন একটি আম্রবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষটিকে পরিক্রমা করিলাম। চারিদিকে বেদী বাঁধানো ছোট একটি মন্দিরে তপস্যা নিরত দেবী। একাম্রেশ্বর মহাদেব আবির্ভাব কথা শুনিলাম। এক সময় ভগবতী পার্ব্বতী এরূপ অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন যে, ত্রিভুবনে কোথাও কিছু আর দেখা যায় না। তখন মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য দেবী এইখানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট মহাদেব একাম্রেশ্বর হইয়া আবির্ভূত হইলেন। দেবী বালুকার লিঙ্গে তাহাকে পূজা করেন। পূর্ব্বদিকের গোপুরদ্বারের সমীপে নটরাজ ও নন্দীশ্বর মূর্ত্তি আছে। নবগ্রহ দেবতার বেদীও

দর্শনীয়। উহাতে প্রতিটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকেন। একটি চতুঃষ্কোণ বেদীর উপর এই নবগ্রহ মূর্ত্তি অনেক মন্দিরেই দেখিয়াছি, এখানেও দেখিলাম। বাংলাদেশে এরূপ নবগ্রহবেদী কোনো মন্দিরে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই বেদী প্রদক্ষিণেরও স্থান আছে। তেলের প্রদীপের তেল আর কালি এই সকল মন্দির-বেদীগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে বড়ই অপরিষ্কার করিয়া রাখে। তেল কালি আর জল মিশিয়া যা হয়।

এই মন্দির হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে কামাক্ষী মন্দির। দক্ষিণ ভারতে এই মন্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ। ত্রিপুরাসুন্দরী আদ্যাশক্তি কামাক্ষীদেবীর এই পীঠকে কামকোটি পীঠও বলা হয়। বিশাল মন্দিরে প্রধানা দেবী কামাক্ষী ছাড়াও অন্নপূর্ণা ও শারদার মন্দির আছে। একটি পার্শ্ব মন্দিরে আদ্য শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি পূজা হয়। এই কামকোটি পীঠে কামাক্ষীদের সহিত আদ্যালক্ষ্মী, বিদ্যালক্ষ্মী, সন্তানলক্ষ্মী, সৌভাগ্যলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, বীর্য্যলক্ষ্মী, ও বিজয়লক্ষীর পূজা হয়। মহাশক্তির এরূপ পূর্ণাঙ্গ পূজা অন্যত্র দুর্লভ। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি সরোবর আছে। প্রতিদিনকার মন্দির পরিষ্কার করা প্রভৃতি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এরূপ সরোবরের উপযোগিতা।

এই মন্দির আদি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। মন্দিরের দ্বারে শ্রীরূপলক্ষ্মীসহ শ্রীচোর মহাবিষ্ণু এবং মন্দিরের অধি-দেবতা মহাশাস্তার মূর্ত্তি দর্শনীয়। শত শত মূর্ত্তি এই মন্দিরে চারি-দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

শিবকাঞ্চীর অন্যান্য শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলি এরূপভাবে নির্মিত হইয়াছিল যে, সমস্ত মন্দির এই কামাক্ষীদেবীর মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন যে মন্দির হইতে দেবতার বিজয়

হইবে কামকোটি পীঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া শোভাযাত্রা ভ্রমণ করিবে। এইভাবে দেখা যায়, এই পীঠের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

কামাক্ষী মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্বে বামনদেবের মন্দির। এখানে বামনদেবের ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি মন্দিরের অভ্যন্তরে ছাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। একটি মশাল জ্বালাইয়া চরণ ও বদনাদি পূজক দেখাইয়া দিলেন। মশালের ধোঁয়া ও কালিতে মন্দির মলিন হইয়াছে। মনে হইল, মূর্ত্তি দশ বার হাত উঁচু হইবে। উপরের দিকে যে চরণ প্রসারিত উহা ছাদ স্পর্শ করিয়াছে আর নীচের চরণ বলিরাজের মস্তকের উপর স্থাপিত। মশাল না ধরিলে এই মূর্ত্তি ভালমত দেখা যাইত না।

কাছেই সুব্রহ্মণ্যদেব বা কার্ত্তিকের মন্দির। শিব-কাঞ্চীতে শতাধিক মন্দির আছে। আমরা সবগুলি দেখিয়াছি একথা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। তবে প্রধান মন্দিরগুলি দেখিয়াই একটা বিরাট প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই।

সকালবেলা বিষ্ণুকাঞ্চী চলিলাম। পথে অগ্রসর হইতে লক্ষ্য করিলাম গৃহস্থবাড়ীর সম্মুখে রাস্তাটি কেমন সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন প্রতিটি গৃহস্থ। শুধু পরিচ্ছন্নতার দিক্ দিয়াই নয়, তাহাদের যে একটা রুচিবোধ এবং আল্পনার রীতি উহা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। প্রতি গৃহে প্রধান দ্বারের সম্মুখে পথের উপরেই সাদা ও হলদে চূর্ণদ্বারা, কোথাও বা লালবর্ণের চূর্ণদ্বারা মঙ্গল মণ্ডলাদি রচনা প্রতিদিনকার নিয়ম।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজ। শ্রীদেবরাজ স্বামী নামেও ইনি প্রসিদ্ধ। ভগবান নারায়ণই বরদরাজ স্বামী ও দেবরাজ স্বামী নামে আরাধ্য। মন্দিরের পথে দেখিলাম দুই ধারেই বৈষ্ণব গৃহস্থগণ ললাটে শ্রীসহিত তিলকাদি ভূষিত শুদ্ধ বেশে অবস্থান করিতেছেন। কেহ বা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

বিরাট মন্দির। একটির পর একটি তিনটি দেউল অতিক্রম

করিলাম। পূর্ব্বদিকের গোপুরদ্বারম্ এগারতলা উঁচু। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে ব্রহ্মোৎসব হয়। এই উৎসব দক্ষিণদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিমদিকের গোপুরদ্বারে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই শতস্তম্ভ মণ্ডপ। অতি সুন্দর শিল্পবিদ্যার নিদর্শন এই মণ্ডপে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যস্থলে এক সিংহাসন। শোভাযাত্রা বাহির হইলে ভগবানের উৎসব মূর্ত্তি এখানে আনয়ন করা হয়। উত্তর-দিকে আরও একটি ছোট মণ্ডপ আছে। মণ্ডপের কাছেই কোটিতীর্থ সরোবর ইহার নাম "অনন্তসর"। চারিদিক পাথরে বাঁধা, মধ্যে একটি মণ্ডপ। এই জাতীয় সরোবর দক্ষিণদেশে প্রতিটি মন্দিরেই দেখিয়াছি। কোটি তীর্থের পশ্চিমদিকে বরাহদেব, সুদর্শন ও যোগ নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বামনদেব, বরাহদেব, যোগনৃসিংহ প্রভৃতি বিগ্রহ দেখা যায় না। শ্রীলক্ষ্মীসহ শ্রীনৃসিংদেব বহু মন্দিরে দেখা যায়। পশ্চিমদিকের গোপুরের পরে বিশাল গরুড় স্তম্ভ। নারায়ণ মূর্ত্তির সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ থাকিবেই। পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরও প্রয়োজন। একটি মন্দিরে রামাজানুচার্যের মূর্ত্তি পূজিত হয়। আচার্য রামানুজের প্রধান আটটি পীঠের অন্যতম প্রধান পীঠ বিষ্ণুকাঞ্চী। এখানকার আচার্যের উপাধি 'প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর'।

গরুড় স্তম্ভের পূর্ব্বে আর একটি ঘেরায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী বা শ্রীপেরু-দেবীর মন্দির। দর্শন অতি সুন্দর, নানা অলঙ্কার ভূষিত। লক্ষ্মী-ঘেরার পশ্চিমেই বিবিধ যানবাহনগুলি দেখা যায়। এইগুলি শোভা-যাত্রার সময় বাহির হয়। অনন্তনাগ হাতী ঘোড়া গরুড় ময়ূর বাঘ সিংহ হনুমান শরভ প্রভৃতি মূর্ত্তি রূপার ও স্বর্ণমণ্ডিত আছে।

তৃতীয় ঘেরার মধ্য আঙ্গিনায় বেদীর উপর শ্রীবরদরাজ মন্দির। বেদীর নাম হস্তীগিরি। হস্তীগিরি ঐরাবতের প্রতীক। নিকটেই ছোট মন্দিরে যোগনৃসিংহ। ইঁহাকে পরিক্রমা করিতে গেলে বিশ্বক্সেন মূর্ত্তি পড়ে। হস্তীগিরিতে উঠিতে পিছন দিক হইতে ২৪টি সিঁড়ি

আছে। উহা গায়ত্রী মন্ত্রের চব্বিশ অক্ষরের প্রতীক। মন্দিরকে ঘিমান বলা হয়। এই মন্দিরে চার হাত দীর্ঘাকৃতি চতুর্ভুজ নারায়ণ বরদরাজ মূর্ত্তি, গলায় শালগ্রাম মালা। শুনিলাম নেপালরাজের দেওয়া এই উপহার মালা। পরিক্রমা পথে আন্তাল, ধন্বন্তুরি, গণেশ এবং অন্যান্য বহু মূর্ত্তি আছে।

শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের একটি বৈঠক দেখিলাম। কিন্তু দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনো বিশেষ স্থান আছে বলিয়া শুনিলাম না। আমার মনে হয়, বাঙালী বৈষ্ণবগণের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ তীর্থগুলিতে মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থান বলিয়া কিছু চিহ্নিত করিয়া রাখা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙালী বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শুনিলাম, শেষশায়ী মূর্ত্তি দেবাধিরাজ সরোবরের জলে নিমজ্জিত আছেন। ঐ মূর্ত্তি প্রতি বিশ বৎসর পর পর জল হইতে উঠাইয়া উৎসব হয়। সেই সময় বিষ্ণুকাঞ্চীতে বহুলোক সমাগম হয়।

কাঞ্চীতীর্থে আমাদের বেশ লাগিয়াছিল। তীর্থযাত্রার ক্লেশ অল্প-মাত্রায়ও এখানে বোধ হয় নাই। সুবৃহৎ চৌল্ট্রী বা হোটেল বাড়ী বিজলী আলো পাখা স্নানঘর প্রভৃতি সবই আরামপ্রদ। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমবায় হইতে এই বৃহৎ ধর্ম্মশালাটির পত্তন হইয়াছে। বহু-লোকের এইস্থানে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। খুব কাছেই বাজার আর সব রকম শাকশব্জি টাটকা প্রতিদিন পাওয়া যাইত। কাজেই আহার্য্য সম্বন্ধেও কোনো অসুবিধা ছিল না। এইভাবে আমরা ৫।৬ দিন এই আনন্দদায়ক কাঞ্চীতীর্থে অবস্থান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিলাম।

শ্রীবালাজী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি দর্শন করিব। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সঙ্কল্প হইয়াছিল। কর্মব্যস্ততায় সম্ভব হয় নাই এতদিন পর্য্যন্ত। এবার কিন্তু আমার দেহ মন একান্ত অবসন্ন থাকা সত্ত্বেও কি জানি কার প্রবল আকর্ষণে টিকিট করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গীরাই আমাকে চালাইয়া লইয়া চলিল। দক্ষিণ দেশের প্রধান প্রধান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। কি দেখিলাম অনেকেই জানিতে চাহিয়াছেন শুনিতে চাহিয়াছেন। এখানে একটি তীর্থের কথাই আলোচনা করিব। অনেকেই শ্রীবালাজী নামটির সঙ্গে পরিচিত। এই বালাজী ভগবানের কথাই বলি। ইনি দক্ষিণদেশে তিরুপতি নামে খ্যাত। তিরু কথার অর্থ "শ্রী" তিরুপতি অর্থ শ্রীপতি। ইহাকে বেঙ্কটেশ্বরও বলা হয়। যে বৈষ্ণব ক্ষেত্রে মহামহিমাময় তিরুপতি বিরাজমান উহার নাম বেঙ্কটাচল। নীলাচলে জগন্নাথ—বেঙ্কটাচলে বেঙ্কটেশ্বর। বেং = অমৃত বীজ, কট = ঐশ্বর্য্য। অতএব অমৃতময় ঐশ্বর্য্য ধাম বেঙ্কটাচল। ভগবানের এই লীলাক্ষেত্র চিন্তামাত্র সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া চিন্তামণি ধাম। জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া জ্ঞানাদ্রি, তীর্থময় বলিয়া তীর্থাদ্রি, সুন্দর পুষ্কর পদ্ম পাওয়া যায় বলিয়া পুষ্করাদ্রি বলিয়াও প্রসিদ্ধি। এই স্থানের বহু নাম ভক্তগণের দ্বারা আবিষ্কৃত ও পুরাণে বর্ণিত আছে। যথা— বৃষাদ্রি, কনকাদ্রি, নারায়ণাদ্রি, বৈকুণ্ঠাদ্রি, সিংহাচল, অঞ্জনাদ্রি, বরাহাদ্রি ও নীলগিরি। কোনো সময় ভগবান শ্রীনিবাস নিজনামে অভিহিত করিয়া এই স্থানের নাম শ্রীনিবাসাদ্রি বা শ্রীশৈল রাখিয়াছেন। রেণিগুণ্টা জংসন হইতে এই স্থানে যাওয়া যায়। ষ্টেশনের নাম তিরুপতি ইষ্ট। মাদ্রাস মিণ্টবাসষ্টপ হইতে তিরুপতি

তিরুমালাই বাস চলে। ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। তিরুপতি দেবস্থানের ট্রাষ্টী বোর্ড যাত্রনিবাস খুব বিরাট ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রতিদিন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী অনায়াসে যাত্রীনিবাসে অবস্থান করিয়া এই তীর্থ ভ্রমণ করিতে পারেন। পাহাড়ের নীচে এবং উপরে উভয় স্থানে বিশাল অট্টালিকা যাত্রীদের থাকিবার জন্য আছে। চিত্তুর জেলায় চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত এই স্থান।

বরাহ কল্পের কথা। ভগবান বরাহদেব রসাতল গতা ধরণীকে উদ্ধার করিলেন। তখন কিছুদিন ধরণীর সঙ্গে বিহারের অভিলাষে এখানে থাকিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছা হয়। ভগবান মহাবিষ্ণু তখন নিজ বাহন গরুড়কে আদেশ করিলেন বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহার ক্রীড়াপর্ব্বত আনয়ন করিতে হইবে। প্রভুর আদেশে গরুড় বৈকুণ্ঠ হইতে এই অপ্রাকৃত রত্নশোভিত শিখর মণ্ডিত কল্পবৃক্ষযুক্ত পুণ্যকানন ও নির্ঝরাদি শোভামর নারায়ণগিরি নামক ক্রীড়াপর্ব্বত লইয়া আসিলেন। ভগবান বিষ্ণু প্রথম কিছুদিন স্বামী পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে অবস্থান করেন। পরে আবার দক্ষিণ দিকে মন্দিরে আগমন করেন।

ভগবান বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া শ্রী ও ভূ শক্তি সহিত বেঙ্কটাচলে বিরাজমান। এই স্থানের মহিমা বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক বলা হয়। না হইবে কেন, বৈকুণ্ঠের ভগবানই লীলা করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে এই ধাম প্রকাশ করিয়াছেন—মানুষের সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য। ললাটে তিলক বিচিত্র বেশ পুষ্পসজ্জা মণিময় বহুমূল্য অলঙ্কার আর রাজোপচারে প্রতিদিন পূজার কি ঘটা। ভক্ত সমাগমে তিরুপতি তিরুমালা নিরন্তর উৎসব পুরী। সিংহদ্বার হইতে ভিতরের মন্দিরের কবাট পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত উজ্জ্বল কারুকার্য্য শোভা। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে করিতে মনের উপর যেন একটা পবিত্রতার ভাব বিকীর্ণ হয়। ক্ষুদ্র কামনা বাসনা কিছু সময়ের জন্য ভুলিয়া যাইতে হয়। পবিত্রতায় স্নিগ্ধতায় সরলতায় উদারতায়

প্রসন্নতায় আত্মহারা হইতে হয়। দর্শক যাত্রীগণ যে আকূতি নিষ্ঠা ও উৎসাহ লইয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল উহা দেখিয়া নিজের প্রতি বারংবার ধিক্কার দিতেছিলাম। সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছি বলিয়া কেন এখনও আমার হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি হইতেছে না? কেন আমি শুষ্ক হৃদয় ভাবশূন্য স্তব্ধ মন, এমন ঔদাস্যের কারণ কি? জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপরাশিই কি ভগবদ্দর্শনে উল্লাসের অভাব ঘটাইতেছে। ইহা কি তাঁহার চিন্তায় দূরীভূত হইবে না—চিত্ত কি আনন্দে নাচিয়া উঠিবে না? ভাবিতে ভাবিতে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অবশের মত সঙ্গীর হাত ধরিয়া চলিলাম মন্দিরের অভ্যন্তরে। আহা সে কি দর্শন! চক্ষু জুড়াইল—প্রাণে যেন অমৃতের-ধারা প্রবাহিত হইল—প্রতিটি অঙ্গ মনের সঙ্গে নাচিয়া উঠিল—ধন্য আমি, ধন্য-তুমি! হে ভগবান্, বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ করিলে। যে তোমার নাম শুনিয়া বহু পূর্ব্বে তোমাকে না দেখিয়াও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি, 'ভক্ত চরিত্র' বর্ণনা করিতে বসিয়া সেই তোমাকে আজ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি তোমার করুণার জয় হউক। আমার মত অপরাধীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও টানিয়া আনিয়াছ তোমার পদতলে। দেখিয়া সাধ মিটে না। পিছনে যাত্রীদল। সম্মুখে যাইতে পূজকের নির্দ্দেশ। বাহির হইয়া যাইতেই হইবে। শ্রেণীবদ্ধ যাত্রীর সঙ্গে বাহির হইলাম। আবার প্রবেশ করিলাম। এইভাবে অতৃপ্ত নয়নে কয়েকবার দেখিয়া লইলাম। ফিরিয়া বাসায় যাওয়া আবার ভোজনাদির ব্যবস্থার কথা মনে ছিল। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব দর্শন সমাপ্ত করিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু হইলে কি হয়, বাহিরে যাইতে মন চলে না। প্রসাদ কিছু ভোগমণ্ডপ হইতে ক্রয় করিয়া লইলাম। সকলে মিলিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। কিছুটা সুস্থ বোধ করিয়া আবার চলিলাম মন্দিরে। এবার শুনিলাম পূজা অভিষেক ও বিশেষ দর্শন, দর্শনী সাত টাকায় মাত্র চারজন। টিকিট লইয়া প্রবেশ করিলাম। জয়বিজয়ের

মত দ্বারপালেরা চারজনের বেশী আধাজনও ভিতরে যাইতে দিবে না। মনে পড়িল, বৈকুণ্ঠ দ্বারে চতুঃসনের কথা। তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা আর কাহারও অজানা নাই। কত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, আমাদের একটি সঙ্গী বাহিরে রহিল তাহাকে আসিতে দাও না ভাই। দ্বারীরা সে কথা শুনিল না, শুনিতে পারে না, কর্ত্তৃপক্ষের কঠিন আদেশ। সাত টাকায় চারজনের দর্শন। কিছুক্ষণ দেখিলাম চক্ষুর সম্মুখে বিচিত্র ভূষণে সুসজ্জিত ভগবান্, কর্পূর আরতি হইতেছে সহস্রনাম পূজার পরক্ষণেই। মন চঞ্চল ছিল বাহিরে থাকা সঙ্গীটির জন্য দেখা হইলেও মন বসিল না। স্বামী পুষ্করিণী দেখিলাম। বৈকুণ্ঠপ্রিয় শ্রী ও ভূ দেবীর ক্রীড়াস্থলী এই জলাশয় স্নান তর্পণ ও অভিষেকমাত্র সর্বপাপ বিনাশ করে। জল স্পর্শ করিলাম পবিত্র হইলাম। স্নান দুর্লভ ইষ্টসিদ্ধি করায়, তাহা আর ভাগ্যে হইয়া উঠিল না। আবার যদি কোনো দিন হয়, এই আশা লইয়া ফিরিলাম।

দুর্লভং মানুষং জন্ম দুর্লভং তত্র জীবনম্।
স্বামীপুষ্করিণী স্নানং ত্রয়মত্যন্ত দুর্লভম্॥

(বরাহ পুরাণ ৩৫ অধ্যায়)

একদা এক বৃদ্ধ রুগ্ন ব্রাহ্মণ অসহায় অবস্থায় এই পাহাড়ের উপর ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীভগবান এক কুমার বেশে তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণ এখানে কি কোন লোকজন নাই। ব্রাহ্মণ বলেন, কেন আমিতো এখনও মরিয়া যাই নাই। আমার আশ্রম অনেক দূরে বটে। জানিনা ব্রহ্মা আমাকে কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আমিতো কিছু করিতে পারিতেছি না, কত আশা আমার মনে ছিল। কুমার বেশে ভগবান বললেন—এত বয়স হইল এখনও ব্রাহ্মণ তোমার বাঁচিবার আশা কেন? ব্রাহ্মণ বলেন—আমার যাগযজ্ঞ করিবার আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। ভগবান তাহার হাত ধরিয়া একটি

ঝরণার ধারে লইয়া গিয়া তাহাকে স্নান করিতে বলিলেন। কি আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ সেই জলে স্নানের পর নূতন মানুষ হইলেন, তাহার জরা ব্যাধি দূর হইয়া গেল। ভগবান তাহাকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ তুমি এখন মনের মত করিয়া যাগযজ্ঞ করিতে থাক। এই ধারার নাম কুমার ধারা এখানে স্নান করিলে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায়। মঘা নক্ষত্রে পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমায় এই তীর্থ স্নানের মহিমা অধিক।

শ্রীরাম অবতারের কথা। ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে বানরসেনা লইয়া শ্রীরাম এই বেঙ্কটাদ্রি বা শেষাচলের নিকট আসিলেন। হনুমানের মাতা অঞ্জনা তখন পথের ধারে আসিয়া শ্রীরামকে বলেন—প্রভু তোমার আগমন হইবে জানিয়া এই শেষাচলে শুধু আমি নই, বহু মুনি ঋষি অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাদের একবার পদধূলি দিয়া যাইতে হইবে। শ্রীরাম বলেন—শীঘ্র আমাকে যাইতে হইবে পথে অপেক্ষা করা যাইবে না। মহাবীর আসিয়া বলেন—প্রভু বানর-সেনা আর যাইতে পারিতেছে না। এই পর্ব্বতে ফল ফুল জলের অভাব নাই। কিছু অপেক্ষা করিয়া যাইলে ভাল হয়। শ্রীরাম তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অঞ্জনাদ্রি বেঙ্কটাচলে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া যান। এইস্থানে নির্লোমা নামে এক ব্রাহ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করিয়া মুক্তি প্রদান করেন। আকাশগঙ্গার নিকট অঞ্জনার আশ্রম ছিল। শ্রীরাম এখানে আগমন করেন। বানরগণও পাহাড়ে নানা প্রকার ফলমূল ভোজন করিয়া আনন্দে থাকে। বর্ত্তমান মন্দিরের উত্তর দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে পদব্রজে আকাশগঙ্গায় যাওয়া যায়। এখানকার শীতল জলেই প্রতিদিন তিরুপতির সেবা পূজা হয়। মন্দির হইতে তিন মাইল উত্তরে পাপবিনাশন তীর্থ। এখান হইতে সহজে জল সরবরাহ হয়। পৌষ মাসে শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী রবিবার পূষ্যা ও হস্তা নক্ষত্রে স্নান করিলে বহু জন্মের পাপ দূর হয় এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই মূল মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই গোপুরম দ্বার এবং মণ্ডপগুলি সাধারণতঃ বহুক্ষেত্রেই মূল মন্দির হইতেও উচ্চতায় অধিক। ইহা ছাড়া এই গোপুরে যেভাবে নানাপ্রকার মূর্তি শিল্পের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় উহা অন্যত্র দেখা যায় না। তিরুমালা তিরুপতিতেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। উৎসবাদির সময়ে এই গোপুর আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া বিশেষ শোভা সৃষ্টি করে। বহুদূর হইতেও রাত্রিকালে পর্ব্বতের উপর আলোকসজ্জা দর্শকের হৃদয়ে হর্ষ ও ভক্তির অভ্যুদয় করে। শ্রীমন্দিরের মূল বিগ্রহের সম্মুখভাগে উৎসব মূর্ত্তি বা সোয়ারী মূর্ত্তি থাকে। প্রতিদিন যথানিয়মে এই উৎসব মূর্ত্তিকে লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। মণ্ডপে পূজা ভোগ আরতি হয়। আবার শয়ন মন্দিরে শয্যায় গমন করেন। স্বর্ণ ও রত্নাদি খচিত পাল্‌কী বা দোলায় করিয়া সোয়ারী মূর্ত্তির যাত্রা পরিক্রমা হয়, প্রায়শঃ সন্ধ্যার পর। চামর হস্তে ছত্র হস্তে সেবকগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। অগ্রে ভেরী তুরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া বাদকগণ গমন করে। সে কি মহাসমারোহ স্বচক্ষে উহা না দেখিলে বলিয়া বুঝান শক্ত।

স্বামী পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে একটি মন্দিরে আদি শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি আছেন। এই মূর্ত্তি বেঙ্কটেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তি বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। তামিল ভাষায় বহু কবিতায় বেঙ্কটাচল মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণ সংহিতায় এই তীর্থমহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। প্রাচীন আলোয়ারগণ এই স্থানে আগমন করিয়া তাদের ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাঞ্চীর পল্লব রাজগণ (নবম শতাব্দী) তাঞ্জোরের চোল রাজগণ (১০ম শতাব্দী) মাদুরা পাণ্ড্যরাজগণ এবং বিজয় নগরের শাসকবর্গ (১৪ ও ১৫ শতাব্দীতে) তিরুপতির ভক্ত ছিলেন এবং বহু ধনরত্ন ও ভূসম্পদ ভগবৎসেবার জন্য অর্পণ করিয়াছেন। বিজয় নগরের

রাজবংশ সম্ভূত কৃষ্ণদেব রায় ও তাহার প্রিয়াবর্গের মূর্ত্তি দেওয়ালের গায়ে এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেঙ্কটপতি রায়ের মূর্ত্তিও ঐ সঙ্গে দেখা যায়। বিজয় নগরের রাজবংশ ক্রমশঃ ম্লান হইলে মহারাষ্ট্রের রাখোজী ভোঁসলে প্রভৃতি মন্দিরের সেবা পূজার নিয়ন্ত্রণ করেন। বহুমূল্য রত্নাদি তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে দান করেন। মহীশূরের রাজা হায়দারাবাদের রাজবর্গও বহু দান করেন দেবতার ভাণ্ডারে। হিন্দু রাজার অধিকার বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসক ও ইংরেজ শাসকবর্গের হাতে এই স্থানের নিয়ন্ত্রণ ভার পড়ে। ১৮৪৩ খৃঃ হইতে হাতী রামজী মঠের হাতে শাসন ভার ন্যস্ত হয়। ১৯৩৩ খৃঃ মহন্তের হাতে এই ভার দেওয়া হয় তৎপর তিরুমালাই তিরুপতি দেবস্থান কমিটির উদ্ভব হয়। Hindu Religious and charitable endowment Act XIX of 1951 অনুসারে বর্ত্তমানে ন্যাসরক্ষক সমিতি সরকারী কর্ত্তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

পাহাড়ে উঠিবার দুই পথ। পুরাতন পথে পদব্রজে যাওয়া যায়, ৭॥ মাইল যাইতে প্রায় ৩॥০ ঘণ্টা লাগে। নতুন পথ মোটর চলিবার। বাস সার্ভিস সর্ব্বদা চলিতেছে। অনেক বাঁকা পথ অতিক্রম করিতে বেশ লাগে। ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকিলে নীচের দৃশ্য দেখিয়া বেশ আনন্দ অনুভব হয়। পদব্রজে যাইলে নীচে থেকে চার মাইল পর প্রথম নরসিংহ স্বামীর মন্দির তাহার পর রামানুজ স্বামীর মন্দির। জনশ্রুতি যেস্থানে রামানুজ পাহাড়ে উঠিবার সময় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই স্থানে এই মন্দির নির্মিত হয়। দুইটি গোপুর পৃথক নামে অভিহিত। একটা হইল আলিপিড়ি অপর গলিগোপুরম্। এই গলিগোপুরম্ বহুদূর হইতে দৃষ্টি গোচর হয়। সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপটি বর্ত্তমানে যাত্রী নিবাসে পরিণত হইয়াছে। পীউপুর, মহীশূর রাজার ছত্র এবং অন্যান্য ছত্রও এখানে আছে।

মন্দিরের মধ্যে তিনটি পরিক্রমার পথ আছে। এই পথ ধরিয়া

প্রদক্ষিণ পথ। প্রথমটির নাম সংপাঙ্কি প্রদক্ষিণ, দ্বিতীয় বিমান প্রদক্ষিণ, তৃতীয় বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ। মন্দির দ্রাবিড় সভ্যতার আদর্শ ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন। পূর্ব্বমুখী এই মন্দিরের উপরিভাগ বা বিমান স্বর্ণমণ্ডিত উহার নাম আনন্দ নিলয়ম্। দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথেই রন্ধনশালা, যাগশালা, কল্যাণমণ্ডপ, বাহন ও পরিমল বা যানাদি রাখিবার স্থান আছে। ইহা ছাড়াও বকুল মালিকা, যোগ নরসিংহ, বরদরাজ, রামানুজ, সেনাধিপতি সুব্রহ্মণ্য ও গরুড়ের মন্দির এই পথে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডপের নাম রঙ্গমণ্ডপ তাহার পরই স্বর্ণমণ্ডিত কপাটে বা বাঙ্গারু বকিলি এখানে বড় ভাণ্ডার আছে তাহার উপরে লেখা যিনি যাহা দান করিবেন এই পাত্রে দিন।

মন্দিরের অভ্যন্তরের মূল দেবতা বেঙ্কটেশ্বরের সম্মুখে মালয়াপ্পা স্বামী ইনিই উৎসব মূর্ত্তি। ইহা ছাড়া ভোগ শ্রীনিবাসমূর্ত্তি, কলুবু শ্রীনিবাস মূর্ত্তি, এবং উগ্র শ্রীনিবাস মূর্ত্তি এই সকল মূর্ত্তিই বেঙ্কটেশ্বরের।

প্রতিদিন যেভাবে পূজা ও দর্শন হয় সে সম্বন্ধে অনেক জানিবার ও বুঝিবার আছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু সংবাদ লইয়াছি ইহাই এই স্থানে উল্লেখ করিব।

প্রাত্যহিক সেবা ও তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সুপ্রভাতম সকাল ৫টায়, বিশ্বরূপ দর্শন ৫-৩০ মিং, তমাল সেবা ৯টা, কলুবু ১০ টা, সহস্রনাম অর্চ্চনা ১০-১৫ মিঃ, নৈবেদ্য ১২টা, মধ্যাহ্ন দর্শন ১২-৩০, শতনাম অর্চনা ২টা, নৈবেদ্য ৩টা, অর্জিতম্ তমাল সেবা ৪টা, অর্চনা নৈবেদ্যম্ ৭-৩০ মিঃ রাত্রি দর্শন ৮টা, একান্ত সেবা অথবা পংপু সেবা ৯টা।। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুটা বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

মাসিক উৎসবগুলিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। শ্রবণা নক্ষত্রে ভগবানের বিশেষ অভিষেক ও সোয়ারী অনুষ্ঠান হয়। রঙ্গমণ্ডপে অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে কিছু সময় দর্শন দান করেন এই দিনে। শ্রীকৃষ্ণ

জন্ম নক্ষত্র রোহিণীতে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। শ্রীরামানুজের জন্ম নক্ষত্র আর্দ্রা, এইদিন রামানুজাচার্য্য মূর্ত্তি সহ ভগবানের সোয়ারী হয় এবং রামানুজ মন্দিরের মণ্ডপে গমন করেন।

শ্রীরামের জন্মদিন পুনর্বসু নক্ষত্রেও উৎসব হয়। মহীশূরের রাজার জন্মদিনের উৎসব উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হয়। গাড়োয়াল ষ্টেট প্রদত্ত অর্থে প্রতি দ্বাদশী তিথির উৎসব হয়।

বসন্তোৎসব (চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা) নিত্যোৎসব (তেলেগু বৎসর গণনার প্রথম ৪০ দিন), নৌকা বিলাস (রুক্মিণীও রমলু বারু মূর্ত্তিসহ শ্রীকৃষ্ণ নৌকায় জল বিহার করেন) ব্রহ্মোৎসব (নবরাত্রি উৎসব) ধনুর্মহোৎসব পৌষ মাসে শুক্লা একাদশী, বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণা এই দিনে খোলা হয়। স্বামীপুষ্করিণীতে স্নান প্রাতঃকালে দর্শন মহিমা, অধ্যয়নোৎসব বৈকুণ্ঠ একাদশীর সময় ২৪ দিন ব্যাপি উৎসব, রথসপ্তমী মাঘী সপ্তমীতে বাহনে সাতবার প্রদক্ষিণ। নবরাত্রিতে ব্রহ্মোৎসব আরম্ভের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় অঙ্কুরার্পণ ও সেনাপতি সোয়ারী হয়। পর দিন হইতে সকালে সন্ধ্যায় বিভিন্ন বাহন সোয়ারী হয় যথা—(১) বড় শেষ বাহন (২) ছোট শেষ বাহন (৩) হংস (৪) সিংহ (৫) মুখ্ পাণ্ডিলি (মুক্তার পাল্কী) (৬) কল্পবৃক্ষ (৭) সর্ব-ভূপাল বাহন (৮) মোহিনী অবতারম্ পাল্কী (৯) গরুড় বাহন (১০) হনুমন্ত বাহন (১১) বসন্তোৎসবম্ (১২) গজবাহনম্ (১৩) সূর্যপ্রভা (১৪) চন্দ্রপ্রভা (১৫) রথোৎসব (১৬) অশ্ববাহন (১) পাল্কী উৎসব (১৮) ধ্বজাবরোহণম্ উৎসব।

প্রতিদিন ভোগের সময় দধি অন্ন, খিচুরী পুলিহোরা, পঙ্গলি। সর্করাপঙ্গলি, সকরভাত, কেশরিভাত, পায়স, সিরা লাড্ডু, বড়া পুলি, ডোসা, আপ্পম ও অন্যান্য দ্রব্য ভক্তের ইচ্ছামত মূল্য দিলে প্রসাদ পাওয়া যায়। চন্দন ও কর্পূর পদরেণু অত্যন্ত দুর্লভ প্রসাদ। মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

মাদ্রাস হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি ছোট বড় সকল মেয়েরাই মাথায় ফুলমালা ধারণ করেন। এটা শুধু শোভা নয়, ইহা যেন একটা ধর্মের অঙ্গ। তিরুমালা তিরুপতি স্থানে আসিয়া দেখিলাম একস্থানে নোটিশ আছে, এই পবিত্র তীর্থে সকল ফুলই ভগবৎসেবার জন্য ইহা যেন বিলাসের সামগ্রী বলিয়া অযথা ধারণ না করে। কথাটি পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। আর দেখিলাম, সত্যই সেখানে যাহারা যাইতেছেন তাহারা আর পুষ্প মালায় সজ্জিত নন। পাহাড়ের নীচে আসিয়া কিন্তু সকলেই মালা ধারণ করেন।

পাহাড়ের উপরে ও নীচে অনেকগুলি পবিত্র তীর্থ আছে যথা (১) পাপ বিনাশনম্ মন্দিরের উত্তরে প্রায় তিন মাইল (২) বৈকুণ্ঠ তীর্থম্ উত্তর পূর্ব্ব দুই মাইল (৩) পাণ্ডবতীর্থ উঃ পঃ ২ মাঃ (৪) জাবালী তীর্থ উঃ পঃ ২ মাঃ (৫) গোগর্ভ তীর্থ ১ মাইল (৬) চক্রতীর্থ উঃ পঃ ২ মাঃ (৭) ঘোন তীর্থ উঃ ১০ মাঃ (৮) রামকৃষ্ণ তীর্থ উঃ ৬ মাঃ (৯) তিম্বুরু তীর্থ উঃ ১০ মাইল। এই সকল তীর্থ প্রায়শঃ ঝরণা।

তিরুমালাই তিরুপতির দেবস্থান সংস্থান দেবসেবা ও জনসেবার উৎকর্ষ বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি সংস্থার নাম উল্লেখ মাত্র করিব। (১) শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ওরিএণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (২) বিদ্যালয় (মধ্য ও উচ্চ) কলেজ (৩) অনাথ আশ্রম কুষ্ঠাশ্রম, (৪) চিকিৎসালয় হাসপাতাল সেবাসদন (৫) মিউজিয়াম (৬) গোশালা (৭) যানবাহন পরিচালন সংস্থা। প্রত্যেকটি সংস্থার কার্যাবলী বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই বিশ্বাস হইল।

পাহাড়ের নীচে প্রধান তীর্থ পদ্মাবতী মন্দির; গোবিন্দ রাজ মন্দির, কোদণ্ড রাজ মান্দর ও কপিলেশ্বর মন্দির। তিরুপতি হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে তিরুচানুর বা পদ্মাবতী লক্ষ্মীর মন্দির। বাস

সার্ভিস আছে। পুরাণ কথায় এই পদ্মাবতী প্রসঙ্গ আছে। মন্দিরের কাছেই একটি সরোবর উহার নাম পদ্ম সরোবর। দেবী এখানেই পদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে পুরাণে নানা উপাখ্যান দেখা যায়। তুণ্ডিন দেশের আকাশ-রাজার যজ্ঞ ক্ষেত্র কর্ষণের সময় ভূমি হইতে পদ্মাবতীর উদ্ভব কথা বরাহ পুরাণে আছে। আকাশরাজার পত্নী ধরণীদেবী ইহাকে লালন পালন করেন। বড় হইয়া এই কন্যা পুষ্পোদ্যানে সখী বকুল মালিকার সহিত ভ্রমণ করিবার সময় বেঙ্কটেশ্বরের রূপ গুণে মুগ্ধ হন। তিনি সেই পরম পুরুষ বেঙ্কটেশ ভিন্ন আর কাহারও পত্নী হইবেন না। এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পদ্মার রূপে ঐকান্তিকতায় বেঙ্কটেশ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।

তিরুপতি ষ্টেশনের অদূরে গোবিন্দ রাজমন্দির। উচ্চ গোপুরম্ খুব সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। আচার্য্য শ্রীরামানুজই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, এরূপ শুনা যায়। তিরুপতি তীর্থের চারিদিকে মন্দির ও সহর গড়িয়া তুলিতে আচার্য্য রামানুজই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দ রাজ মন্দিরে আচার্য্য রামানুজের অন্য একটি পৃথক মন্দির আছে। ইহা ভিন্ন প্রসিদ্ধ বিষ্ণুচিত্ত আলোয়ারের কন্যা অণ্ডালের মূর্ত্তিও এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, তিরুমনগই আলোয়ার, বেদান্তদেশিক ও মনবল মামুনির মন্দিরও এখানে দর্শনীয়। নম্ম আলোয়ার এবং পেরি আলোয়ার মূর্ত্তিও পৃথক মন্দিরে আছে। বৈশাখ মাসে নবরাত্রি ব্যাপিয়া এখানে ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কোদণ্ডরামের উৎসব যাত্রা সমগ্র সহরে একটি বিরাট স্পন্দন জাগরণ সৃষ্টি করে। তখন রামকে বরদাতা রূপে সকলে বিবেচনা করেন।

কপিলেশ্বর মহাদেব খুব প্রাচীন স্থান। এখানে কপিলধারা

আছে। ইহার অপর নাম আলোয়ার তীর্থ। কপিলেশ্বরের দক্ষিণ দিকে বিরাট মন্দির নম্ম আলোয়ারের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তিরুপতির অদূরে চন্দ্রগিরি। এখানে প্রাচীন বিজয় নগরের শাসকগণের ভগ্ন মহলের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকাল হস্তী বা ত্রিকাল হস্তীর উল্লেখ আছে। এই ত্রিকাল হস্তী তীর্থও মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত শিবস্থান। একটি মকরী মূর্ত্তির উপর হস্তীর পদ লক্ষ্য করা যায়। কান্নপ্পর নামক প্রধান ভক্তের স্মৃতি জড়িত এই স্থানটি বড়ই মনোরম। ভাস্কর্য্য শিল্পের সুন্দর আদর্শ এখানে দেখা যায়। কান্নপ্পর তিণ্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন উপাখ্যান তামিল ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ।

নিষ্ঠুর শিকারীর পুত্র "তিণ্ণ"। পিতার আদর্শে শিক্ষিত, অস্ত্র চালনায় সুদক্ষ, তিণ্ণ যথাসময়ে শিকারীদের দলের সর্দ্দার হইল, তাহার দুর্ধর্ষ প্রকৃতির গুণে। বহু প্রাণী বধ করিয়াছে সে। একদিন একটা ভীষণ বন্য বরাহ শিকার করিয়া পথে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার সঙ্গী দুই ভৃত্য ছিল নাণ ও কাড়। তিণ্ণ জিজ্ঞাসা করিল এখানে খাওয়ার জল কোথায় বলতে পার। নাণ বলে ঐ অদূরে শাল বৃক্ষ দেখা যায় উহার পশ্চাতে পাহাড় আছে সেইদিকে নিচে সুবর্ণা নদী প্রবাহিত। তবে চল ঐদিকে যাই বলিয়া 'তিণ্ণ' ভৃত্যদের লইয়া অগ্রসর হইল, এক পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। নাণ বলে পাহাড়ে এক শিব মন্দির আছে। ঐ শিব তুমিও পূজা করিতে পার। কি জানি কেন পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে তিণ্ণর ক্ষুধা ও পিপাসা দূর হইয়া গেল। মাথার ভার নামিয়া গেল। অন্তরে আনন্দ হইতে লাগিল। মনে নতুন বাসনা জাগিল। সে বলে—নাণ, চল মন্দিরে শিব দর্শন করি। পাহাড়ের উপর মন্দিরের কাছে যাইয়া ভাব বিহ্বল তিণ্ণ শিবকে প্রেমে আলিঙ্গন করে। অশ্রুধারা বর্ষিত হয়। সে বলে—তুমি এই বনে একা থাক। বন্য পশু তোমাকে ঘিরিয়া থাকে। এখানে তোমার

কেহ বন্ধু নাই। ভক্তিতে তাহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে। আনন্দে হাতের ধনু পড়িয়া গেল। মূর্ত্তির মাথার কিছু শুষ্কপত্র পচা ফুল শীতল জল প্রভৃতি দেখিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে বলে কোন্ নরাধম তোমাকে এমন করিয়াছে।

নাগ তাহাকে বলে—আমি তোমার পিতার সঙ্গে বহুবার এখানে আসিয়াছি দেখিয়াছি এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করে। সে-ই শিবের মাথায় ফুল পাতা জল দিয়া যায়। আরও কিসব সে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলে। সে হয়তো আজও আসিবে।

তিণ্ণের ইচ্ছা সে পূজা করে। রীতি সে জানে না। সে ভাবে ক্ষুধার্ত্ত দেবতাকে মাংস খাওয়াইব। সে মন্দির হইতে বাহিরে যায় আবার ফিরিয়া আসে। যাইতে তাহার পা চলে না। মনে হয়, মহানিধি পাইয়াছি। ইহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইব ? সে সরল ভাবে প্রার্থনা করে—প্রিয়, আমি তোমার জন্য নিজ হাতে মাংস রন্ধন করিয়া আনিব। তোমাকে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না অথচ তোমার ক্ষুধা হইয়াছে। অবশ্যই কিছু আনিতে হইবে। তিণ্ণ চলিল শিবের জন্য খাদ্য আনিবে বলিয়া। নাগ কাড় ভাবিল—তিণ্ণ পাগল হইয়া গিয়াছে। কোনোদিকে দৃষ্টি নাই। তিণ্ণ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজে চাখিয়া দেখে ভাল হইয়াছে কি না। তাহার উচ্ছিষ্ট বলিয়াও জ্ঞান নাই। উহা শালপাতায় জড়াইয়া পাহাড়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। নিজে ক্ষুধার্ত্ত কিছু খাইল না—ভৃত্যদেরও কিছু দেয় না। তাহারা তিণ্ণর পিতার কাছে বলিতে যায় পাগলামীর কথা।

তিণ্ণ তাহার কাজ করে খুসীমত। শিবকে স্নান করাইবে বলিয়া মুখ ভরিয়া জল নেয় সে, আর তো কোনো পাত্র তার নাই। বনের ফুল মাথার চুলে গুজিয়া সে লইয়া চলে শিবকে অঞ্জলি দিবে বলিয়া—একহাতে রাঁধা মাংস আর হাতে তীর ধনু। হামাগুড়ি দিয়া সে পাহাড়ে উঠিল। সে আবেগ ভরে জুতা সহিতই শিবের মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া

গেল। দেবতার মাথায় পুরাণো পচা ফুলগুলিকে পা দিয়া সরাইয়া দিল। দুই হাতই তার জোড়া ছিল এক হাতে মাংস অপর হাতে অস্ত্র। মুখের জল দিয়া শিবের স্নান করাইল। দেবতার সম্মুখে মাংস রাখিয়া বলে তার নিজের কথায়, তোমার জন্য এই খাদ্য আনিয়াছি খাও তুমি। ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিল দেবতা খাইল না। সে মনে ভাবে এখন বন্য পশু সকল আসিবে। দেবতাকে একা কেমন করিয়া ফেলিয়া যাইব? সারা রাত সে জাগিয়া পাহারা দেয়। ভোরের পাখী ডাকিয়া উঠিল। তিন্ন মন্দির হইতে বাহির হইয়া টাটকা মাংস আনিবার খোঁজে চলিল।

প্রতিদিনকার পূজারী প্রাতঃকালে আসিলে সে দেখে—মন্দিরে জুতার দাগ কুকুরের পায়ের দাগ চারিদিকে হাড় মাংস ছড়ানো। ব্রাহ্মণের দুঃখের সীমা নাই। কোন্ নির্বোধ শিকারী মন্দির অপবিত্র করিয়াছে। ব্রাহ্মণ যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া কোনোমতে পূজা শেষ করে। সে যথাসময়ে কার্য্যান্তে চলিয়া যায়।

তিন্ন সেদিনও পূর্ব্বদিনের মত পূজা দেয়। সে পরমাগ্রহে বলে—আজ টাটকা স্বাদু মাংস আমি চাখিয়া দেখিয়াছি উহাতে মধুও দিয়াছি, খাও ঠাকুর। একে একে পাঁচ দিন প্রত্যহ এক আবেশে পূজা আর রাত্রি জাগরণ করিয়া মন্দিরে পাহারা দেয় তিন্ন। তাহার নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছে সে।

ব্রাহ্মণ পূজা করিতে আসিয়া প্রত্যহ এই ভ্রষ্টাচার দেখিয়া দুঃখ করে। দেবতার কাছে সে প্রার্থনা করে এই অনাচার বন্ধ কর। রাত্রিতে মহাদেব স্বপ্ন দেখান। তিনি বলেন—বন্ধু, তুমি আমার এই শিকারী ভক্তকে জান না। সে শুধু নিষ্ঠুর পশু হত্যাকারী নয়। সে প্রেমময়। সে আমাকে ছাড়া কিছু জানে না। তাহার স্পর্শ যদিও জুতার স্পর্শ তবু আলিঙ্গনের মত সুখদায়ক তাহার কুলকুচাজলও

গঙ্গাজল হইতে পবিত্র বলিয়া মনে হয়। অবোধ সেই ভক্ত নিজের মাথার ফুল দিয়া যখন আমাকে পূজা করে, উহা দেবতার নির্ম্মাল্য হইতেও উৎকৃষ্ট মনে করি। উহার উচ্ছিষ্ট নিবেদন করিয়া সে প্রাকৃত ভাষায় প্রীতিজনক কথা বলে তা মুনি ঋষির বেদ পাঠ হইতেও সুখদায়ক বোধ হয়। তাহার ভক্তির পরিচয় জানিতে হইলে আগামীকাল আমার পিছনে আসিয়া লুকাইয়া দেখিও। আদেশ পাইয়া ব্রাহ্মণের রাত্রিতে ঘুম নাই।

প্রাতে যথাসময়ে ব্রাহ্মণ যথারীতি পূজা করিয়া শিবের পিছনে লুকাইয়া রহিলেন। আজ তিন্নর পূজার ষষ্ঠ দিবস। সে আসিয়াছে তাহার উপহার লইয়া। পথে আসিতে সে কতগুলি অলক্ষণ দেখিয়াছে। মন অত্যন্ত উত্তপ্ত। মন্দিরে আসিয়া দেখে সত্যই দেবতার অঙ্গে রক্তের ধারা। কোথা হইতে রক্তধারা? সে দেখে দেবতার চক্ষু হইতে রক্তধারা বহিতেছে তিন্ন মুছাইয়া দেয়। কোথায় রক্ততো বন্ধ হয় না। একি হইল! সে বড়ই বিপন্ন হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যায় দেখিতে, কে দেবতাকে আঘাত করিয়াছে যদি তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। কাহাকেও না পাইয়া সে ফিরিয়া আসে। বুনো জাতি গাছ গাছরা ঔষধ জানে। অনেকগুলি সংগ্রহ করিল প্রয়োগ করিল। রক্ত বন্ধ হয়-না। কি করিবে সে ভাবিয়া পায় না হঠাৎ তাহার মনে হইল টাট্‌কা মাংস দিয়াই এই রক্তধারা বন্ধ করা যায়। বাণের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়া তিন্ন তাহার নিজের দক্ষিণ চক্ষুটি তুলিয়া ফেলিল এক নিশ্বাসে তারপর সেই চক্ষুটি শিবের চক্ষুর উপর লাগাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। কি আশ্চর্য্য সঙ্গে সঙ্গে রক্তবন্ধ হইয়া গেল। তখন তাহার কি আনন্দ সে উন্মাদের মত নাচিতে লাগিল। নিজের চক্ষুর ব্যথা তাহাকে একটুও কাতর করে নাই। সে দেখে তখন আবার দেবতার বাম চক্ষু দিয়া রক্ত গড়াইতে শুরু করিয়াছে। তিন্ন বলে কোনো চিন্তার কারণ নাই, আমার বামচক্ষু দিব। এ বলিয়া একহাতে দেবতার চক্ষু ধরিয়া অপর হস্তে নিজের বামচক্ষু তুলিবার

উপক্রম করিল। তখন ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—অপেক্ষা কর, আমার চক্ষুর রক্তপড়া বন্ধ হইয়াছে। কল্পপ তুমি ত্যাগ ও প্রেমের মূর্ত্তি চিরদিন আমার সমীপে প্রিয়ভক্তরূপে অবস্থান কর। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন—সরল প্রাণে ভক্তির কি প্রকার প্রভাব।

বিঠুর দর্শন

…পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিট্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ॥

কথাগুলি মহাপ্রভুর চরণানুসরণে অনেক দূর দূরান্তে লইয়া যায়। ভাবিতেছিলাম সেই পাণ্ডুপুর কি আমার দর্শন হইবে? কে আমাকে সেই আনন্দময় দেশের কথা বুঝাইয় বলিবে? সেখানে কি মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন দেখিতে পাইব?

দক্ষিণদেশে প্রসিদ্ধ যে ছয়টি তীর্থ ভুক্তি মুক্তিদানে কৃতার্থ করে, তন্মধ্যে পাণ্ডুপুর অন্যতম। ইহাকে ভূবৈকুণ্ঠও বলা হয়।

করবীরবিরুপাক্ষং শ্রীশৈলং পাণ্ডুরঙ্গকম্।
শ্রীরঙ্গং সেতুবন্ধং চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি ষট্॥

করবীর তীর্থ কোলাপুরস্থিত মহালক্ষ্মীর স্থান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কোলাতীর্থে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া ঐ পথেই পাণ্ডুপুর বা পণ্ডরপুর গমন করেন।

পৌরাণিক ভাগবত ভক্তগণের মধ্যে পুণ্ডরীকের নাম আছে। এই পুণ্ডরীকের পরিচয় পাণ্ডুরঙ্গ দর্শনে।

পুণ্ডরীক ছিল আরো দশজনের মতই সংসারাসক্ত এক গৃহস্থ। স্ত্রীর প্রতি আসক্তির বশে যথাসময়ে পিতামাতার সেবাতেও তাহার মোটে ছিল না মন। পিতামাতা বার্দ্ধক্যে নিজের সন্তানের ব্যবহারে দিনের পর দিন মনস্তাপে জ্বলিয়া মরিতেছিলেন। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। অবহেলিত হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করা অপেক্ষা সেখান হইতে সরিয়া যাওয়াই ভাল এই বিবেচনায় একদিন বৃদ্ধ পিতা সন্তান পুণ্ডরীককে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপ, আমি কাশীধাম যাইব আমার ও তোমার মাতার যাওয়ার জন্য একটু ব্যবস্থা করিয়া দাও। পুত্র কিন্তু শুনিয়াও শুনিল না, কোনো ব্যবস্থা না করিয়া পত্নীর সন্তোষের জন্যই অর্থব্যয়াদি করিতে লাগিল। যাওয়ার ব্যবস্থা দূরে, পিতামাতার প্রতি কটুক্তি করিয়া তাহাদিগকে গৃহ ছাড়া করিবার জন্য পুণ্ডরীক চেষ্টা করিতে থাকে, উপেক্ষিত লাঞ্ছিত জীবন দুর্বিসহ। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের দৌরাত্ম্যে গৃহ হইতে কাশী যাত্রা করিলেন। পদব্রজে যাইতে অনেকদিন লাগিবে, তার উপর দুর্গম পথ, প্রাণ সংশয়, তবু চলিলেন। পুণ্ডরীকের সঙ্গ হইতে মৃত্যুও কাম্য।

কিছুদিন যাইতে না যাইতে পুণ্ডরীকেরও ইচ্ছা হইল কাশী যাইবে। দুইটি ভাল ঘোড়া যোগাড় করা হইল। পতি পত্নী দুজনে দুই ঘোড়ায় চড়িয়া তীর্থযাত্রা করিল। ইহাদের পথ অতিক্রম করিতে খুব অধিক সময় লাগিত না। পথে কিন্তু একটি বাধা পড়িল। পথ ভুল হওয়াতে তাহারা দুর্গম বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। জনমানবের কোনো চিহ্ন নাই। এরূপ অবস্থায় পুণ্ডরীক পত্নীকে লইয়া বড়ই বিপন্ন বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। দৈবাৎ একটি আশ্রমের সন্ধান পাওয়া গেল। এই আশ্রমে আছেন কুকূটমুনি। পথভ্রান্ত এই দম্পতিকে মুনিপ্রবর পরমাদরে আশ্রমে স্থান দিলেন এবং বলিলেন—"আপনারা যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকিতে পারিবেন।"

পুণ্ডরীক জিজ্ঞাসা করে, "মুনিবর, আমরা কাশী যাইব। পথ

ভুলিয়া এই বনের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদিগকে সেই পথ বলিয়া দিন।" তিনি বলেন—"কাশী যাইবার পথ তো আমার জানা নাই। কোন্ দিকে কাশী তাহাও আমি বলিতে পারিব না। আমি কখনও তো কাশী যাই নাই।" পুণ্ডরীক মনে ভাবে, এ আবার কেমন সাধু, কাশীর পথ জানে না। সাধু কিন্তু শান্তভাবে বলেন, "সত্যই কাশী যাওয়ার প্রয়োজন আমার হয় নাই। এই আশ্রমেই আমার সকল তীর্থ।"

পথশ্রান্ত পুণ্ডরীক ও তাহার পত্নী। সন্ধ্যার পরই তাহারা নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু রাত্রি গভীর, এমন সময় পুণ্ডরীক জাগিয়া উঠিল। সে যেন শুনিতেছিল রমণীর কণ্ঠস্বর। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সে কুটিরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাহা দেখিল তাহাতে সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া রহিল। সে দেখিল তিনজন মহিলা আশ্রমের আঙ্গিনায় জল ছড়া দিতেছেন। ইহারা কে? আশ্রমের আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়া গেলে তাঁহাদের রূপ যেন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইহারা যে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মূর্ত্তিমতী, ইহা বুঝিতে পুণ্ডরীকের আর কষ্ট হইল না। এই তীর্থগণ প্রতিদিন প্রত্যুষে কুকূটমুনির আশ্রমদ্বার পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া যান। একথা পুণ্ডরীক বুঝিল আর নিজের পাপের কথা ভাবিয়া সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। সে অনুভব করে, "গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর দর্শনে আমার সকল পাপ দূর হইয়া গিয়াছে। এই আশ্রম প্রভাবে আমি পাপমুক্ত হইয়াছি।" সে অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"হে তীর্থগণ, আপনারা বলুন, কোন ধর্ম আচরণের ফলে কুকূটমুনি আপনাদের নিত্যসান্নিধ্য লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে।" তাঁহারা বলেন—"এই কথা কেন জিজ্ঞাসা কর। ইনি যে পিতৃমাতৃভক্ত। ইনি তাঁহার জীবনব্যাপী সেবাদ্বারা পিতামাতার সন্তোষ সাধন করিয়াছেন।"

পুণ্ডরীকের চেতনা হইল। হায়, আমি হতভাগ্য তাই পিতামাতা

প্রত্যক্ষ দেবতার সেবা বিমুখ হইয়াছি। আশ্রম হইতে তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া পড়িল কাশীর পথে। বৃদ্ধ পিতামাতাকে পথে পাইয়া পুণ্ডরীক ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁহাদের সমীপে। যত্ন করিয়া ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া পুণ্ডরীক পিতামাতাকে কাশী তীর্থে লইয়া যায় ও তথা হইতে ফিরিয়া বাড়ী আসে। এখন তাহার পিতামাতার সেবা ভিন্ন আর কোনো শ্রেষ্ঠ কার্য নাই। এই সেবায় দেবতার সন্তোষ।

একদিন পুণ্ডরীক পিতার পদসেবা করিতেছে। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুণ্যাশ্রমদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুক্মিণী দেবীর সম্মুখে যেমন কটিতে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়ান, সেই ভঙ্গীতে দুই হাত কটিতে স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক হাতে শঙ্খ অপর হাতে কমল। প্রথমতঃ পুণ্ডরীক পিতৃসেবায় নিবিষ্টতা হেতু লক্ষ্য করিতে পারে নাই ভগবৎসান্নিধ্য। কিন্তু ভগবানের অঙ্গজ্যোতি গন্ধ তাহাকে আকর্ষণ করিল, সে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া দেখিল, তাহারই দ্বারে ভগবান আসিয়াছেন। পুণ্ডরীক পিতৃসেবা সমাপ্ত না করিয়াই বা কেমন করিয়া ভগবানকে স্বাগত জানায়। নিকটস্থ একটি প্রস্তরফলক সম্মুখে পাতিয়া দিল ভগবানের আসন রূপে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই প্রস্তর-ফলকাসনেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেবায় সন্তুষ্ট পিতা নিদ্রিত হইলে পুণ্ডরীক উঠিয়া ভগবানকে স্বাগত জানাইয়া অভিনন্দিত করে। ভগবান তাহার পিতৃসেবার আদর্শে সন্তুষ্ট হইয়া পুণ্ডরীককে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে উৎসাহিত করেন। সে কিন্তু বলে—"আমার আর কোনো প্রার্থনীয় বর নাই, আমি শুধু প্রার্থনা করি, এখানে যেভাবে আসিয়া প্রভু দাঁড়াইলেন, যেন চিরদিন এখানে এইভাবে বিরাজিত থাকেন।" প্রভু বলেন, 'তথাস্তু' আচ্ছা তাই হউক। শ্রীবিষ্ণু, বিঠ্ঠ, বিট্‌ঠল, শ্রীকৃষ্ণ, বিঠোবা, সেই হইতে শ্রীবিগ্রহরূপে এখানে আছেন।

ভীমা নদীর তীরে বিঠোবার মন্দির। রুক্মিণীদেবীর মন্দিরও নিকটেই। ভীমার তীরে গোষ্পদ চিহ্নসহ বিট্‌ঠলের চরণচিহ্ন মন্দিরও

দর্শনীয়। শ্রীরাধা মন্দির প্রভৃতি বহু মন্দির পরিশোভিত পণ্টরপুর মহাতীর্থ। এখানকার ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বাকুরী সম্প্রদায় প্রধান। ইঁহারা ভাগবত ধর্মানুসারে জীবনটিকে সংগঠিত করিয়া ভগবানের ও ভক্তের সেবা করেন। পুণ্ডরীক পরম ভাগবত, বিট্‌ঠল পরম পুরুষোত্তম। উভয়ের সেবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রের ও অনান্য কানাড়া প্রদেশের ভক্তসাধু ও তীর্থযাত্রীগণ চিরকালই এই স্থানে সমবেত হইয়াছেন। আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে পণ্টরপুরেরর উৎসব প্রসিদ্ধ। এই সময় প্রতি একাদশী তিথিতে সাধু ভক্তমণ্ডলীর শোভাযাত্রা কীর্ত্তন প্রভৃতি হয়। পুণ্ডরীকপ্রিয় বিট্‌ঠলের ভক্ত কার্করীগণের বিশেষ এক নিয়ম আছে। আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে ইহারা পণ্টরপুর যাত্রা করিবেন অবশ্যই। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান হইতে পাল্কী করিয়া মহাত্মা সাধু-গণের পাদুকা প্রভৃতি লইয়া প্রতি একাদশীতে এঁখানে ভক্তগণ আগমন করেন। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর দলের মত বার্করীদের কোনো বিশিষ্ট পোষাক পরিচ্ছদের বালাই নাই। ইঁহারা সাধারণ জামা ও ধুতি পরিধান করিয়া থাকেন তবে শোভাযাত্রার সময় তাহাদের হাতে রক্তাভপীতবর্ণের যে ছোট পতাকা থাকে উহাতে শোভাযাত্রার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই। ভক্তদের কাহারও হাতে আবার ক্ষুদ্র করতালও থাকে। কীর্ত্তনের সহিত উহার ঝঙ্কার একটি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। নিরামিষভোজী তাহারা তুলসী কাষ্ঠের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। সর্ববর্ণ হইতেই এই ভক্ত সম্প্রদায় পাল্কীর মিছিলে যোগদান করেন। তখন ইহাদের মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি করা হয় না। বার্করীর নিয়ম সেবা, আষাঢ় ও কার্ত্তিকে প্রতিবর্ষে একাদশী শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হইবে। এইভাবে ভাগবত ধর্ম তাহারা নিত্যজীবনের সঙ্গে অনুসৃত করিয়া লইয়াছেন। আর পণ্টরপুরে আসিয়া চন্দ্রভাগায়

(ভীমায়) স্নান, পুণ্ডরীকের দর্শন, সর্বোপরি বিট্ঠল দর্শন এই নিয়ম মানিয়াই ভক্ত বার্করী হয়।

আষাঢ়ী কার্ত্তিকী ভক্তজন যেতী
চন্দ্রভাগে মাজী স্নান জে করিতী
দর্শন হেলা মাত্রে তয়া হোয় মুক্তি
কেশবাসী নামদেব ভাবে ওবালীতী।

বিট্ঠলের রূপ বর্ণনায় নামদেব, তুকারাম, সাঁওতামালী, চোখামেলা, পুণ্ডরীক প্রভৃতি কবিগণ তাহাদের অন্তরের প্রেম অভিব্যক্ত করিয়াছেন কত ভঙ্গী করিয়া। পাল্কী যাত্রার সঙ্গে বহু সংখ্যক ভক্ত পদব্রজে বহুদূর গ্রামান্তর হইতে মেলার সময় পণ্টরপুরে উপস্থিত হন। কোনো কোনো স্থান হইতে একমাস আগেই দল লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। আলন্দী হইতে জ্ঞানেশ্বরের পাদুকা, দেহু হইতে সন্ত তুকারামের পাদুকা, নিবৃত্তিনাথের পাদুকা ত্র্যম্বকেশর হইতে, এইভাবে পৈঠান হইতে একনাথের পাদুকাও পাল্কীতে বহন করিয়া পণ্টরপুরে আনয়ন করা হয়। তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী বার্করী ভক্ত সম্মেলনে এক বিরাট জনতা ও উৎসব হয়। নামদেব প্রার্থনা করিয়াছেন—

পণ্ডরীচা বাস চন্দ্রভাগে স্নান
আণিক দর্শন বিঠোবাচে।
হেচি মজ ঘড়ো জন্মোজন্মান্তরী
মাগণে শ্রীহরি নাহি দুজে॥

ওহে শ্রীহরি, আমি আর দ্বিতীয় কিছু প্রার্থনা করি না। 'আমার জন্মজন্মান্তরে চিরদিনই যেন পণ্টরপুরে জন্ম হয়, চন্দ্রভাগায় স্নান আর বিঠোবার দর্শন হয়।

তুকারাম বিঠোবার রূপ প্রকাশ করিয়া বলেন—

সুন্দর তে ধ্যান উভে বিটেবরী,
কর কটাবরী ঠেবোনিয়া।
তুলসীহার গলা কাসে পিতাম্বর,
আবড়ে নিরন্তর ধ্যান হেচি।
মকর কুণ্ডলে তলপতি শ্রবণী,
কণ্ঠি কৌস্তুভমণি বিরাজমান।
তুকা মহণে মাঝে হেচি সর্বসুখ,
পাহীন শ্রীমুখ আবড়ীনে।

অতি সুন্দর রূপ আসনের উপর দণ্ডায়মান তাহার কটিতে করদ্বয় স্থাপিত গলায় তুলসীর মালা পীতাম্বর, পরিধান, সর্বদা দর্শনীয় রূপ শোভা, মকরকুণ্ডল কর্ণে দোদুল্যমান, কণ্ঠে কৌস্তুভমণির শোভা, তুকা বলেন—শ্রীমুখ দর্শনে আমি পূর্ণানন্দ লাভ করি।

বিঠোবা পাণ্ডুরঙ্গের মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণেও আছে। শ্রীভগবান বিষ্ণু একদা বৈকুণ্ঠের উপবনে বেড়াইতেছেন। অদূরে দেখা গেল এক রমণী অগ্রসর হইতেছে। ইনি কে? সমীপস্থ হইলে বুঝা গেল, তিনি ইন্দ্রাণী শচী। তিনি এখানে কেন, ভগবান প্রশ্ন করিলেন। উত্তর হইল বিষ্ণুর রূপে মুগ্ধ শচী তাঁহার সঙ্গলালসান্বিতা। বিষ্ণু বলেন—তাহা হয় না বৈকুণ্ঠে। বরং শ্রীকৃষ্ণ রূপে যখন আমি আবির্ভূত হইব তখন শচী রাধারূপ ধারণ করিবে এবং আমার সহিত মিলিত হইবে। দ্বাপরের শেষ রাধার স্বরূপে মিলিত হইয়া শচীদেবীর পূর্বের আশা পূর্ণ হইল।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের সহিত থাকিয়াও বৃন্দাবন কুঞ্জবন ভুলিতে পারেন নাই। গোপনে রাধার সঙ্গে মিলনও যে না হয় তাহা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধার সহিত যে খেলা করেছেন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন রুক্মিণীদেবী, কিন্তু

কখনও উহা দেখার সৌভাগ্য হয় নাই, হইতেও পারেনা। রঙ্গীয়া শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গ কে বুঝিবে ? তাঁহার ইচ্ছায় রুক্মিণী অনুভব করিলেন কৃষ্ণের মন শ্রীরাধার প্রতিই আসক্ত। রুক্মিণীদেবী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি রাগ করিয়া দিন্দিরাবনে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন রুক্মিণীর দ্বারকা হইতে অন্যত্র যাওরার কারণ। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই দিন্দিরাবনে আসিয়া রুক্মিণীকে পাইলেন—দেখা গেল গভীর বনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির - সঙ্কল্প লইয়া তিনি তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু নিমীলিত, তিনি প্রিয় পতির ধ্যানে মগ্ন। কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার সমীপে প্রণয় যাচ্ঞা করিয়াও তিরস্কৃত হইলেন। তখন আর উপায় না দেখিয়া তিনিও নিকটেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভঙ্গী এই—তিনি কটিতে হস্ত স্থাপন করিয়া শ্রীরুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন।

প্রবাদ, তিনি এই দণ্ডায়মান অবস্থায় অষ্টাবিংশতি যুগ (চতুর্যুগ) আছেন আর ইঁহারই নাম বিট্‌ঠল পাণ্ডুরঙ্গ। পুণ্ডরীক তাঁহার মহিমা প্রচার করিলেন। তাঁহাকে আসন দিলেন। মন্দির গড়িয়া উঠিল। তীর্থযাত্রী আসিল, পণ্টরপুর মুক্তিক্ষেত্র হইল। মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ এই তীর্থসম্বন্ধে কালে কালে কত কথা কত ইতিবৃত্ত যে রচিত হইয়াছে তাহা এক বিরাট সাহিত্য। বিঠোবার মহিমা বহু কবি সাধক মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছে। সুদীর্ঘকালের এই মহিমান্বিত স্থানটি কোটি কোটি মানবের মনে পবিত্রতার প্রসার করিয়া আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

সামাজিক রাষ্ট্রিয় বিপর্যয়ে শ্রীমন্দির ত্যাগ করিয়া বিগ্রহ বিঠোবা বেশ কয়েকবার অন্যত্র গিয়াছেন। কখনো কোনো ভক্তের আগ্রহে আর কখনো দুর্যোগের প্রকোপে প্রভু অন্যত্র গেলেও আবার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মন্দির জুড়িয়া ভক্তের আনন্দদাতারূপে বিরাজমান।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজের সমসাময়িক ভক্ত কবি নামদেব বিঠোবাকে কানাড়া প্রদেশের পরমাদরণীয় পরমসুন্দর দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

"নামবরবে রূপবরবে দর্শনবরবে কানডিয়া"। কানডিয়া বিঠোবার নামও মধুর, রূপও মধুর, আর দর্শনও মধুর। বিঠোবার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতদ্বৈধ আছে। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপি অনুসারে দেখা যায় হয়শালের রাজা সোমেশ্বর বিঠোবার সেবাপূজার সৌকার্যার্থে মহীশূরের অন্তর্গত হিরিয়া গরাঞ্জ নামে একটি গ্রাম দান করেন। এই রাজ পরিবারে বিঠোবা প্রীতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার কারণ কাহারও মতানুসারে এই হয়শাল পরিবারের কোনো নৃপতিই বিঠোবাকে স্থাপিত করেন। আচার্য রামানুজের প্রভাবে হয়শাল বংশের বিট্টিদেব বিষ্ণুবর্দ্ধন বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই বিট্ঠলকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন এবং তাহারই নামানুসারে বিটঠল নাম হয দেবতারও।

অনেকের মতে বিজ্যানগরের রাজা কৃষ্ণদেব ১৫১০—১৫২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পণ্টরপুরের মন্দির হইতে বিঠোবাকে লইয়া পৃথক্ মন্দিরে স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা ভাগবত ব্যাখ্যাতা একনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভানুদাস ছিলেন একান্ত ভক্ত। কথিত আছে বৃদ্ধ ভানুদাস গর্ভ মন্দিরে বিগ্রহ বিঠোবাকে না দেখিয়া তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হন। ভজন কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি বিজয়নগরে আসিয়া বিঠোবার সন্ধান লাভ করেন। কৃষ্ণরায়দেব বিশাল মন্দিরে বিঠোবাকে রাখিয়াছেন। কত মণিমুক্তার অলঙ্কার দিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াছেন। মন্দিরের রক্ষিগণ সর্বদা পাহারা দিতেছে। অধিক রাত্রিতে আসিয়া পৌছিলেন ভানুদাস সেই মন্দিরের পাশে। ভানুদাস খুব কাছে আসিয়া দেখিলেন—প্রহরীরা গভীর নিদ্রামগ্ন অথচ দ্বার খোলাই রহিয়াছে। ভানু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহের পদতলে লুণ্ঠিত, তাহার আবেগপূর্ণ ভাষায় দেবতাকে অনুরোধ—"ফিরিয়া চল

প্রভু পণ্টরপুর। সেখানে অগণিত বার্করী ভক্ত অন্নজল ত্যাগ করিয়া তোমার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চল প্রভু আর দেরী করিও না।" ভানুদাসের কাতর প্রার্থনায় প্রভুর করুণার উদ্রেক হইল। কিন্তু কৃষ্ণদেবও তো পরম ভক্ত, তাহাকে ছাড়িয়া তিনি কি করিয়া ভানুদাসের সঙ্গে যাইবেন? কৃপার পরিচয়, ভগবান তাহার গলার তুলসীর মালাটি খুলিয়া ভানুদাসের গলায় দিলেন এবং তাহাকে আশ্বাস দিলেন, ভানুদাস মন্দিরের বাহিরে আসিলেন তাহার আনন্দ প্রভুর প্রসন্নতায়। তাহার কণ্ঠে যে তুলসীর মালা উহা যে হীরকমণিময় মালা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর তাহার লক্ষ্য হয় নাই।

সকালবেলা মন্দিরে পূজকেরা প্রভুর কণ্ঠ বিলম্বিত মণিহার না দেখিয়া চুরি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। চারিদিকে চোরের সন্ধান চলে বেশীদূর আর যাইতে হইল না। ভানুদাসের কণ্ঠে হারানো হার, অতএব এই ব্যক্তিই চুরি করিয়াছে স্থির হইল। দূর দেশী অপরিচিত ভক্তবেশ এই চোর। রাজার আদেশে দেবতার অলংকার-চোরকে শূলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল। সুতীক্ষ্ণ শূল তাহার উপর ভানুদাসকে তুলিয়া দেওয়া হইবে। ভানুদাস অবস্থা দেখিয় শুনিয়া আর কিছু বলিতে পারে না, ঠাকুরের লীলা মনে করিয়া সে সরলভাবে ভজন কীর্ত্তন করিতে করিতে শূলের নিকটবর্ত্তী হয় তাহার স্পর্শে সেই সুতীক্ষ্ণ লৌহশূলের এ কি বিপর্যয়! আশ্চর্য, শূল আর শূল নয়, পুষ্পিতশাখ বৃক্ষরূপে পরিণত হইল ভক্তের অঙ্গস্পর্শে সেই লৌহদণ্ড। দর্শকবৃন্দ বিস্মিত, ঘাতকবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত। রাজা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, বৃদ্ধ ভক্তের মহিমায় অভিভূত রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করেন।

ভানুদাস তখন তাঁহার বৃত্তান্ত রাজার সমীপে বলেন। এ সবই বিঠোবার খেলা। আমি আসিয়াছি পণ্টরপুরে তাঁহাকে ফিরাইয়া

নিতে। আমাকে চোর সাজাইয়া আবার সাধু করা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছায় সাধু চোর হয়, আবার চোর সাধু হইয়া যায়। ভানুদাসের আকুলতা দর্শন করিয়া রাজার মনও ফিরিয়া গেল। তিনি পরমাদরে শোভাযাত্রা করিয়া ভানুদাসের ভজন সঙ্গীতের সঙ্গে বিঠোবাকে পাল্কীতে বহন করিয়া একাদশী তিথিতে পণ্টরপুরে বিজয় করাইলেন। সেই হইতে একাদশীতে প্রভুর শোভাযাত্রার প্রবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

বিঠুর কথা শুনিয়া আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন সেখানে যাওয়ার পথটি জানিতে পারিলে হয়। একবার গিয়া দেখিয়া আসি। পণ্টরপুর যাইতে হইলে সেণ্ট্রাল অথবা সাদার্ণ রেলপথে যাওয়া যায়। Kurdnwadi অথবা Miraj Junction এ নামিয়া যাওয়ার কোনো অসুবিধা নাই। পুনা, শোলাপুর অথবা সাঁতারা হইতে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, বাসেও যাওয়া যায়। থাকিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু কার্ত্তিক ও আষাঢ় মাসে ভক্ত বার্করীগণের আগমনে স্থান পাওয়ার অসুবিধা হইতেও পারে। হোটেলও আছে। তীর্থযাত্রীর কোনো অসুবিধার কারণ নাই। পুরোহিতের সাহায্যে বেশ ভালভাবেই দর্শন ও তীর্থের সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা যায়।

দেবতাদের যানবাহন

পথে চলিতে যানবাহনের সমস্যা একটা বিভীষিকা। বড় বড় সহরে কখন যে কোনটির ধাক্কা লাগিয়া কাহার কি অবস্থা হয় তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিজ্ঞান শুধু মানুষের কেন সকল প্রকার প্রাণীর গমনাগমন অতি অনায়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। গতি, আরাম এবং সুযোগ কোনটারই আর অপ্রাচুর্য্য নাই। কিছুদিনের মধ্যে মানুষ হয়তো অভাবনীয় গতিই লাভ করিবে অনন্ত আকাশে। গ্রহান্তরে গমনাগমনকে চালু করিবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা স্পুটনিক প্রভৃতির সহায়তায় চলিয়াছে তাহার পরিণতি কোথায় তাহা এ যুগের মানুষ কল্পনা করিতেছে নানারূপ আঙ্কিক সংখ্যার মাধ্যমে। জমি দখলের পূর্ব্বেই ভাগাভাগির প্রশ্নও উঠিতেছে। একদিকে মারণাস্ত্র অ্যাটম বম বহন করিতে করিতে এদিক, সেদিক, পড়িয়া ভয়, অপরদিকে নব নব আবিষ্কারের আনন্দ। বর্ত্তমান সভ্যতার এই বৈজ্ঞানিক অভিযান মানবজাতির কোন্ হিত সাধন করিবে তাহারও চিন্তা আসিয়াছে। দিকে দিকে শান্তির খোঁজ চলিয়াছে। যানবাহনের সুবিধা ও অসুবিধা একালেও যেমন প্রাচীন কালেও তেমনি ছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। যান্ত্রিক যুগে যানবাহন যন্ত্রময়। দেবতার উপাসনা প্রাণের উপাসনা। তাঁহারা প্রাণময়, তাঁহাদের যানবাহনও ছিল প্রাণী।

অপরিমেয় বলবাহন দেবতাদের কথা বলিতে গেলে প্রথমতঃ আমাদের সম্মুখে দুই সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথম সমস্যা পুরাণো দিনের দেবতাদের সঙ্গে অপরিচয়, দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক ভাবাবেশহেতু মনের সন্দেহ। বেদ পুরাণে বহু দেবতার কথা শুনা যায়। স্থানে স্থানে কালে কালে বিপদে দুর্বিপাকে পড়িয়া অনেক দেবতাকে

মানিতেও হয়। উৎসাহের আয়োজনে দেবতাকে নতুনতর করিয়া সাজাইতেও হয়। বৎসরের পর বৎসর শিল্পীর অভিনব চিন্তার প্রকাশ তারতম্যে—দুর্গা, কালী আর সরস্বতীর কত রকমফের রূপই না প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও সার্ব্বজনিক পূজা উপলক্ষে দেবদেবীর সম্মুখে যে সকল অদ্ভুত দৃশ্য ও মূর্ত্তি সজ্জিত করা হয়, তাহাতেও প্রাচীন যুগের অনেক কিছু আমাদের ভুলাইয়া দেয়। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি দুর্গাপূজার চালচিত্রে বহু দেবদেবী অন্ততঃ প্রধান প্রধান অনেকের মূর্ত্তি সবলবাহন অঙ্কিত থাকিত। তাহাতেই হিন্দু ধর্মের বিশেষ কথাগুলি চিত্তে ধারণার বিষয় হইত। এখন সে সব স্মারক ধর্মচিত্র দেখা যায় না। সাজসজ্জা আলোকমালা গান নৃত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু ধর্মভাব উদ্দীপক দৃশ্য পূজার বাড়ীতেও দুর্লভ হইতে চলিয়াছে।

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, প্রচেতা, ঊষা, পুষা প্রভৃতি দেবতা। সবিতার কথা সাবিত্রীমন্ত্র সঙ্গেই আছে। ইন্দ্রাদি দেবতা দশদিক্‌ পালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। আদিত্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহরূপে সংক্ষিপ্তাকারে পূজিত হন মৎস্য কূর্ম বরাহাদি দশাবতাররূপে অল্প পূজা গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট। এমন যে প্রসিদ্ধ বিষ্ণু, তিনিও অল্পে পুষ্প চন্দনে যজ্ঞেশ্বররূপে পূজিত হন। বৈদিক পূজাক্রম খুবই সংক্ষিপ্তরূপে আধুনিক অর্চ্চনায় অর্থাৎ তান্ত্রিক এবং পৌরাণিক অর্চ্চনায় স্থান পায়। কাজেই সেই সকল পুরাণো দিনের পুরাণো দেবতার বলবাহনের কথা সাধারণ জন ভুলিতে বসিয়াছে।

পুরাণে যাহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেই তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর। তাহারাও খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতেছেন বলিব না। আজকাল দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতা এক হইয়া গুরুমূর্ত্তিতে নিজের পূজা বহাল করিতেই বদ্ধ-পরিকর। অবশ্য এই দেবতার প্রসিদ্ধ বাহন প্রচারক শিষ্যগণ।

দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া এই নব অভিযানের ফল কি দাঁড়াইবে তাহা কাল নির্ণয় করিবে।

দেবতারা ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ। তথাপি তাহাদের বাহনের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে যে সকল দেবতার কথা বলিয়াছেন ইহা, যে শুধু কোনো এক ব্যক্তি বিশেষ তাহা নয়। দেবতাগণ লৌকিক অলৌকিক রহস্যতত্ত্ব; সত্যদ্রষ্টা ঋষি মনের প্রেরণাদাতা রূপে আবির্ভূত। তত্ত্ব ও বিগ্রহ সম্পৃটিত এই দেবরহস্য বোধগম্য করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ যে সবিতা দেবতার কথা আমরা গায়ত্রীর মধ্যে শুনিতে পাই সেই সবিতার কথাই যদি চিন্তা করা যায়—কি তাহার রূপ, কি তাহার বেশ, কোথায় তাহার বাস, কে তাহার বাহন এই সকল জিজ্ঞাসার কি উত্তর পাওয়া যাইবে? এইরূপ বহু দেবতার কথাই বলা যায়, যাহারা শুধু একটি বিশিষ্ট ভাবনার মাধ্যমেই ঋষিগণের সমীপে ধরা দিয়াছেন। যাহাদের সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-তর অনেক কথাই পাওয়া কঠিন।

বেদে যাহা অস্ফুট পুরাণে স্থানে স্থানে সেইগুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া বেদার্থকে পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুরাণের মধ্যে প্রসিদ্ধ দেবতাদের বল ও বাহনের কথা পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা হংসবাহন। ব্রহ্মাণীরও বাহন হংস। দেবী সরস্বতীও হংসারূঢ়া। 'হংস' কথাটি শুধু-পক্ষী বিশেষকেই বুঝায় না। ইহার গূঢ়ার্থ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। প্রাণ শক্তিকে সঙ্কেত করিবার জন্যও হংস কথার ব্যবহার রহিয়াছে। মন হংস জীব হংস। হংস ও প্রণব ভিন্ন নয়। এই হংসের দক্ষিণ পক্ষ অকার। বাম পক্ষ উকার। মকার তাহার পুচ্ছ। শরীরটি তত্ত্ব, পদাদি তাহার গুণ সমূহ। দক্ষিণ চক্ষু ধর্ম্ম, বাম চক্ষু অধর্ম্ম। তাহার পদে ভূর্লোক, জানুতে ভুবর্লোক। কটিতে স্বর্লোক, নাভিতে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, তাহার ঊর্দ্ধে কণ্ঠে তপলোক, ও ললাট মধ্যে সত্যলোক অবস্থান

করে। সার ও অসার বস্তু বিচারেও হংসের দক্ষতার প্রসিদ্ধি আছে।

জলদুগ্ধনির্ণয়বিধৌ যস্য বাহোঽপি বিশ্রুতো দক্ষঃ।
সা সদসত্ত্ববিবোধক বাগীশাস্তান্নমাস্থ গতিঃ॥

যে বাগীশ্বরীর বাহনটিও জল ও দুগ্ধ নির্ণয়ে দক্ষতায় প্রসিদ্ধ সেই সং ও অসৎ বিষয়ে জ্ঞানদায়িনী দেবী আমার গতি হউন।

বিষ্ণুর বাহন বৈনতেয় গরুড়। তাহার বেদময় দেহ। তাহার পক্ষের ধ্বনি সামগান। গারুড়োপনিষৎ বলেন—

ওঁ নমো ভগবতে মহাগরুড়ায় বিষ্ণুবাহনায় ত্রৈলোক্য
পরিপূজিতায় বজ্রনখ বজ্রতুণ্ডায় বজ্রপক্ষালংকৃত শরীরায়···
সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুঃ
স্তোম আত্মা।
সাম তে তনূর্বাম দেব্যং বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ, যজ্ঞা-
যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং।
ছন্দাংস্যঙ্গানি ধিষ্ণিয়া শফা যজুংষি নাম ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। ছন্দোময় গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীহরি গজরাজকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিলেন। ত্রৈলোক্য পরিপূজিত বজ্রনখ বজ্রতুণ্ড বজ্র পক্ষ সুপর্ণ গরুড়, সাম যজু ঋগ্‌ বেদময় শির, গায়ত্রী চক্ষু, স্তোম আত্মা সামগান শরীর, বামদেব ও বৃহদ্রথ মন্ত্র দুই পক্ষ, যজ্ঞ পুচ্ছ, ছন্দ অন্যান্য অঙ্গ, শিবের বাহন বৃষ, নাম নন্দী তাহার প্রশংসা অনেক—

কণ্ঠালংকার ঘণ্টা ঘন ঘন রণিতাধ্মাত রোদঃ কটাহঃ
কণ্ঠে কালাধিরোহোচিত ঘন সুভগং ভাবুকং স্নিগ্ধপৃষ্ঠঃ।
সাক্ষাদ্ধর্মো বপুষ্মান্‌ ধবল ককুদনির্ধূত কৈলাসকূটঃ
কূটস্থো বঃ ককুদ্মান্মিবিড়তর তমস্তোম তৃণ্যাং
বিতৃণ্যাৎ॥

কণ্ঠের অলঙ্কার ঘন্টা। ঘন ঘন তাহার ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। নীলকণ্ঠের আসনের যোগ্য তাহার স্নিগ্ধ পৃষ্ঠদেশ। সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি। কৈলাস পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় ধবল কান্তি। সে যে তৃণ ভোজন করে, উহা পুঞ্জীভূত তমোগুণ তৃণরূপে পরিণত।

শিবের বৃষটির সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ পুরাণে আছে উহা উল্লেখ করিবার লোভ ত্যাগ করিলাম না। ত্রিপুরাসুর বধের কথা সুপ্রসিদ্ধ। এই অসুরের বধেই মহাদেব ত্রিপুরারি নাম সার্থক করেন। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "আমার প্রদত্ত ত্রিশূল আর কবচ ত্যাগ করিয়াই শঙ্কর ত্রিপুর দানবকে যুদ্ধে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পরও কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। দানব শূন্যপথে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ করে। শঙ্করও তাহাকে বজ্র মুষ্টি দ্বারা আহত করেন। দানব ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেও পুনরায সে শঙ্করকে আক্রমণ করিয়া তাহার যান সহিত ভূতলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। সেই সময় আমিই বৃষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে আমার শৃঙ্গের উপর রাখিয়া ত্রিশূল এবং কবচ প্রদান করি। শঙ্কর আমার প্রদত্ত শূল ও কবচ সহায়ে ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া সন্তুষ্ট করে। সেই হইতে আমার প্রিয় শঙ্করকে বৃষমূর্ত্তিতে আমি বহন করি। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন শ্বেতকর্ণ বিশিষ্ট ঐরাবত মহাগজ। ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে বর্ণনা আছে—

রুদ্রহস্ততলোৎপন্নং মহাকায়ং মহাগজং।
শ্বেতকর্ণং মহাবীর্য্যং দেবরাজস্য বাহনম্॥

ধর্ম্মরাজ যমের মহিষ বাহন এটা সকলেই জানেন। এই মহিষটির গুণ এই যে সে মনোজব। যখন যেখানে যাইবার মন হইবে তৎক্ষণাৎ সেইখানে উপস্থিত। পথে যাইতে আর কোনো বাধা তার নাই। স্পুটনীকেরও বাধা থকিতে পারে যমের মহিষের কিন্তু কোথাও

বাধা পাইতে হয় না। ভয়ঙ্কর দর্শন এই বিশালকায় মহিষটির নাম পৌণ্ড্রক।

বরুণের বাহন শিশুমার চক্র। রুদ্রের মানস সম্ভূত শ্যামবর্ণ জলধির ন্যায় বিশাল দিব্যগতিসম্পন্ন এই শিশুমার চক্রের বর্ণনা ভাগবতে বিস্তৃত ভাবেই আছে। নক্ষত্র মণ্ডলীর সমষ্টি এই চক্র অনন্ত আকাশে ভ্রমণ করে।

কুবেরের বাহন পর্ব্বতাকার শকট চক্রাক্ষ। ইহা রুদ্রশক্তিযুক্ত এবং অম্বিকার পাদসম্ভূত।

একাদশরুদ্রের নানাপ্রকার বাহন। কখনও গন্ধর্ব, কখনও সর্প, কখনও শ্বেত বৃষ। চন্দ্রের বাহন হংসবাহিত রথ।

আদিত্যগণের অশ্বযুক্তরথ, বসুগণের হস্তী, যক্ষগণের মনুষ্য, কিন্নরগণের সর্প, অশ্বিনীকুমারের অশ্ব, মরুৎগণের শারঙ্গ বাহন।

কার্ত্তিকেয়ের বাহন বিচিত্রবর্ণ ময়ূর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। তাঁহার ধ্যান—

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং, ময়ুরোপরিসংস্থিতং
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্

বাহন ময়ূরটি যে দেবরাজ ইন্দ্রই সে কথাও জানিতে পারি রামায়ণ হইতে যথা—

ইন্দ্রোময়ূরঃ সবৃংত্তো ধর্ম্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ॥

বৃহস্পতির ভ্রাতা সম্বর্ত্ত নামক ব্রহ্মর্ষি মরুত্ত রাজাকে যজ্ঞ করাইতে ছিলেন। সেখানে সব দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পকরথা-রোহণে রাবণ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবতারা সব ভয়ে রূপান্তর গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র তখন বিচিত্রপক্ষ ময়ুর হইলেন, যম হইলেন কাক, কুবের হইলেন কৃকলাস এবং বরুণ হইলেন হংস।

ইন্দ্রের যেমন সহস্র চক্ষু ময়ূরের পুচ্ছেও সেই সহস্র চক্ষু অঙ্কিত রহিল।

গণেশের একটি নাম মূষিকাঙ্ক। মূষিক তাঁহার বাহন। তাই তাহার আরো এক নাম আখুগঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথায় দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণই গণেশ মূর্ত্তি ধারণ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে বলিতেছেন—ওগো বিষ্ণুমায়া, তোমাকে ছাড়া বিষ্ণু-ভক্তি হইবার নয়। তুমিই যে সকল পূজার ফলদাত্রী। তোমার পুত্র-রূপে কল্পে কল্পে কৃষ্ণ আগমন করেন। একপঞ্চাশ সংখ্যক গণেশ তাহাদের শক্তিও একপঞ্চাশ সংখ্যায় আছেন।

অগ্নি দেবতাদের মুখ বা প্রধান। এই অগ্নির মুখেই সকল দেবতার আহার। তাহার অনেক রূপ। গোভিল সূত্রানুসারে প্রসিদ্ধ সংস্কারাদি কর্ম্মে তাহার অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নাম করা হইয়াছে। অগ্নির ধ্যান কিন্তু এক প্রকারই প্রসিদ্ধ।

পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থ সাক্ষ সূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥

আদিত্যপুরাণোক্ত এইরূপ চিন্তার মধ্যে দেখা যায় অগ্নিদেব ছাগের উপর আসীন। অবশ্য এই ছাগটি শ্বেতবর্ণ।

গজহুতু রজস্বলো মরুৎ পবশ্চ বল্কবান্।
কুরঙ্গমো হয়োবৃষো দিগীশবাহনান্যমী॥

দশদিক্ পালের বাহন সম্বন্ধে 'লোকপালবাহন শস্ত্র রত্নাবলী'তে উক্ত শ্লোকটি দেখা যায়। পূর্ব্বদিকের পতি ইন্দ্র তাঁহার ঐরাবতহস্তীর জন্য প্রসিদ্ধি। হাতিটি শ্বেতবর্ণ। বিশাল দন্ত, বিশাল আকৃতি। সমুদ্রমন্থন সময়ে এই জীবটি অন্যান্য বহুমূল্য বস্তুর সহিত সমুদ্র হইতে উত্থিত। তাহার চারিটি দন্ত।

তত ঐরাবতোনাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ।
দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রের্হরন্ ভগবতো মহিম্॥

ভাঃ ৮।৮।৪

ইন্দ্রের ধ্যানেও এই হস্তীবাহনের কথা স্পষ্ট ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্দন্তগজারূঢ়ো বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ।
শচীপতিশ্চ ধ্যাতব্যো নানাভূষণভূষিতঃ

পূর্ব্বদিকপতিরূপে অবস্থিত দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শ্বেতহস্তীর উপর সমাসীন অগ্নিকোণে অগ্নি দেবতাও শ্বেত মেষের পীঠে অবস্থিত। যম তো মহিষের পৃষ্ঠে আছেনই। নৈঋতকোণে নিঋতের বাহন সিংহ। পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণের বাহন ঝষ বা মৎস্য। বায়ু দেবতার বাহন হরিণ। হরিণ অত্যন্ত দ্রুতগতি, গন্ধবহও বটে। কুবের তাহার ঐশ্বর্য লইয়া অশ্বকেই বাহন করিয়াছেন। ঈশান কোণে ঈশান শিব বৃষবাহন। ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিকে হংসারূঢ় আর অনন্তদেব অধঃলোকে গরুড় বাহন।

গঙ্গা যে মকরবাহিনী ইহাতো প্রসিদ্ধই আছে। ধ্যায়েন্মকর পৃষ্ঠস্থাং শ্বেতালঙ্কার ভূষিতাং। তাহা ছাড়া যমুনা দেবী কূর্ম্ম বাহিনী। যমুনায় কূর্ম্মের প্রচুর প্রাদুর্ভাবই ইহার অন্যতম কারণ সূচনা করে কিনা বলিতে পারি না।

দেবীর পূজা অবসরে বাহনের কথা স্মরণীয়। ব্রহ্মাণীরূপে জগদ্ধাত্রী হংসবাহিনী। মহিশ্বরীরূপে সেই দেবীই বৃষারূঢ়া, কুমারী রূপে তিনি ময়ুরবাহিনী, বৈষ্ণবীরূপে গরুড়াসনা। ইন্দ্রাণীরূপে দেবী গজারূঢ়া। মহিষাসুর মর্দ্দিনীর আসন বা বাহন সিংহ তাহাতো দেখাই যায় প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময়। এই সিংহ বজ্রনখ এবং দংষ্ট্রায়ুধ মেরুশৃঙ্গ প্রতিকাশ।

সন্ধিপূজায় যাহারা দেবীকে চামুণ্ডারূপে ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করেন,

তাহারা দেবীকে লোলজিহ্বা ও কবন্ধবাহনস্থারূপে ধ্যান করিতে অভ্যস্ত। ইহাকে কালী বলিয়াই জানিবে।

লোল জিহ্বা নিম্নরক্ত নয়নারাব ভীষণা
কবন্ধ বাহনাসীনা বিস্তার শ্রবণাননা
এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে॥

নবগ্রহ সম্বন্ধে অনেকেই জানিতে উৎসুক। ইহারা মানুষের ভাগ্যাদি নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করেন বলিয়া চিরদিনই পূজিত হইয়া থাকেন। গ্রহযাগ একটা বিরাট ব্যাপার। যজ্ঞের সময়ে গ্রহগণের মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। বল বাহন, দৃষ্টি, স্থান, অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা, মন্ত্র জপের প্রণালী ও হোমের দ্রব্যাদির সম্যক্ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। নবগ্রহ বর্ণনায় সূর্য্যদেবের ধ্যানে দেখা যায়।

ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপ্যং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং
শিবাধি দৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতং

সূর্য্যদেবের তুই হাত তুটি পদ্ম ধারণ করেন। তাহার রথে সাতটি অশ্ব। ইহারা কখনও বিশ্রাম লইতে জানেনা। তাহারা সীমাহীন আকাশে চিরকাল ছুটিয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে পরিচালনা করেন অরুণ সারথি। ইহার আবার উরু নাই।

চন্দ্র কিন্তু শ্বেত পদ্মাসন হইয়াও দশঘোড়ার রথেই ভ্রমণ করেন। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।" মঙ্গলের বাহন মেষ। "আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।" বুধের বাহন সিংহ। "সূর্য্যাস্তং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।" বৃহস্পতি দেবগুরু তাহার আসন পদ্ম, বাহন ঘোটক। দৈত্যগুরু শুক্র পদ্মাসন, হস্তী বাহন। গ্রহরাজ শনি কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, গৃধ্র তাঁহার বাহন। গৃধ্র দূরদর্শী পক্ষী। ইহার দৃষ্টি অব্যর্থ। শাকুন শাস্ত্রে আছে,

আসন্ন-মৃত্যোর্নিয়তং চরন্তি গৃধ্রাদয়ো মূর্ধ্নি গৃহোর্দ্ধভাগে।” মাথায় উপরে াহার গৃধ্র ভ্রমণ করে তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। এই মৃত্যুর প্রতীক গৃধ্রকে শনি বাহন করিয়াছেন। রাহু সিংহাসনে উপবিষ্ট, াহন সিংহ। কেতুও কিন্তু শনির মতই গৃধ্রগত।

জগদ্ধাত্রী মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালঙ্কার ভূষিতা,

“কাত্যায়ণী তন্ত্র”

সিংহস্কন্ধাধি সংরূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং।

জগদ্ধাত্রীর আসন বাহন সিংহ। গণ দেবতারা স্ব স্ব বাহনে লবদ্ধ হইয়া চলেন। গণ দেবতা যথা—

আদিত্যা স্তুষিতা বিশ্ব সাধ্যা ভাস্বর মারুতাঃ।
মহারাজিক রুদ্রাশ্চ বসবো গণদেবতাঃ॥

(১) আদিত্যা দ্বাদশ প্রোক্তা (১২)
(২) স্তুষিতাস্ত্রিংশদেব হি (৩০)
(৩) বিশ্বেদেবা দশ প্রোক্তাঃ (১০)
(৪) সাধ্যা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ (১২)
(৫) আভাস্বরা শ্চতুঃ ষষ্টি. (৬৪)
(৬) বাতাঃ পঞ্চাশদূনকাঃ (৪৯)
(৭) মহারাজিক নামানো দ্বেশতে বিংশতিস্তথা (২২০)
(৮) রুদ্রা একাদশ প্রোক্তা (১১)
(৯) বসবো হ অষ্টো সমীরিতাঃ (৮)

মনসাদেবীর ধ্যান করিবার সময় কিন্তু হংসারূঢ়াই চিন্তা করিতে হইবে।

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়া মুদারামরুণিত বসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥

শীতলাদেবীর বাহন খর বা গর্দ্দভ। দেবীর ধ্যান—

সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তুয়মানাং মুদা
বামে কুম্ভধরাং সরোজবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা।
দিগ্ বাসা মুরুহাস সুন্দরমুখীং সম্মার্জনীং দক্ষিণে
পাণৌ তাং দধতীং ভয়ার্ত্তি শমনীং সংসারবিদ্রাবিনীম

দক্ষিণ কালিকার ধ্যানে কিন্তু দুটি বাহনের উল্লেখ পাওয়া যায়। শব ও শিবা দুইএর উল্লেখে এই বাহনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে।

মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিত বাণযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীম্।
বামাধোধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে,
দানাভীতি বিমুক্ত কেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম॥

হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পদ্মের প্রতি আকর্ষণ। এই পদ্ম দেবতার আসনরূপে বহুবার নানাপ্রসঙ্গে প্রশংসিত হইয়াছে। শোভা, সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভোগ বিলাস বিচিত্র ভাবের সমাবেশ এই কমল-ভাবনার সহিত বিজড়িত আছে। কখনও শুভ্র কখনও রক্ত, কখনও নীল, কখনও অষ্টদল, কখনও শতদল, আবার কখনও সহস্র দল, নানাভাবে পদ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। শিব অব্জবাহন, ব্রহ্মা কমলাসন, নারায়ণ সরসিজাসন, লক্ষ্মীপদ্মালয়া, সরস্বতী শ্বেত শতদলবাসিনী, সূর্য্য রক্তাম্বুজাসন ও পদ্মদ্বয় অভয় বর-প্রদ, ষষ্ঠীমাতা অম্বুজস্থা, কুবের নিধিপদ্মাধিপ, মঙ্গলচণ্ডী রক্তপদ্মাসনা, অন্যান্য বহু দেবতারই কোনো না কোনো দিক্ দিয়া কমলের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। শ্রীরাম অম্লানমুখপঙ্কজ, সীতা

নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়না, শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লেন্দীবরকান্তি, শ্রীরাধা অমল-কমলকান্তি, গোপাল অম্ভোজলোচন।

কালিকাপুরাণে দেখা যায়, দেবীর বাহন হইয়াছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনজনেই। মহাদেব হইয়াছেন শুভ্রাকৃতি শব; ব্রহ্মা হইয়াছেন রক্ত পদ্ম, আর হরি হইয়াছেন হরি বা সিংহ। তাঁহাদের আপন আপন মূর্ত্তিতে বাহন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়াই তাহারা ঐ নকল আকৃতি ধারণ করিয়াছেন। দেবীর যখন যে মূর্ত্তিতে প্রীতি হয়, সেই মূর্ত্তিকেই বাহনরূপে গ্রহণ করেন। অষ্টবসু গজারূঢ়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বারূঢ়।

বিষ্ণু ব্রহ্মশিবৈর্দ্দেবৈ র্ধ্রিয়তে সা জগন্ময়ী
সিত প্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিত পঙ্কজঃ।
হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ॥

বামনপুরাণে দানবগণের যানবাহনেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ধক নামে দানব কৃষ্ণবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে যুদ্ধে গমন করেন। প্রহ্লাদের রথের অশ্ব শ্বেতবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ, সংখ্যায় আটটি। বিরোচনের হস্তী এবং কুম্ভ দানবের বাহন অশ্ব। জম্ভ, শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতিও অশ্ববাহন। হয়গ্রীব দৈত্যের হস্তী। ময়দানবের রথ, দুন্দুভি দানবের মহাসর্প। শম্বরের বিমান এবং শঙ্কুরবাহন অশ্ব।

যান ও বাহনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা আমরা করিব না। এই সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, দেবতারা তাহাদের শক্তি সামর্থ্য কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজন অনুসারেই আপন আপন বাহন বাছিয়া লইয়াছেন।

অন্যান্য বাহনের কথা নাই বা বলিলাম, শুধু গরুড়ের কথাটা বলিয়াই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিব।

কশ্যপ এক যজ্ঞ করেন, পুত্র কামনায়। দেবতা ও ঋষি সকলেই সেই যজ্ঞে কোনো না কোনো কার্য্যভার ভাগ করিয়া লইলেন। ক্ষুদ্রাকৃতি বাল্যখিল্য মুণিগণও ইন্দ্রের সঙ্গে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্র বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড বহন করেন। বালখিল্যগণ ক্ষুদ্র পত্রের একটি বৃন্ত বহন করেন। তাহাতেও আবার পথে এক গোস্পদ জলে পড়িয়া হাবুডুবু খান। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্র উপহাস করেন। ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র হইতেও অধিকতর বলশালী সৃষ্টির জন্য এক যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া কশ্যপের শরণ গ্রহণ করেন। তিনি মুনিদের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বলেন ইন্দ্রের অধিক বলশালী ইন্দ্র উৎপন্ন হইবে বটে, তবে সে পক্ষীগণের ইন্দ্র হইবে। জন্ম হইল গরুড়ের এই গরুড় বিনতানন্দন। তাহার শক্তির কথা চারিদিকে ছড়াইয় পড়িল। ইন্দ্রও ভীত হইলেন। একদিন গরুড় স্বর্গে গিয়াছে। হয়তে অমৃত হরণ করিবে। দেবতারা তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃ হইলে সে কিন্তু নিজের পরাক্রমে তাহাদের পরাজিত করিল এব অমৃত ভাণ্ড লইয়া ছুটিয়া চলিল। পথে বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা। বিষ্ণু বলেন পক্ষীরাজ, তোমার বলের কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর। গরুড় বলে—আমাকে বর দিতে চাও দাও, আমি তোমার উপরে যেন থাকি। বিষ্ণু বলেন—তা হউক। গরুড় তখন ভাবে আমার এভাবে বিষ্ণুর কাছে ব প্রার্থনা করাটা নিতান্ত ক্ষুদ্রতার পরিচয় হইয়াছে। আমি বিষ্ণুকে বর দিব। সে বলে—নারায়ণ, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে একটি বর দিব। চতু বিষ্ণু বলিলেন, ভাল তুমি যদি বর দিবে দাও, তুমি আমা বাহন হও। গরুড় আর না বলিতে পারেনা অম্লান বদনে ব তাই হউক। দুজনের বরই সত্য হইল। ধ্বজার উপরেও গরু

বসিল, আর বাহন হইয়াও গরুড় নারায়ণকে বহন করিল। উপরেও রহিল আর নীচেও রহিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যকলা

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৌরমণ্ডল বিরাট স্পন্দনের বিস্তার। যেদিকেই বিচার কর দেখিবে কেবল স্পন্দন, নর্ত্তন, আর বিস্তার। নৃত্যের মাধ্যমে নিজেকে ছড়াইয়া দেওয়াই যেন এই প্রকৃতির নিয়ম। আকাশে বাতাসে আলোকে পুলকে সর্বত্র অনন্ত পরমাণুর চঞ্চল সুবিন্যস্ত নর্ত্তন কোনোভাবে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অনাদি অনন্ত স্পন্দনের মূল প্রেরণা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অফুরন্ত সৃজনী-শক্তির মধ্যেই অন্বেষণ করিয়া থাকেন জ্ঞানিগণ। প্রাচীনতম যুগে সেই পরমদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল— "প্রচোদয়াৎ", "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ভাল মন্দ সকল প্রেরণার মূলে সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীভগবান্। তাঁহার এই প্রেরকতার সঙ্গে পরিচয় হইলে মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞান হইল। সেই বিশাল বিরাট আনন্দ সমুদ্রের চিরচঞ্চল স্পন্দনের সঙ্গে আপন হৃদয়ের প্রতিটি ছন্দের কিভাবে সম্বন্ধানুভব হয় তাহার জন্য যোগস্থ হইতে হয়।

বিশ্বম্ভর স্বচ্ছন্দ প্রেম ঢালিয়া বিশ্বজনের আনন্দ দানের নিমিত্ত আসিতেছেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ভূমিকায় বলেন।

কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্বদাস॥

পদ্মপুরাণের বাক্যে ভগবানের ভক্তগণের নৃত্যপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্‌ভ্যাম্‌
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎ যার্যতে রাজন্‌
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিক হয় সুনির্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস॥

ভক্তিভরে নৃত্য করিলে ভক্তের পদস্পর্শে পৃথিবীর অমঙ্গল দূর হয়, তাঁহার দৃষ্টি যতদূর যায় অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। বাহু দেবলোকের বিঘ্ন দূর করে। ভক্তের নৃত্যেই যদি এরূপ হয় স্বয়ং ভগবানের নৃত্যে যে কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মায়ের কোলে শচীনন্দন। কি জানি কোন্‌ অভাবে কাঁদিয়া উঠে। মাতা তাহাকে শান্ত করিতে পারেন না। কোনো প্রতিবেশিনী রমণী হরিনাম করিয়া হাততালি দিয়া শিশুকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। শিশু চুপ করিয়া নামকীর্ত্তন শুনে আবার কাঁদিয়া উঠে। আবার হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে থাকেন নারীগণ। তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠে সমুচ্চারিত হরিনাম শুনিয়া কোলের ছেলে কোলের উপরেই নাচিতে আরম্ভ করে। কে জানে এই নৃত্যের উদ্দেশ্য কি?

প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্ত্তন॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে॥

কোলের ছোট ছেলেটির ইচ্ছা বুঝি সকলে নিরন্তর হরিনাম করুক।

সেই জন্যই এই ভঙ্গী করিয়া নৃত্যারম্ভ। চৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাই বলেন—

নিরবধি সভার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু, হে ইচ্ছা তান॥

হরিনামে এই বালকের বড় আনন্দ বুঝিয়া নারীগণ প্রাতঃকাল হইতে বালককে মাঝখানে রাখিয়া হরিনাম করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ নৃত্য করেন।

হরি বলি নারীগণে দেই করতালি।
নাচে গৌর সুন্দর বালক কুতুহলী॥

কোল ছাড়িয়া এখন নিজেই দাঁড়াইয়া নৃত্য করে। আবার কখনও ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ হইয়া ভূমিতে গড়াবড়ি দেয়। মায়ের কোলে ধূলায় পড়িয়া আবার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নানাভাবে নৃত্য সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥

বিদ্যাবিলাসী গৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে সকলকার চমৎকৃতি। তাঁহার অগণিত শিষ্য, যুক্তি তাহার অখণ্ডিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাস দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গর্বহরণ প্রসঙ্গেও শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যকলার এবং মধুর বচন-ভঙ্গীর কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলেন—

হরি বলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি
জগ-মন বান্ধল করুণ বোল বলি॥

বাহু তুলিয়া নাচিবার একটি বিশেষ তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। কতজনে উহার কত ব্যাখ্যা করিবে করুক। উর্দ্ধ বাহু যে ভগবানকে

লক্ষ্য করিয়াই এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই নৃত্যের সঙ্গে আবার জগতের জীবমাত্রকে সেই কারুণ্যের অমৃত ছড়ানো মধুর বাণীর সংযোগ। কথা গান গমন নটন লীলা। শ্রীগৌরাঙ্গের এই মধুর ভাবনৃত্য নবদ্বীপেই দেখা দিয়াছিল।

ভাবনৃত্য ও কপট নৃত্যের পার্থক্য সম্বন্ধে সুন্দর এক উপাখ্যান শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়। একদিন এক ডঙ্ক নাচিতেছিল ধনীগৃহে। সাপুড়িয়া সাপের খেলা দেখায়। বিষদাঁত ভাঙ্গা সর্পের দংশনে বিক্ষত হইয়া সাপুড়িয়া গান গায় নৃত্য করে। তাহাকে বলে ডঙ্ক। সাধারণতঃ তাহারা কৃষ্ণের কালীয়দমন লীলা বা শঙ্করের বিষপানের গান গাহিত। পরম ভক্ত হরিদাস এরূপ এক ডঙ্কের নৃত্যগীতে ভাবাবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ কালীয়দমন লীলা ভাবনায় ডুবিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ মূর্চ্ছার পর কৃষ্ণলীলা আবেশে তিনি নৃত্য করিতে থাকেন। তাহাকে ঐভাবে দেখিয়া ডঙ্ক ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধায় এক পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সব দেখিয়া সম্মান পাওয়ার লালসায় এক ব্রাহ্মণ ঢং করিয়া সেই ডঙ্কের কাছে মিথ্যা মূর্চ্ছার অভিনয় করিল। ডঙ্ক তখন নৃত্য করিতেছিল, তাহার হস্তের বেত্র দ্বারা সেই কপটটিকে আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিল। দর্শকদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কেননা শ্রীহরিদাসের নৃত্যসময়ে ডঙ্ক তাঁহাকে স্থান ছাড়িয়া দিল এবং প্রণাম করিয়া সম্মান করিল, আর এই লোকটিকে বেত্রাঘাতে সরাইয়া দিল, ইহার কারণ কি হইতে পারে? তখন ডঙ্ক সকলের সন্দেহ নিরসন করিয়া বলে—শ্রীহরিদাস পরম ভাগবত, অকপট কৃষ্ণপ্রেমী তাঁহার পদধূলি স্পর্শে জীবন পবিত্র হয়। তাঁহার নৃত্যে ধরণী পবিত্রা এই লোকটি ঢং করিয়া নাচিতে গিয়াছিল, তাহার কপট নৃত্য লোক-বঞ্চনার নিমিত্ত সম্মান পাওয়ার লোভে, অতএব তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভাব ও কপটতা অনায়াসেই ধরা যায়।

কীর্ত্তন জমিয়া না উঠিলে নৃত্য হয় না। মহাপ্রভু শিষ্যগণকে চারি

দিকে মণ্ডলী করিয়া নিজে হাতে তালি দিয়া প্রথমতঃ কীর্ত্তন শিক্ষা দান করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই—

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥
আপনে কীর্ত্তননাম করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গায় সব শিষ্যগণ ॥

ইহার পরই প্রেমের আবেশ এবং ধূলায় গড়াগড়ি। তখন আর কাহারও ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হয় না। সকলে ছুটিয়া আসে সেই সোনার গৌরাঙ্গকে ধূলা ঝাড়িয়া ভূমি হইতে তুলিবার জন্য। যে আসে সেও ব্যাকুল হয় তাঁহার দিব্যভাবের প্রভাবে।

আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যসঙ্গী শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মহামহিমা ভক্তগণের সমীপে প্রকাশ করিবার জন্য মহাপ্রভু শ্রীবাসকে এক শ্লোক উচ্চারণের ইঙ্গিত করিলেন। ভাগবত হইতে শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণগোপালের স্বগণ সঙ্গে বেণুবাদনপূর্বক বনগমন-লীলার বর্ণনা শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। সেই মধুর শ্লোক শ্রবণমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমমূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। বার বার শ্লোক উচ্চারণ করিতে তাঁহার মূর্চ্ছা অপগত হইল। উন্মাদের মত হুংকার করিয়া তিনি উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু প্রেমজলে পূর্ণ, অঙ্গে পুলকখন শ্বাস, আবার ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস্যের রোল। অদ্ভুত চরিত্র নিত্যানন্দ। দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত।

ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোরে জোরে লাফ দেয় দেখি ভাল ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কিভাবে নৃত্য করে, কিভাবে ভগবানকে নৃত্য করায়, কিভাবে ভক্তকে নৃত্য করায়, শ্রীনিত্যানন্দ-নৃত্যে তাহার প্রকাশ। নিত্যানন্দ দর্শনে ভক্তগণের যে অবস্থা হইয়াছিল অল্প কথায় উহা বর্ণনা করেন শ্রীল বৃন্দাবন দাস—

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥

ভক্তগণের হৃদয়ে মনে দেহে শ্রীনিত্যানন্দ নিজেকে ছড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রেমে দর্শক শ্রোতা সকলে প্রেমময় হইয়া গেল। নিত্যানন্দশক্তি এইভাবেই চিরদিন লীলা করেন।

শ্রীমন্মমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলেন—শ্রীনিত্যানন্দ, তুমিই মূর্তি-মান কৃষ্ণপ্রেমভক্তিসম্পদ। তোমাকে পাইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া হইল। মহাভাগ্যেই আজ তোমাকে পাইলাম।

মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে যে পাই কৃষ্ণদরশন ॥

শ্রীবাসের আঙ্গিনা কীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলী। নিত্য ভক্ত-সম্মেলন। অজস্র নামকীর্ত্তন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে সেদিন ব্যাস-পূজার অধিবাস। এই অধিবাস-কীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ দুজনে সমানে নৃত্য করেন। ভক্তগণ মণ্ডলীবদ্ধভাবে কীর্ত্তন করেন। দুজনে মুখোমুখি, যেন রূপের মধু আস্বাদনে দুজনেই প্রমত্ত হইয়া আছেন। আবেশ নাই, কেবল অন্তরের আকূতি। বাহিরে লক্ষ্য নাই, শুধু প্রেমের মগ্নতা। কখনো আত্মহারা, কখনো ব্যাকুলতা, কখনো আনন্দের অশ্রু-উচ্ছ্বাস, আবার পরক্ষণেই বিরহবিধুরতায় কাতর ক্রন্দন। এই বিচিত্র ভাবের বিচার করিবে কে? চৈতন্য-ভাগবতের ভাষায়—

চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই।
দোঁহে দোঁহে ধ্যান-করি নাচে একঠাঁই ॥

*　　*　　*

স্বানুভবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন ॥

ক্রমে নৃত্যের নানা ছন্দ, নানা ভঙ্গী, কখনো ধীর, কখনো চঞ্চল, কখনো মৃদু, আবার কখনো সবেগে নৃত্য চলিতে লাগিল। এমন করিয়া দেহ নোয়াইয়া পড়ে, মনে হয়, মস্তক বুঝি চরণেই ঠেকিল। আবার এমনভাবে পদবিক্ষেপ হইতে লাগিল, মনে হয় যেন ভূমিকম্প হইতেছে। সে কি উল্লাস, সে কি ভাব-বিহ্বলতা, কীর্ত্তন রস অবর্ণনীয় বলা অত্যুক্তি নয়।

বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতালে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে ॥

ব্যাসপূজার পূর্বদিনে অধিবাস-কীর্ত্তনে ও ব্যাসপূজার অন্তে দুই ভাই একঠাঁই নৃত্য করিয়া ভক্তগণের যে আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। যেমন করিয়া নিত্যানন্দকে নাচাইয়া নিজে নাচিয়াছেন, তেমনই শান্তিপুরের জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকেও নাচাইয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সেদিন রামাইপণ্ডিতকে ডাকিয়া মহাপ্রভু আদেশ করিলেন, শীঘ্র যাও, অদ্বৈত আচার্যকে গিয়া বল, "আমি আসিয়াছি। যাহার উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল তুলসীদল দিয়া আগ্রহে পূজা আরাধনা করা, সেই আমি তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন সে আমার কাছে আছে আসিয়া আমার কার্য-সাধনা করুক।"

রামাই পণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞা বহন করিয়া অদ্বৈতগৃহে চলিলেন, তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। অদ্বৈতাচার্য তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া প্রেমে আত্মহারা। পত্নী সীতাদেবীকে বলিলেন—চল, দেখিয়া আসি। আমি যাঁহাকে চক্ষের জলে আহ্বান করিয়াছি সেই প্রভুকে দেখিয়া জন্ম সফল করি। আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর সমীপে আসিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতগৃহে বিষ্ণুসিংহাসনে আবিষ্টভাবে বসিয়া বলিতেছেন—"নাঢ়া আসিতেছে, সে আমার ঐশ্বর্য দেখিতে চায়। ভাল, আসুক, তাহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হউক।"

সস্ত্রীক আচার্য পূজার নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মনের গোপন লালসা ভগবানের পাদপদ্ম শিরে ধারণ করিবেন। মহাপ্রভু যদি তাহার আরাধ্য পরমদেবতা মদনগোপালই হইয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয় আমার মাথায় চরণ স্থাপন করিবেন, এই আশা লইয়া তিনি সমীপবর্ত্তী হইলেন। পূজার সামগ্রী, পাদ্য অর্ঘ্য, চন্দন, পুষ্প, তুলসী গঙ্গাজলে মহাপ্রভুকে যথারীতি পূজা করিলেন। কৃষ্ণমন্ত্রে পূজা করিয়া অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সর্বভক্তসান্নিধ্যে

সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়॥

অভিলাষ পূর্ত্তির আনন্দে সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দর্শনে মহাপ্রভু তাহাকে প্রেমাবিষ্টচিত্তে আজ্ঞা করিলেন।

"আরে নাঢ়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর।"

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া বৃদ্ধ অদ্বৈত্য নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভক্তকণ্ঠে কীর্ত্তনধ্বনি।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্যগোসাঞি।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঁই॥

সেই কীর্ত্তনে নর্ত্তনে অতি অভিনব নানা ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্ত্তনধ্বনি কর্ণে প্রবেশমাত্র প্রেমবিহ্বলতায় ভক্তবৃন্দ আত্মহারা হইয়া যান। পৃথক পৃথক ভাব হইলেও সেই নৃত্য দর্শন করিয়া সকলের মনেই দাস্যভাব প্রধান হইয়া উঠিল। চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা—

উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর।
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥

কীর্ত্তন আনন্দে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মিলন ঘটিল। হাসিয়া অদ্বৈত বলেন—

ভাল হইল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাই পাই॥

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের মিলনে যে আনন্দ শিহরণ তাহার প্রকাশ নৃত্যের মধ্য দিয়াই হইয়াছিল তাই সেই—

অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব সকল।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল কেবল॥

তাঁহার নৃত্যের ছন্দে গৌরাঙ্গপ্রভু সন্তোষ লাভ করিয়া বর দিতে চাহিলেন।

অদ্বৈত বোলয়ে আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল।
তোমার সাক্ষাত করি আপনে নাচিলুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইলুঁ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৬)

মঞ্জরী ভাবে গৌর

সীতারাম গৌরীশঙ্কর রাধাকৃষ্ণ এইভাবে শক্তি ও শক্তিমানের যুগলিত আরাধনাক্রম বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। যাঁহারা শক্তি তত্ত্বের নিত্যমূর্ত্তিত্ব স্বীকার করেন অথবা সচ্চিদানন্দ রসঘন পরম ব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের আরাধনাও ভগবৎপ্রিয়পার্ষদসহিত তৎতৎ প্রিয়ধামেই অনাদিসিদ্ধ জীব স্বরূপে অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই অনাদিসিদ্ধ নিত্যসেবাময় জীব স্বরূপটির একটি বিশেষ পরিচয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্পষ্টভাষায় প্রদান করিয়াছেন। ব্রজভাষার আদি কবি বলিয়া প্রখ্যাত শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যানুগত যুগল-শতক বা আদিবাণী প্রণেতা শ্রীভট্ট শ্রীরাধা গোবিন্দেয় নিত্যধামে নিত্যবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। নিত্যবিলাসী যুগল কিশোর। নিত্য সেবা তাঁহার অভিলাষ। তিনি বলেন—

জনম জনম জিনকে সদা হম চাকর নিশি ভোর।
ত্রিভুবন পোষণ সুধাকর ঠাকুর যুগল কিশোর ॥

যুগল কিশোর আমার ঠাকুর জন্মজন্মান্তর আমি তাঁর চাকর। এই নিত্যসেবা ও সেবকভাব শ্রীভট্টাচার্য্যের সমীপে পাওয়া যায়। আচার্য্যের যথাবস্থিত দেহের নাম ভিন্ন যুগল সেবার উপযোগী সখীগণের অনুগত দাসীরূপে একটি নামও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধাশ্যাম সুন্দর ভোজন করিতেছেন। হাতে ভোজ্য গ্রাস লইয়া রসালাস করিতেছেন। তখন—

বিনয় করতে পাউঁ জুমৈঁ নাউঁ চরনন মাথ।
দেহ ধরে কো যেহ ফল হিতূ জিমাউঁ হাত ॥

এই দোহা হইতে শ্রীভট্ট যে সখী সমাজে শ্রীহিতূ বলিয়া নিজের পৃথক্ এক স্বরূপ ভাবনা করেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারই শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিব্যাসাচার্য্য। "মহাবাণী" তাঁহার রসপ্রাণতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্যামস্নেহীর পরমাদরণীয় মহাবাণীতে দেখা যায় যুগল কিশোরের প্রসিদ্ধ নিত্য সখীগণের অন্যতম প্রধানা সখী রঙ্গদেবী। যোগপীঠ বর্ণনায় প্রথমেই রঙ্গদেবীর যুথ। শ্রীহরিব্যাস বলেন—

প্রথমহি রঙ্গদেবী মনাউ' তিন্‌কী কৃপা যহৈ জস গাউঁ। রঙ্গ দেবীর অনুগাগণের অন্যতম শ্রীহিত সুন্দরী। প্রধানা সখীগণের প্রত্যেকের আটজন অনুগা ইহাদের অলবেলী বলা হইয়াছে। "অলবেলী" কথার অর্থ তরুণী বিলাসিনী। এই স্বরূপের আবিষ্কার সাধনার জীবনে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে প্রবেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরুষ নিজেকে তরুণী বিলাসিনীরূপে ভাবনা করিবে ও সেই ভাবে সেবা করিবে নিজের প্রিয়তমকে ইহা সত্যই রসসাধনা পর্য্যায়ে বিশেষ বিচারণীয়। সিদ্ধান্তসুখে দেখা যায়—

বিবিধ বিনোদবিহারিণি জোরী গোরী শ্যাম সকল সুখরাণ।
হিতূ সহচরী শ্রীহরিপ্রিয়া হরষত নিরষত চরণকমলকে পাশ॥
শ্রীগুরুদেব শ্রীহিতূর সহচরীরূপা শ্রীহরিব্যাস শ্রীহরিপ্রিয়া

মধুর মোহনীয় সকল সুখধাম বিচিত্র লীলাকারী যুগল কিশোরের চরণ সান্নিধ্যে থাকিয়া দর্শনানন্দের অভিলাষ নিবেদন করেন।

শ্রীরূপগোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যমণি স্বরূপে উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সাধকের এই নিত্যবিলাসিনী স্বরূপটির কথা অধিকতর স্ফুট করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সাধনার জীবনে এই নিত্যবিলাসী যুগলকিশোরের সেবা প্রকটনে— এই নবরূপে সাধকের অভিব্যক্তিকে মঞ্জরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

তুলসী প্রভৃতি কতগুলি গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল যখন প্রস্ফুটিত হওয়ার মুখে তখন উহাদের মঞ্জরী বলা হয়। সেবাভিলাষে সাধকের নবভাবে প্রস্ফুটিত হইবার ভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই মঞ্জুরী কথাটির ব্যবহার বলিয়া অনুমান করা যায়। কেহ কেহ মঞ্জরী বলিতে চান ইহাতে অর্থ হয় মধুরা বা সুন্দরী। মঞ্জরী কথাটিই শাস্ত্রে ব্যবহৃত আর উহার অর্থ পল্লবাঙ্কুর নবপ্রকাশিত পল্লবাগ্রভাগ। প্রধানা সখী ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতা সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা রঙ্গদেবী। ইঁহাদের অনুগতা দাসীগণ নিত্যমঞ্জরী বলিয়া পরিচিত। সাধকদাস এই নিত্যমঞ্জরীগণের আনুগত্যে যে সকল গুরুমঞ্জরীর পরম্পরা আছে তাঁহাদের অনুগত হইবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহার যুগল সেবার উপযোগী সিদ্ধস্বরূপের নাম, বয়স, বেশ, বাস ভাব ও সেবা বিষয়ে নির্দ্দেশ দান করিয়া স্বারসিকী লীলায় প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করিয়া নিজে হাত ধরিয়া সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিবেন। মঞ্জরী-স্বরূপের বিশেষ লক্ষণ একান্তভাবে নায়িকাভাব সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা। শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলকিশোরের প্রতি প্রীতিবহন করিয়াই তাহারা কৃতার্থ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার সুখ তাহাদের অভিলষিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলনে যে আনন্দ উহাই তাহারা নিজের আনন্দ বলিয়া অনুভব করেন।

সাধকের ভাব পরিপুষ্ট হওয়ার পর প্রেমের অভ্যুদয়ের সঙ্গেই সিদ্ধ দেহ বা ভাবনাময় মঞ্জরী-দেহ প্রকাশ হইয়া পড়ে লৌকিক দেহের অবসান হয়। সাধক অবস্থায় ভাবনা-সিদ্ধ অবস্থায় উহার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

স্মরণ মঙ্গল গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

সখীর সঙ্গিনী হই তবে প্রেম সেবা পাই
মনে মনে করি যে ভাবনা।

সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ দেহে পাব তাহা
কহিলাম এই তত্ত্ব সীমা ॥

শ্রীরূপ, রতি, রস, গুণ, বিলাস, মঞ্জুলালী, কস্তুরী প্রভৃতি নিত্য মঞ্জরী। ইঁহাদের আনুগত্যেই সাধক সিদ্ধাবস্থায় যুগলমাধুরী আস্বাদন করেন। একদিন শ্রীরাধা মণিমঞ্জরীকে অভিসার করাইবার জন্য এক সখীকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি মণিমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণসমীপে অভিসার করাইতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরাধাকে তিনি বলিলেন—প্রিয়সখী, আমি তোমার নির্দ্দেশে মণিমঞ্জরীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বলিলাম, শ্রীকৃষ্ণ মিলনের যে সুখ ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাই। ললিতা প্রভৃতি যেমন কখনও সখী আবার কখনও নায়িকার মত সুখভোগ করেন তুমিও তেমন সুখভোগ কর। অপরের চাইতে তুমি ছোট কিসে? কথা শুনিয়া মণিমঞ্জরী বলিল—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যে সুখভোগ করেন উহাই আমার নিজের মিলন হইতে অধিকতর সুখদায়ক। হে প্রিয় সখী রাধে, বুঝিলাম, মণি-মঞ্জরীর চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। সে আমার প্রলোভনে ও চাতুর্য্যে বিচলিত হয় নাই।

** ত্বয়া যদুপ ভুজ্যতে মুরজিদঙ্গ সঙ্গে সুখং
তদেব বহু জানতী স্বয়মবাপ্তিতঃ শুদ্ধধীঃ।
ময়া কৃতবিলোভনাপ্যধিক চাতুরী চর্যয়া
কদাপি মণিমঞ্জরী ন কুরুতে ঽভিসার স্পৃহাম্ ॥

কোনো এক মঞ্জরী দাসী বনমালা রচনার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—হে শোভনাঙ্গি, এই কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া আমার সহিত বিলসিত হইয়া জন্ম সফল কর। এই কথা শুনিয়া সেই মঞ্জরী বলেন, আমি তোমায় আমার মনোভাব

যথার্থতঃ বলি শুন। হে কৃষ্ণ শ্রীরাধারূপ বিলাসভূমিতে তুমি তোমার মধুর ভাবের যত চাতুর্য্য প্রকাশ কর তাহাতেই আমাদের সকল গোপীর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। তোমার অঙ্গসঙ্গ পাইয়া আনন্দিত হওয়ার জন্য আমার মন মোটেই উৎসুক নয়। তুমি শ্রীরাধা সঙ্গে বিলাসে মগ্ন থাকিলে তখন আমরা শ্রীরাধার আনন্দ দর্শন করিয়া সুখী হইব এরূপ দর্শনানন্দ সেবাতেই আমাকে নিযুক্ত কর। সাক্ষাৎ আসঙ্গে মন চলে না। এই কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিলে মঞ্জরীভাবের আদর্শ বুঝা যাইবে। শ্রীরূপ রতি প্রভৃতি মঞ্জরী বা নিত্যদাসী কিঙ্করী যুগলের সুখেই সুখী। সাধক দাস তাঁহাদের আদর্শেই নিজের মঞ্জরী স্বরূপ ভাবনা করিয়া নিশিদিন অষ্টযাম যুগল সেবায় সেবা করিয়া সখীরূপে অবস্থান করিবেন। এই স্থিতিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত। শ্রীরতি মঞ্জরী যিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীরূপে প্রাণের সেবা-নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সেবাপরাগণের যেন রাধার প্রতি অধিকতর প্রীতি। তাহার কারণও আছে। রাধার প্রীতিতেই-শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি প্রতিষ্ঠিতা। রাধার সুখেই কৃষ্ণের সুখ এই গোপন সত্য সেবাপরাগণের সমীপে অজ্ঞাত নয়। তাই রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া সেবাপরার পরমা প্রীতি। মণিমঞ্জরী কোনো এক নবমঞ্জরীকে শিক্ষাদান করিয়া বলিলেন—হে চতুরে, আমি নিজে অনুভব করিয়া তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি রাধার সঙ্গে সখ্য-বিধান কর। যদি মনে সন্দেহ হয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় করাই প্রয়োজন, রাধার সঙ্গে কি প্রয়োজন ? তাহার উত্তরে বলি—রাধার সঙ্গে যদি তোমার প্রণয় সিদ্ধ হয় তাহা হইলে কৃষ্ণ প্রেম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব রাধার সহিত সখ্যতাবিধান করাই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কৃষ্ণকান্তা হইতে মঞ্জরীর এই বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব দার্শনিক ও সাধকমণ্ডলী স্বীকার করেন। এই আত্ম সুখাশা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক সেবাভিলাষময় জীবন যাপন করিবার জন্যই প্রেম-ধ
প্রচার।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে গোপীভাবে সাধনার সঙ্কেত আছে
নিজেকে গোপীমণ্ডলীতে রূপ যৌবন সৌন্দর্য্যশালিনী নানা শিল্পবিদ্যা
পারদর্শিনী শ্রীকৃষ্ণভোগের আনুকূল্য বিধায়িনী এবং প্রার্থিত হইলে
স্বয়ং ভোগ পরাঙ্মুখিনী রাধার নিত্যসেবাপরায়ণা দাসীরূপে ভাবন
করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেও দাসীর রাধায় অধিকতর প্রীতি এব
রাধাকৃষ্ণ যুগলের মিলন ঘটাইয়া উভয়ের সেবা সুখেই পরমানন্দিত
হইয়া থাকাই ইহার স্বভাব।

আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবন সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥

*　　*　　*　　*

প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গম কারিণীম্।
তৎ সে বন সুখাহ্লাদভাবেনাতি সুনির্বৃতাম্॥

(পঃ পুঃ পাঃ ৫২ অঃ)

আত্মসুখাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাভিলাষময় জীবন যাপন করিবা
জন্যই প্রেম-ধর্ম্মপ্রচার।

মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাব হইতে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ভাবে
উদ্গম হয়। শ্রীকৃষ্ণচমৎকারিণী সুখদায়িনী ও সেবাময়ী সর্ব্ববৃত্তি
আকর শ্রীরাধার মহাভাব। এই মহাভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক রসরা
শ্রীগোবিন্দ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত। শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরা
সখী ও মঞ্জরী সকলের ভাবই লক্ষ্য করা যায়। একদিন মহাপ্র
গম্ভীরায় শয়ন করিয়া ভাবের আবেশে দেখিতেছেন শ্রীরাস নৃত্য।

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাস লীলা করে—দেখেন স্বপন॥

ত্রিভঙ্গসুন্দর দেহ মুরলী বদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাইলু" এই জ্ঞান হৈলা ॥

মুরলীর ধ্বনি, সুন্দর শ্যামল, পীতবসন, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম গলে বনমালা মন্মথমদন গোবিন্দ। রাধাকে বামে লইয়া কৃষ্ণ নৃত্য করেন। চতুর্দ্দিকে সখীগণ। এই দর্শন-আনন্দ মঞ্জরী ভাবেই বলিতে হইবে। আরো একদিন চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভ্রম হয়। সেই দিন মহাপ্রভু ভাবাবেগে ছুটিয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে বিচিত্র সাত্ত্বিক ভাব অশ্রু কম্পাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। আবেশ ভঙ্গের পর তিনি বলিলেন স্বরূপ, আমাকে গোবর্দ্ধন হইতে এখানে কে লইয়া আসিল? আমি কৃষ্ণকে গোচারণ করিতে দেখিতেছিলাম। বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। প্রিয় সখীগণ পুষ্প চয়ন করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আনন্দে মগ্ন ছিলাম। তোমরা কলরব করিয়া মধুর সেই বিলাসভূমি হইতে আমাকে এখানে লইয়া আসিলে কেন? এখানেও সেই মঞ্জরী ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরূপ দর্শন ও অনুভবের কথা আরও আছে।

মঞ্জরী ভাবে আবিষ্ট গৌরাঙ্গ বলেন—

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জল-ক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥

তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥

শ্রীমহাপ্রভু প্রেমোন্মাদে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন। ধীবরের জালে যখন আবিষ্ট অবস্থায় তীরে তুলিয়া আনা হইল ক্রমে তাঁহার চেতন হইলে তিনি বলেন—আমি যমুনায় জলকেলি দেখিতেছিলাম। আমার প্রাণের শ্রীকৃষ্ণ রাধা সখীগণ সহ যমুনায় জলকেলি করেন একজন সখী এই দৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাকে দেখাইতেছিল।

প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাম—বৃন্দাবনে।
দেখি—কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥
জল ক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল—হেন লয় মনে॥

যাহারা জলে নামিয়া কৃষ্ণসনে জলকেলি করেন তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা হইতে পারেন কিন্তু তীরে দাঁড়াইয়া যাঁহারা দর্শনানন্দ লাভ করেন তাঁহারাই সেবাপরা মঞ্জরী। তন্মধ্যে শ্রীমহাপ্রভুও আবেশভরে মঞ্জরী স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। রাধাভাবের মধ্যে এই মঞ্জরীভাবও অন্তর্ভূক্ত বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভাবোদ্‌গম। স্বতন্ত্রভোগ পরাঙ্মুখী শ্রীরাধার পাদপদ্মে অধিকতর প্রেম বহনকারিণী মঞ্জরীর জয় হউক। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের চরম সার্থকতা।

রামায়ণে প্রবেশ

রাম অনন্ত, রামকথা অনন্ত। আনন্দ রামায়ণে সেতুবন্ধন বর্ণনায় সুন্দর দৃষ্টান্ত। বানরেরা প্রস্তর বহন করিয়া দেয়। বিশ্বকর্মার অনুগ্রহে নল সেগুলিকে একের পর এক সজ্জিত করে। অবলম্বন বিনা সমুদ্রের জলে ভাসিয়া থাকে সেগুলি সকলকার চমৎকৃতি। নলের বিদ্যার প্রশংসা। এক নল ধীরে ধীরে পাথরগুলি বাঁ হাতে অবজ্ঞাভরে লইয়া সেতু রচনা করে। মনেও তাহার একটু অভিমান আছে—আমি ছাড়া এইভাবে সমুদ্রের উপর কে আর সেতু নির্মাণ করিতে পারিত?

শ্রীরামদাস হনুমান তাহার এই অভিমান এবং প্রভুর কার্যে শৈথিল্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছে। অভিমানীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অকপট সেবায় তাহার আগ্রহ। সে ভাবিল আমার এই প্রকাণ্ড শরীর 'শ্রীরাম' উচ্চারণের ফলে কত লঘু হইয়া সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবার যোগ্য হইয়াছে। এই প্রস্তরগুলি কি শ্রীরামনাম উচ্চারণে লঘু হইয়া সমুদ্রজলে ভাসিতে পারে না? নিশ্চয় ভাসিবে—দেখিতো একবার, রামনামে শিলা জলে ভাসে কিনা? প্রগাঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রীরামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া হনুমান শিলা জলে নিক্ষেপ করিয়া বলে—"প্রভু, তোমার নাম যেন ডুবিয়া না যায়।" পাথর জলে ভাসিল। তাহার বিশ্বাসের জয় হইল। সকল বানরসমাজকে ডাকিয়া হনুমান তাহাদিগকে উপদেশ করে—শ্রদ্ধাভক্তি সহিত শ্রীরামনাম করিয়া পাথর জলে ফেলিতে। নূতন সেতু নির্মাণ আরম্ভ হইল। নল-নির্মিত অসমাপ্ত সেতুর কাছে আর কেহ প্রস্তর লইয়া যায় না। ওখানে অভিমানী একাকী নল। নূতন সেতু নির্মাণে সকলেই নিরভিমান—সেতু নির্মাণে

সহযোগী, রহস্যবিদ্যা তাহাদের অধিকৃত। খুব দ্রুত গতিতে সেতুবন্ধন হইয়া যায়। শিল্পী নল ভাবে—কেহ তো আর আমার সহায়তায় আসে না। ইহারা যে ভিন্ন নূতন এক সেতু অনায়াসে নির্মাণ করিয়া ফেলিল। দেখিয়া আসি কি কৌশলে তরঙ্গক্ষুব্ধ সাগরের বুকে ইহারা পাথরগুলিকে ভাসাইয়া রাখিল। কৌতূহলী নল আসিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে সেতুর নীচে জলের মধ্যে; পরিশেষে চাহিয়া থাকে। এ কি দেখিতেছি, এ কি সত্য না স্বপ্ন, এ কি! প্রতিটি শিলার নীচে দেখি শ্রীরামই দাঁড়াইয়া উহা ধরিয়া রহিয়াছেন। এক রাম, এত রাম হইলেন কেমন করিয়া? তাহার শিল্পনৈপুণ্যের অভিমান চূর্ণীকৃত হইল। নিরভিমান হনুমানের সমীপে রহস্য জানিতে পারিলেন, শ্রীরামনাম আর শ্রীরামস্বরূপ ভিন্ন নয়। রামনামের টানে শ্রীরামই শিলা ধারণ করেন অনন্ত রূপে।

শ্রীরামকথা মহর্ষি বাল্মীকি প্রকাশ করিলেন বিস্তৃতভাবে। রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে তাঁহার ভবিষ্যৎ লীলাকথা রামায়ণ রচনা তপস্যার ফল ভিন্ন আর কোনরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। ঐতিহাসিক এই কথা শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে। ভারতের মন কিন্তু বিশ্বাস করিয়াই আসিয়াছে তাহাদের পুরাণের কথা। বিশ্বাসীর মন ফুলের মত, তাহার সুবাস সুষমা অক্ষুন্ন, উহাকে বিচারের ছুরিতে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ইতিহাসের চাপে ফেলিয়া রস নিংড়াইলে আর কিছু যা হোক প্রাণের মাধুর্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সামাজিকের মন রসশূন্য করিয়া তুলিতে এরূপ লৌকিক বিচারের অধিকার অনেকখানি।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিবার ও শ্রবণ করিবার সুযোগ সুবিধা অনেকেই হয়তো করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু রামায়ণের কথা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। নতুন কিছু জানিবার বুঝিবার আছে, ইহাও হয়তো অনেকে মনের কোণে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। যথার্থতঃ দেখিতে

গেলে বুঝা যাইবে আমাদের জীবনবেদের প্রতিটি পরিচ্ছেদের সঙ্গে রামায়ণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পারিবারিক জীবনের আলেখ্য রচনায় মহর্ষি বাল্মীকি যে চাতুর্য, গাম্ভীর্য ও শ্রদ্ধার ব্যবহার করিয়াছেন উহা মানুষের সঙ্গে দেবতার মিলন ঘটাইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র পরম দেবতা, পরম ঈশ্বর, পুরুষোত্তম ভগবান্, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, মন্ত্রবেদ্য, বিশ্ববীজ নিখিলের আশ্রয়। বেদ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র সংহিতায় তাঁহার নামমহিমা আরাধনার ক্রম উপবর্ণিত। ঐতরেয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, রামতাপনীয়, সীতোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে যে কথা সূক্ষ্মভাবে সাধনার উপযোগীরূপে বর্ণিত উহাই বিশদভাবে আখ্যায়িকা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে পরবর্ত্তী সাহিত্যে। আদিবাসী বলিয়া যে কেহ ঘোষণা করিলেও আদি কবি যে মহর্ষি বাল্মীকি এ বিষয়ে কিন্তু কোথাও বিরূপ সমালোচনাও শুনিতে পাওয়া যায় না। কাব্য প্রকাশের যে করুণতম কাহিনী ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহের গাথার সহিত জড়িত উহাই বুঝি আদিকবির গৌরব প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান সংকেত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীবুধকৌশিকমুনি রচিত শ্লোকে বাল্মীকি শুধু আদি কবি নন, তিনি কোকিলরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্॥

মহাকবি ভাস তাঁহার প্রতিমা নাটক ও অভিষেক নাটকের বিষয়বস্তুরূপে রামায়ণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এক রামায়ণ কত ছন্দে, কাব্যে, নাটকে, উপাখ্যানে, আখ্যানে নানা স্থানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, উহা এক বিরাট অনুসন্ধানের ব্যাপার।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ, ভবভূতির উত্তর-রামচরিত, মহাবীর চরিত, রামায়ণসংবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ভট্টির রাবণ-বধ, অভিনন্দের রামচরিত, কাশ্মীর দেশে ক্ষেমেন্দ্র পণ্ডিত কৃত 'রামায়ণ-

মঞ্জুরী' মলয়াচাট কৃত 'উদার-রাঘব' (১৮ সর্গ), বামনভট্ট বান কৃত 'রঘুনাথচরিত' (৩০ সর্গ), রঘুনাথ উপাধ্যায় কৃত 'রামবিজয়', চক্রকবির 'জানকীপরিণয়', অদ্বৈত সন্ন্যাসী কৃত 'রাঘবউল্লাস' প্রভৃতি বহু কাব্যে শ্রীরামের লীলা বর্ণিত আছে বাল্মীকি রামায়ণের টীকা ব্যাখ্যা সাহিত্যেও বিশেষ আলোচ্য দশ খানার উপর টীকার কথা শুনা যায়। যথা—(১) সর্বার্থসার—বেঙ্কট কৃষ্ণাধ্বরী।

(২) রামায়ণদীপিকা—বৈদ্যনাথ দীক্ষিত।

(৩) বৃহৎ ও লঘু বিবরণ—ঈশ্বর দীক্ষিত।

(৪) রামায়ণতত্ত্বদীপিকা—মহেশ্বর তীর্থ।

(৫) রামায়ণ-ভূষণ—গোবিন্দরাজ।

(৬) রামায়ণ-তিলক—নাগেশ্বর ভট্ট।

(৭) রামায়ণ শিরোমণি—বংশীধর ও শিব সহায়।

(৮) অমৃতকতকী—কতক যোগীন্দ্র।

(৯) মনোহরা—লোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

(১০) ধর্মাকুতম্—ত্র্যম্বকমখী।

(১১) রামায়ণতত্ত্বদর্পণ—নারায়ণ যতি।

এইগুলি ছাড়াও বহু ব্যাখ্যা তাৎপর্য-গ্রন্থ অপ্রকাশিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম যুগের সাধক-সাধিকাগণ রামায়ণকে তাহাদের সাধনার ধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আড়বার স্তোত্রাবলী হইতে উহা বেশ বুঝা যায়। উত্তরাখণ্ডে যে কৃষ্ণলীলা এবং মধ্যপ্রদেশে যে রামলীলা প্রচার লাভ করিয়াছিল উহা ক্রমে সাধক ও ভক্তগণের মাধ্যমে দক্ষিণদেশেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ ভগবান নানাভাবেই মরমী সাধকগণের আরাধনাস্তোত্রে তাঁহাদের প্রাণঢালা প্রীতিমাখা গানের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণদেশে প্রচারিত কোন আখ্যায়িকাকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া উত্তর প্রদেশে প্রচারিত সেই

একই প্রসঙ্গে অন্যথা বর্ণনায় কেহ যেন সন্দেহাক্রান্ত মন না হন। কেননা একই আরাধ্য ভগবান দেশ ও কালের পার্থক্য হেতু বিভিন্ন ভাবে গৃহীত ও আরাধিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একের যাথার্থ্য অপরের মিথ্যাত্ব বা অলীকতার কোন প্রসঙ্গ অনস্বীকার্য। বিভিন্ন কবির বর্ণনায় এক প্রকার উপন্যাস দেখিয়াও অনেক সময় উহা যে একের অনুকরণ নয় তাহা বলিতে হয়। জয়দেব কবির প্রসঙ্গ রাঘবের সঙ্গে তুলসীদাসের বর্ণিত পুষ্পবাটিকামিলন কথার কতখানি যোগাযোগ আছে, সাহিত্যিকের দৃষ্টি লইয়া উহা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। একটি অপরটির অনুসরণ—এই কথা বলিলেই সুবিচার হয় না। এই প্রকার বহু কবির বাক্যে একাধিক ক্ষেত্রে মিল ও অমিল দেখা যায়। মূল রামায়ণ-কথাকে স্মরণ রাখিলে এই সকল তুলনার ক্ষেত্রগুলিকে সুস্পষ্ট আলোকে দেখা যাইতে পারে। সেভাবের সমালোচনা এপর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

অদ্ভুতরামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, মূলরামায়ণ, আনন্দরামায়ণ আরো কত নামে রামায়ণ আছে। তুলসীদাস কৃত 'রামচরিতমানস' তো সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত গ্রন্থের অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ও ভক্তির প্রাচুর্যে এই গ্রন্থ একক। শিবপুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, সৌরপুরাণ কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে অনেক প্রসঙ্গ স্থানবিশেষে ভক্ত কবি তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভক্তিকথার প্রাচুর্যে এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে রসমন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন। প্রতিটি অধ্যায় যেন ভক্তিসাধনার নব নব বেদী রচনা করিয়াছে। গ্রন্থের নামের সহিত ভক্তিভাবধারার এক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে তাহা কবি ঘোষণা করিয়াছেন। 'রামচরিত মানসের' ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'শঙ্করের অনুগ্রহে বুদ্ধির বিকাশ, তাই তুলসীদাস শ্রীরামচরিত মানসের কবি। যথামতি ইহাকে মনোহর

করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রোতৃগণ সুন্দর মনে শ্রবণ-পূর্ব্বক ইহাকে শোধন করিয়া লইবেন। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির ভূমিতে গভীর স্থান—হৃদয়, বেদ পুরাণ—সমুদ্র, সাধুগণ—মেঘ। সেই সাধু-মেঘগণ সমুদ্র হইতে আহরণ করিয়া শ্রীরামের সুন্দর মধুর মনোহর মঙ্গলকারক গুণাবলীস্বরূপ অমৃতজল বর্ষণ করেন। সগুণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরামের সুযশ জলের নির্মলতা উহাতে মনের কালিমা দূর করে। যে প্রেমভক্তি বর্ণনার অতীত উহাই এই জলের মধুরতা ও শীতলতা। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমামৃত সৎকর্ম-ফসলের বৃদ্ধিকারক, উহাই ভক্তের জীবন। উক্ত পবিত্র অমৃতবারি বর্ষণে পৃথিবীর জনগণের কর্ণপথে মানসস্বরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান পূর্ণ করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। উহাই প্রাচীনতায় সুন্দর শীতল ও সুখদায়ক হইয়া রহিয়াছে।

সুচি সুন্দর সংবাদ বর বিরচে বুদ্ধি বিচারী।
তেই এহি পাবন সুভগসরঘাট মনোহর চারি॥

ভাল করিয়া বিচারপূর্বক (১) ভুশুণ্ডি-গরুড় (২) শিব-পার্বতী (৩) যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ (৪) তুলসীদাস ও সাধুগণ—এই চারিটি প্রসঙ্গে পবিত্র ও পরম সুন্দর মানসসরোবরের চারিটি ঘাট বাঁধা হইয়াছে। রামায়ণে সপ্তকাণ্ড এই সরোবরের সাতটি সিঁড়ি। যে কোন একটি প্রসঙ্গ মানুষের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধানে পরম সাধন।

ভুশুণ্ডি-গরুড়-কথায় জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য বড় সুন্দরভাবে অভি-ব্যক্ত হইয়াছে। ভুশুণ্ডি বলেন—শ্রীহরিভক্তি ভিন্ন যে অপর কোনো সাধনে সুখের অভিলাষ করে, উহা পোতাশ্রয় ভিন্ন সমুদ্রতরণের প্রয়াসের ন্যায় বৃথা হয়। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই সাধনবিচারে সমান মনে হইলেও সাধুগণ কিছু ভেদ বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগ এই সকল সাধন পুরুষ স্বভাব। স্থিরবুদ্ধি বিরক্ত পুরুষ

নারীর আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু সংসারী ভোগী রামবিমুখ চঞ্চলমতি কি কখনও তাহা পারে। অনেক সময় দেখা যায়, জ্ঞানের ভাণ্ডারসদৃশ মুনিও নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া যায়। সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুমায়াই নারীরূপে প্রকাশ পায়। পক্ষপাত ছাড়িয়া দিয়া সহজভাবে বিচার করিলেও বুঝা যায় এক নারীর রূপ অপর নারীকে মোহিত করিতে পারে না। মায়া নারীজাতি, আর ভক্তিও নারী। বিশেষতঃ ভক্তি হইলেন শ্রীরামের প্রিয়া, আর মায়া শুধু নটী। এই অবস্থায় ভক্তির প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের আনুকূল্য অধিক ; অতএব যেখানে ভক্তির প্রকাশ সেই স্থানে মায়া ভয় পায়।

ভগতিহি সানুকূল রঘুরায়া।
তাতে তেহি ডরপতি অতিমায়া ॥

শ্রী সীতাচরিত্র দিগ্‌দর্শন

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্॥

সংসারের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী সকলের মঙ্গলদায়িনী শ্রীরাম-বল্লভা সীতাকে প্রণাম করি।

মাতা সুনয়না সখীর সহিত সীতাকে সকালবেলা গৌরীপূজার জন্য পাঠিয়েছেন। পুকুরের ধারেই দেবীর মন্দির। সীতা সখীগণ সহ পুকুরে এইমাত্র স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। গৌরী পূজায় তাঁহার অধিক অনুরাগ। পূজা শেষে নিজের অভিমত বর প্রার্থনা করলেন। বুঝা গেল দেবী প্রসন্ন।

এদিকে শ্যামগৌরদেহ শ্রীরামলক্ষ্মণ অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করে গুরু বিশ্বামিত্রের পূজার ফুল সংগ্রহে এসেছেন। উদ্যানবাটির একপ্রান্তে তাদের দেখে সীতার এক সখী প্রেমবিবশ। সীতা জিজ্ঞাসা করেন—কি হ'ল তোর। তুই এমন হলি কেন? তার চোখে জল, প্রতিটি অঙ্গে পুলক সে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। সে বলে আমি কি বলব? আজ এই বাগানে এমন দুজনকে দেখলাম যাঁরা সবরকমে সুন্দর। কিশোর বয়স; একজন শ্যামলকান্তি, অপর জন গৌর। কত সুন্দর তা বর্ণনার সামর্থ্য আমার নেই। কেননা যে দেখেছে—সেই চোখের কথা বলবার ক্ষমতা নেই, আর যে বলবে—আমার বাক্‌শক্তি—সে তা দেখে নি। সেই রূপ বাক্যমনের অগোচর। কথা শুনে সীতার অন্তরে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। তার নয়ন লালসান্বিত। সখীর সঙ্গে সীতা এগিয়ে চলেন দর্শনলালসায়। রাম-জানকীর চিরন্তনী প্রীতির কথা তো আর কেউ জানে না। সীতা

ভাবে যার কথা শুনে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়, নিশ্চয় সে-ই আমার প্রাণনাথ। দেবর্ষি এভাবের কথাই আমাকে বলেছিলেন।

সুমিরী সীয় নারদ বচন উপজী প্রীতি পুনীত।
চকিত বিলোকতি সকল দিসি জনু মৃগী সভীত॥
(রা, চ, মা—বাল ২২৯)

ভয়চকিত নেত্রে মৃগশিশুর মত তাঁর দৃষ্টি সঞ্চালন। অভিলাষ প্রিয় দর্শন।

উদ্যানবাটিকায় স্তব্ধ প্রভাতে সহসা কংকণ কিংকিণী ও নূপুরের ধ্বনি শুনে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলেন—ভাই, এ কি মধুর শিঞ্জন! মনে হয়, কামদেব তার দুন্দুভি বাজালেন। ফিরে চাইতেই দেখলেন, জানকীর মুখচন্দ্র। চকোরের লালসা নিয়ে রামের অপলক দৃষ্টি। মনে হয় 'নিমি' যিনি জনকেরও পূর্বপুরুষ তাঁর এই নবদম্পতির মিলনাবসরে লজ্জা হল তাই 'নিমি'—নিমেষাচ্ছাদন দূর হয়ে গেল। কবির ভাষায়—

ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল।
মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দৃগঞ্চল॥

সীতা-শোভা বর্ণনার মত ভাষা রামের নেই। শুধু হৃদয়ে তার প্রশংসা করা চলে। সৃষ্টির চাতুর্য দেখানোর জন্য ব্রহ্মা এই মূর্তি প্রকাশ করেছে। সুন্দরের সৌন্দর্যবর্দ্ধক ছবিগৃহে প্রদীপশিখার মত এই রূপ। উপমা দেওয়ার মত সামগ্রী এ সংসারে নেই। তুলনীয় সব কিছুই উচ্ছিষ্ট হয়েছে। নিরুপম সীতার রূপ। ভাই-এর কাছে রাম স্পষ্ট ভাষায় বলেন আমার মন কখনো পরনারী বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু সীতার প্রতি আমি আসক্ত। বুঝিতেছি এই সুন্দরী আমারই প্রিয়া হবেন। ভ্রমরের মত রামের মন সীতার মুখমকরন্দ পান করে।

রামের প্রতিটি অঙ্গশোভায় জানকীর দৃষ্টি সমাকৃষ্ট। আত্মহারা

সীতা সখীর বাক্যে চমকিত হন। বলেন—বড় দেরী হয়ে গেল; মাতা গালি দেবেন, চল বাড়ী যাই। মনে মনে পিতার প্রতিজ্ঞার কথা ভাবিয়া ক্ষোভ। তার অবস্থা লক্ষ্য করে এক সখী বলে—আজ চল আবার কাল এসময় এখানে আসা হবে। সীতা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে ভাবনায় রামকে হৃদয়ে ধারণ করে আবার পিতার অধীনতা ভাবনা করে ফিরে যায় গৃহে। পা চলে না—ফিরে ফিরে তাকায়; বলে—ঐ দেখ হরিণটি, ঐ দেখ কি সুন্দর পাখীটি! বাঃ, কি সুন্দর গাছটি! এইভাবে এটা ওটা ছল ক'রে প্রিয়তমকে দেখে আর প্রেমে উচ্ছসিত হয়। তাঁর শুধু ভাবনা—হায়, কঠিন হরধনুই আমাদের উভয়ের মিলনে প্রতিবন্ধক হবে। ভাবনায় তাঁর চিত্ত চঞ্চল। আশা পরাজয় মানে না। সীতা রামকে হৃদয়ে রাখলেন—তার ক্রমটি তুলসীদাসজী অনবদ্য ভাষায় বলেছেন—

লোচন মগ রাম উর আনি
দীন্‌হে পলক কপাট সয়ানী

এই চতুরতা সীতার ছিল। তিনি নয়নদ্বারে প্রিয়তমকে অন্তরে ধারণ করে চোখের পলক কবাট বন্ধ করে দিলেন। হৃদয়ে রাম রহিয়া গেলেন। সীতা পরম অনুরাগের রঙ্গে চিত্তপটে রামের মূর্ত্তি অঙ্কন করে নিলেন। গৌরীমন্দিরে ফিরে গিয়ে দেবীর সমীপে মনের বাসনা-পূর্তির প্রার্থনা নিবেদন করেন সীতা। দেবি, অন্তরের কথা তোমার অজানা নয়।

দেবী জানকীর বিনয় প্রার্থনায় সন্তুষ্ট। তাঁর মালা আশীর্বাদ খসে পড়ল। তিনি যেন হাসির সৌন্দর্যে সীতার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। স্পষ্ট ধ্বনি শুনা গেল দেবীর বাণী—

মনু জাহি রাচেউ মিলিহি সে বড় সহজ সুন্দর সাঁবরো
করুণা নিধান সুজান সীলু সনেহ জানত রাবরো ॥

তোমার মন যে রামে অনুরক্ত হয়েছে সেই রামকে তুমি লাভ করবে। তিনি দয়ার সাগর, সর্বজ্ঞ; তোমার প্রীতি রীতি তাঁর অগোচর নেই।

স্বয়ম্বরসভায় জানকীর শোভার তুলনা নেই। প্রকৃত নারীর কথা দূরে থাক, সরস্বতী মুখরা, পার্বতী অর্ধাঙ্গিনী, রতি অতনুপতির দুঃখকাতরা, বিষ ও বারুণীর সহোদরা লক্ষ্মীই বা কীরূপে জানকী তুলনীয় হবেন। অতএব অতুলনীয় সীতার রূপ।

গিরা মুখর তন অবধ ভঁবানী,
রতি অতি দুখিত অতনুপতি জানী।
বিষ বারুণী বন্ধু প্রিয় জেহী
কহিয় রমাসম কিমি বৈদেহী ॥

বাল্মীকি রামায়ণে সীতা কিন্তু বীর্যশুল্কা এবং দেবকন্যা-সদৃশী।

বীর্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্ (রা আঃ ৭১।২১)

রাজা জনক বিবাহসময়ে আরও বলেন—

ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা ॥

(রাঃ আঃ ৭৩।২৬, ২৭)

হরধনুভঙ্গসময়ে জানকীর অবস্থা তুলসীদাস বর্ণনা করে বলেন— সীতা রামকে দর্শন করে অত্যন্ত আকুল হয়ে দেবদেবীর সমীপে প্রার্থনা করেন। ধনুকের ভার লাঘব হউক! ভগবান, সকলকার অন্তর্যামী। আমার প্রাণের কথা বুঝে আমাকে রামের দাসী করে দিন। যাঁর প্রতি যাঁর সত্য প্রেম, তাঁর সঙ্গে অবশ্য মিলন হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, এ বিশ্বাস আমার আছে।

জে হি কে জেহি পর সত্য সনেহু।
সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহু ॥ (রাঃ চঃ মাঃ)

ধনুর্ভঙ্গ হল। চারিদিকে জয় জয়কার। সীতার সন্দেহ অপগত। তাঁহার সখীগণের কণ্ঠে মঙ্গলাচার সঙ্গীত। হংসগমনী অঙ্গশোভা ছড়ায়ে অগ্রসর হলেন। করকমলে জয়মাল্য। দেহ সংকুচিত, মনে পরম উৎসাহ। রামের নিকটস্থ হয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল। সখীর উপদেশে কোনোমতে দুই হাতে মালাটি তুলে ধরেন। সীতার অঙ্গ বিবশ। সঙ্গীতের সুরে কোনো অবসরে হাতের মালা রামের কণ্ঠের শোভা সম্পাদন করে। শুভযোগে দেববৃন্দ পুষ্পবর্ষণ করেন।

জানকীমাতার এই সুকুমার রূপ ছাড়াও আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় বনবাস-কথা প্রসঙ্গে রামায়ণে। মাতা কৌশল্যার মুখে সীতার কোমল স্বভাবের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। বনে পশু পাখী রাক্ষস কত ভয়। ছবিতেও বন্যপশু দেখে যে জানকী ভয় পায় সে আবার ভয়ঙ্কর বনে যেতে চায় এ তো কোনোমতেই শোভা পায় না। রামও অনেক করে বুঝান জানকীকে। কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে জানকী উত্তরে বলেন—

ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥
ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।

পতীর ভাগ্যে নারীই ভাগ্যবতী। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসে আদিষ্ট হয়েছি। পিতা মাতা পুত্র বা বন্ধু কেউ নারীর গতিবিধান করতে সমর্থ নয়, একমাত্র পতিই নারীর গতি। সীতাকে বনবাসের সঙ্গিনী করতে রাম ইচ্ছুক নন। কত করে বুঝালেন। বনের অনেক দোষ। সীতা বলেন—

যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥

হে রাম, তোমার সঙ্গে যেখানেই থাকি উহাই স্বর্গ, আর তোমা ভিন্ন সকলই নরক। আমার প্রাণের কথা তোমাকে বলিলাম।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। তুলসীদাসের ভাষায়—

প্রাণনাথ করুণায়তন সুন্দর সুখদ সুজান।
তুম্হ বিনু রঘুকুল কুমুদ বিধু সুরপুর নরক সমান॥

সীতার সমীপে রাম ভিন্ন স্বর্গও নরকতুল্য। এই দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। বনের পথে তৃণশয্যায় তমসাতীরে রাত্রিযাপনের পরেও সীতাকে সুমন্ত্রের সঙ্গে গৃহে ফিরিবার জন্য রাম অনুরোধ করেন। তখন সীতা যে কথা বলেন উহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

প্রভু করুণাময পরম বিবেকী
তনু ত্যজি রহতি ছাঁহ কিমি ছেঁকী।
প্রভা যাই কহঁ ভানু বিহাঈ
কহঁ চন্দ্রিকা চন্দ্র ত্যজি যাঈ॥

প্রভু! তোমাকে বনে রেখে ঘরে ফিরে যাওয়া যে একান্ত অসম্ভব। দেহকে ত্যাগ করে ছায়া থাকে, না সূর্য তার কিরণ ছেড়ে থাকে? কখনো শুনেছে জ্যোৎস্না চন্দ্রকে পরিত্যাগ করে গেছে? তবে আর কেন আমাকে গৃহে ফিরে যেতে বল?

মহাবাণী

বিক্রমাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহরিব্যাসজী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন গৌড় ব্রাহ্মণকুলে। ইনি নিম্বার্ক বৈষ্ণবাচার্য্যের সমীপে যথাকালে দীক্ষিত হইয়া মথুরাস্থিত আচার্যপীঠে অধিষ্ঠিত হন। 'আদিবাণী' যুগলশতক-রচয়িতা শ্রীশ্রীভট্টজি ইঁহার দীক্ষাগুরু। শ্রীরূপরসিক প্রণীত "হরিব্যাস যশোমৃত" এবং শ্রীস্বামিনী দাস কৃত 'শ্রীহরিব্যাস ছব্বীসী'তে আচার্য হরিব্যাসের গুণাবলীর সংগ্রহ

দেখিতে পাওয়া যায়। 'আচার্য চরিত' নামক পৃথক গ্রন্থেও ইহার সংক্ষিপ্ত চরিত্র বর্ণিত আছে। শ্রীনাভাজী বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থেও শ্রীহরিব্যাসের সম্বন্ধে বহু মহিমার কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা হইতে তিনি যে এক মহান্ বৈষ্ণব আচার্য ছিলেন এ বিষয়ে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষের শিষ্য মানুষই হয়। মানুষের শিষ্য গগনচর হয়, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার। ইহা কিন্তু গোপন কথা নয়, সকলেই অবগত আছেন শ্রীহরিব্যাসজীর কথা। ইঁহার সঙ্গে সর্বদা বহু বৈরাগী শ্যামস্নেহী অবস্থান করিতেন ইনি তাহাদের মধ্যমণি রূপে থাকিতেন। শ্রীভট্টের চরণধূলির প্রসাদে ইনি সব নতুন সৃষ্টি করিযাছেন। শ্রীহরি-ভজনের বলে তিনি দেবীকেও দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

"হরিব্যাস তেজ হরিভজন বল দেবীকো দীক্ষা দঈ" টীকাকার ঘটনাটির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ লালদাসের ভাষায় দেওয়া গেল—

চতুথাবল নামে যে এক গ্রাম আছয়।
ভ্রমিয়া শ্রীহরিব্যাস গেলেন তথায়॥

একবাগিচায় দেবী মণ্ডপ আশ্রয়।
সেইখানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয়॥

হেনকালে গ্রামী কোনো ইতর যে লোকে
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে
দেখিয়া শ্রীহরিব্যাস চমকিত হৈলা
জীবহিংসা দেখি বড় কাতর হইলা।
রুষ্ট হইয়া কিছু দেবীরে কহয়।
এ যে কর্ম তোমার উচিত কভু নয়॥
এতো ইতরের কর্ম নির্দয় যে হয়।

জগন্মাতা কেমতে হইতে চাহ তুমি।
বিষম দৃষ্টি না করে যে সভাকার স্বামী॥
তোমারে দেখি যে কারে অনুগ্রহ কর।
মাথা কারো কাটিয়া রকত পান কর॥

সাধুর কথায় দেবী লজ্জিত হইলেন। সাধু সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং গণসহ উপবাস রহিলেন। পরদিন দেবী নিজে মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া রন্ধনের জন্য অনুরোধ করিলেও সাধু বলেন, যেখানে পশুহিংসা হয়, সেখানে আমি ভোজন করিতে পারিনা। দেবী নিজে সাধুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মপরিচয় দান করেন। দেবীর দীক্ষার পর সেই গ্রামের অপ্রধান সকলেই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চিরদিনের জন্য জীবহিংসা ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গ হইতে হরিব্যাসের সাধনা ও সিদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

হরিব্যাস বিরচিত পাঁচখানা সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনা যায় (১) সিদ্ধান্ত রত্নাঞ্জলি, (২) অস্টযাম (৩) শ্রীনিম্বার্ক অষ্টোত্তর শতনাম টীকা (৪) তত্ত্বার্থ পঞ্চক ও পঞ্চ সংস্কার নিরুপণ গ্রন্থ তাহার রচিত। হিন্দী ভাষায় তাহার একমাত্র গ্রন্থ মহাবাণী।

শ্যামস্নেহীগণের সমীপে মহাবাণী মহামন্ত্রের মতই সমাদরণীয়। ইহার এই জাতীয় আদর প্রাপ্তির কারণও যথেষ্ট আছে। ক্রমশঃ ইহার পরিচয়ে বুঝা যাইবে সাধকের জীবনের সঙ্গে এই গ্রন্থের কি প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

মহাবাণী রচনায় উক্ত কবি হরিব্যাস শুধু তাহার সাধনার রসেই এই কাব্যকে সরস করিয়াছেন তাহা নয়, ইহার মধ্যে তাঁহার অপূর্ব কাব্যশক্তি ও নানাপ্রকার অলঙ্কার বিন্যাস চাতুর্য্যও প্রকাশিত হইয়াছে। একেতো বিষয়বস্তুর গৌরবে এই মহাবাণী সত্যই মহাবাণী, তাহাতে আবার কবির মহত্ত্বে ভাবের গাম্ভীর্যে এবং রসের প্রাচুর্য্যে ইহা সাধক

ও মরমীর রসসম্বেদনের পরম উপযোগী হইয়াছে। যাহারা রস-সাধনার উপকরণ সংগ্রহ বা ভাব পরিপোষণের নিমিত্ত এই গ্রন্থের দ্বারে উপনীত হইবেন তাহারা প্রতি পদে নব নব চমৎকৃতি লাভ করিয়া ধন্য ধন্য মনে মনে করিবেন। যাহারা শুধু একখানা কাব্য হিসাবেও ইহা পাঠে মন দিবেন, আমাদের বিশ্বাস তাহাদের চিত্তও অপ্রাকৃত রসের দিকে সমাকৃষ্ট হইবে। এই রচনার মধ্যে অপরের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কোনো আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা পাঠক বা শ্রোতার নিকট আকুল আবেদনময় যুক্তিজাল বিস্তারের ফল স্বরূপ কোনো গ্রন্থ নয়। কোনো বিশেষ মতবাদ শ্রোতার উপর চাপাইয়া দিবার কোনো ছলনা ইহাতে নাই। কোনো বিষয়বিশেষের চমৎকার-পূর্ণ বর্ণনায় শ্রোতার চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা ইহাতে নাই। আছে শুধু স্বানুভব চমৎকৃতি, আছে আকূতি আর দৈন্য। ইহার প্রতিটি পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে হরিব্যাসের অন্তরের বিশাল প্রেমের উচ্ছ্বাস। এই প্রেমোচ্ছ্বাসে কবি ডুবিয়া গিয়াছেন। তাহার ব্যক্তিত্বের কোনো চিহ্ন কোথাও প্রধান হইবার সুযোগ পায় নাই। যে চমৎকৃতি অনুভবানন্দ ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে উহাতে যুগল ছবিটি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, দূর হইতে একান্ত নিকটতম রূপে গ্রহণ করিবার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

মধুর শব্দাবলীর বিন্যাসে বিরচিত মহাবাণী রচনায় কবির কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রচার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ছিল বলিয়া কেহ বলিতে পারেন না। ইহার মধ্যে পাওয়া যায় প্রাণের সম্বেদন। যাহারা এই রচনা হইতে তাহার দার্শনিক মতবাদের ধারা আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা করেন তাহারা একেবারে হতাশ হইবেন বলিয়া মনে হয় না। সাধক-শ্রেষ্ঠ হরিব্যাস যে পদটি রচনা করিয়াছেন উহাই তাহার সাধন জীবনের ক্রমপ্রাপ্ত অনুভূতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই কোনো সময় অপ্রাসঙ্গিক বা ক্রমবিরুদ্ধ কোনো কথা তাহার রচনায় দেখা যায় না।

আর তাহা হইবেই বা কেন ? এই রচনাতো প্রাকৃত কবিকল্পনা নয় ? ইহা যে সেই যুগল কিশোরের নিত্যসিদ্ধ প্রিয়পাষদের সাধকভাবানুসারে অবস্থিত স্বরূপে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমের বিশুদ্ধ প্রেমপ্রেরণায় নিত্য-লীলার প্রতিধ্বনি। ইহা যে তাহার অনুগজনের চির আস্বাদ্য। অর্ন্তমুখী ভাব ভিন্ন এই গ্রন্থের আলোচনা অনুরাগ বৃদ্ধির প্রতিকূলও হইতে পারে, হয়তো এজন্যই এই বাণী সাধারণের নিকট হইতে গোপনে অতি সযত্নে শুধু মরমী সাধকগণের জন্যই পৃথক করিয়া রাখা হইত। অনধিকারীর হাতে পড়িয়া পাছে এই সাধনার অমূল্য সম্পদের অমর্য্যাদা হয়, তাই পরম করুণ হইলেও সাধুগণ অতি সন্তর্পণে এই গ্রন্থের বিচার করেন।

শ্রীশ্রীভট্টের আদিবাণী যুগল শতকে পাঁচটি সুখ নামক ভাগ আছে। সেই গ্রন্থে বর্ণিত লীলাস্বাদন চমৎকৃতির অনুসরণ বলিয়া মহাবাণীতেও পাঁচটি বিভাগ। (১) সেবা (২) উৎসাহ (৩) সুরত (৪) সহজ (৫) সিদ্ধান্ত এই পঞ্চমুখে মহাবাণীর পদগুলির রচনা।

যুগলশতকে শ্রীভট্ট অতি সাধারণভাবে লীলা প্রবেশের সঙ্কেত করিয়াছেন। মহাবাণীতে মনে হয়, সেই যুগল শতকের রস বিস্তার হইয়াছে। গুরু ও শিষ্যের গ্রন্থের মধ্যে এই যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ইহাই 'আদিবাণী' ও 'মহাবাণী'র বৈশিষ্ট্য। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধুরা মহাবাণীকে যুগল শতকের ভাষ্য বলিয়া মনে করেন এবং স্বরূপত ইহা বলা অযৌক্তিক নয়।

যুগলশতকে ব্রজরস প্রকটলীলার মহামাধুর্য্য উপবর্ণিত। সাধক-গণের মতানুসারে বলিতে হয়, মহাবাণীতে নিত্যবিহার বর্ণিত। ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণ বহু জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। তাহারা ভৌম বৃন্দাবন ও নিত্য বৃন্দাবন গোলোক এই দুই অবস্থিতির মধ্যে খুব সূক্ষ্ম এক বিশেষত্ব দর্শন করেন। অনেকের মতে ভৌম-বৃন্দাবনে কিন্তু প্রাকৃত কিছু অপ্রাকৃত, এই উভয় ভাবের সংমিশ্রণহেতু

গোলোক বৃন্দাবনের বা নিত্যধামেরই উৎকর্ষ। আবার কাহারও মতে ভৌমবৃন্দাবনেই পরমোৎকর্ষ প্রকাশ হইয়া অন্যত্র যে ভাবের রসের ক্রমবিকাশ সম্ভব নয়, প্রাকৃত লোকে সেই ভাব ও প্রেমের উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব ভৌমবৃন্দাবনেরই অপ্রকট প্রকাশ নিত্য-বৃন্দাবন অতএব ভৌমলীলারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। এ সকল তথ্য ভাবুক রসিকগণ বিচার বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের আরাধ্য তত্ত্ব নন্দনন্দনকে যে ভাবে বিবেচনা কবিযা তাঁহাদের আরাধ্য তত্ত্ব নন্দ-নন্দনকে যে ভাবে ভাবনা কবিযা আনন্দ লাভ করেন করিবেন। আমরা শুধু দেখিব মহাবাণীতে কিভাবে সেই চিরনবীন যুগল কিশোরের মিলন মাধুরী উপবর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীহরিব্যাসজী বর্ণিত দিব্য চিন্ময শ্রীবৃন্দাবন ধাম এবং গোলোক বৃন্দাবন স্বরূপত অভিন্ন হইলেও ভিন্ন। এই ধাম দিব্যমহিমায অপরিসীম। প্রাকৃত লোকের ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আশ্চর্য তাহার রূপ, পরম ঐশ্বর্য তাহার সম্পদ। সুখসার সেই ধাম, তাহার প্রাপ্তি শুধু কৃপাসাধ্য। কোনোরূপ পরিমাণ দ্বারা নিরূপণ করা অতিশয কঠিন সেই যুগল কিশোরের নিজধাম। সেখানেই সচ্চিদানন্দ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বর অব্যয পুরুষ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য পরমাশ্রয সর্বেশ্বর নিজশক্তি হ্লাদিনীরূপা শ্রীরাধা সহিত নিত্য বিরাজ করেন। ধাম বর্ণনা যথা—অখিল অণ্ড বৈরাটকে আট সব মহাবৈরাটকে রোমকে কূপ। সাবকাশে উড়ত রহত নিত সহজহী পরমৈশ্বর্য্য আশ্চর্য্যময় রূপ॥ সো প্রথম একহী শূন্য মধিসনিরয়্যো জৈসে ত্রিসরেণু কো রেণু শত অংশ। যাতে দস দস গুণী সহস্র শত শূন্য পুনি তিনতে লখ সহস্র মহাশূন্য অবতংশ। তিন মহাশূন্যকে চিখরপর তেজকৌ কোটি গুণতে গুণৌ অতি অমিত বিস্তার। তহা নিজধাম বৃন্দাবিপিন জগমগৈ দিব্য বৈভবনকো দিব্য অপার॥

শ্রীরাধা স্বয়ং কৃষ্ণ কর্তৃক আরাধিতা সেইজন্য তাহার নাম রাধা।

শ্রীরাধার রূপেরই বিলাস অন্যান্য গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রেয়সী বর্গ। একাত্মা হইয়াও রসসাগর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে বিহার করেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সনাতনী বিদ্যা প্রাণস্বরূপ। দিব্য চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন ধামে আপন শক্তি হ্লাদিনী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিশিদিন নিত্যবিহার রস শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবিহারী।

মহৎবাণী মন্ত্র। মহাবাণী মন্ত্রার্থ প্রকাশ। উহা আদি বাণীর ভাষ্য। আদি বাণীর মধ্যে "অকার প্রতিপাদ্য "হরির" বাণী। হরির পরম শ্রেষ্ঠমন্ত্র পঞ্চপদযুক্ত। উহা তন্ত্র ও বেদসম্মত। গৌতমীয় তন্ত্র ও গোপাল তাপনীয় শ্রুতি সেই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চপদ হইতে 'পঞ্চ সুখ' রচনা।

প্রথম সুখের নাম সেবা সুখ। হরিব্যাসজী এই সেবা সুখাদি মহাবাণীতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই 'সখীনাম রত্নাবলী' পাঠের নির্দেশ দিয়াছেন। এই সখীনাম রত্নাবলী সংস্কৃত শ্লোকমালা। ইহাতে ৩৬টি শ্লোক আছে। মহাবাণীর মঙ্গলাচরণ বলিয়া এই শ্লোক নিত্যস্মরণীয় ও নিত্যপাঠ্য।

সখীনাম রত্নাবলী, স্তোত্রপাঠ তই কীজ
পুনি গুরু সখিন কৃপাজু লহি যুগল সেবা চিত্ত দীজ॥

স্তোত্রটি শ্রীরাধাকৃষ্ণ মহিমা ও সখীগণের রূপ ও সেবা বর্ণনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অকুণ্ঠমেধা রাধার অধর সুধা সাগরে নিত্যবিহারশীল। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপা কৃষ্ণও রাধাস্বরূপ। নিকুঞ্জবনে তাঁহাদেরই কলাত্মা গুরুরূপে অবস্থান করেন। আমি তাঁহাকে বন্দনা করি।

রাধা কৃষ্ণ স্বরূপাং বৈ কৃষ্ণং রাধা স্বরূপিণম্।
কলাত্মানং নিকুঞ্জস্থং গুরুরূপং সদা ভজে॥

নামোল্লেখ করিয়া শ্রীরাধার সখীগণের প্রতি প্রীতি ও নমস্কার নিবেদন করিলেও বিশেষভাবে রঙ্গদেবীর প্রার্থনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এই স্তোত্রমণ্ডলে। শ্রীগুরু শ্রীহেতু: সহচরী প্রেমরস-রঙ্গে

প্রিয় যুগলকিশোরের নিত্যসঙ্গিনীরূপে সেবার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। তাহার কৃপা ভিন্ন কেহ যুগল সেবায় প্রবেশ করিতে পারে না। তবে সখীর ভাব গ্রহণ না করিলে কুঞ্জে স্থান পাইবে কেমন করিয়া? সকালবেলা নিদ্রাভঙ্গের পর মোহনের মন্দিরের আঙ্গিনায় যেখানে সখীসমাজ সেবার অপেক্ষায় আছেন সেখানে যাও। শুনিবে মধুর গানের সঙ্গে বীণার ধ্বনি হইতেছে। ঐ শুন রাগ ভৈরবে সঙ্গীত—

জয় মৃগনৈনী রাধিকে রঙ্গরঙ্গোলী বাল।
গৌরী কঞ্চনবেলি জ্যো লপটি শ্যাম তমাল॥

যেমন হরিণ নয়না রাধা তেমনি রঙ্গীয়া শ্যাম। রাধা স্বর্ণলতা, শ্যাম তমালকে জড়াইয়া আছে।

লপটি রহী লালজুকে ললিত অঙ্গ সোহনী।
তরু তমাল কনকবেলি ছবি বিমোহিনী॥

শ্যামগৌরীর মাধুরীতে মগ্ন হৃদয় শ্রীহরিব্যাস আর সেই প্রসিদ্ধ আচার্য ভাবে নাই। কুঞ্জে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম হইয়াছে শ্রীহরিপ্রিয়া।

তাই তিনি বলেন, স্বভাবত সোহাগিনী গর্বিতা গৌরী কিশোরী শ্রীহরিপ্রিয়া।

সহজহী সুহাগভরী গরবীলী গৌরী।
জীবনধন হিতুকী শ্রীহরিপ্রিয়া কিশোরী॥

নিজের সিদ্ধ শ্রীহরিপ্রিয়া নামটিকে সুকৌশলে ছন্দে প্রকাশ করিলেন যাহাতে উহা শ্রীরাধাকেও বুঝাইতে পারে। প্রতিগানের পদে এই হরিপ্রিয়া নামটি বিচিত্রভাবে জড়িত করিয়াছেন এই সেবানন্দী সাধক। সখীভাব গ্রহণের আবেগ, আদর্শ এবং প্রয়োগ এই সাধকের জীবনে প্রতিপদে রূপায়িত হইয়াছে। গুরু শ্রীভট্টাদেবাচার্য্য এই

সাধক সম্প্রদায়ে যুগলকিশোর সেবানিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সখীগণের মধ্যে শ্রীরঙ্গদেবীর যূথে শ্রীহিতূ সখীর অবতার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। যূথেশ্বরী রঙ্গদেবীর প্রধান অষ্টসহচরী যথা— (১) কলকণ্ঠি (২) শশিকলা (৩) কমলা (৪) কন্দর্পা (৫) হিতূ (৬) কামলতা (৭) প্রেমমঞ্জরী (৮) প্রেমদা। ইহাদের পঞ্চম "হিতূর"র অবতার হরিব্যাসের গুরু শ্রীভট্টদেবাচার্য্য। হিতূর অনুগতা "অলবেলী" বা আলী দাসী যথাক্রমে মহামোহনী মানবতী, মণিমঞ্জরী, মধুরপ্রভা বিমলনী, বারিজমুখী, কলবৈণিকা ও শুচিসৌরভা এই আটজন। হরিব্যাস নাম পাইয়াছেন হরিপ্রিয়া। ইহা তাঁহার গুরুদেব প্রদত্তই হইবে।

সখীমঞ্জরীর অনুগত সাধনক্রম ও সিদ্ধপ্রণালীর ব্যবহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদাযেও প্রচলিত রহিয়াছে। এই সাধনক্রমই এই সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাধন। প্রধান অষ্টসখীর অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি নামগুলি উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে অবিকৃতই আছে। তবে তাহাদের মধ্যে প্রাধান্য বিচারে শ্রীহরিব্যাসজী শ্রীরঙ্গদেবীকেই সেই যূথেশ্বরী-গণের প্রধানা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে উত্তর দিকে অবস্থিতা শ্রীললিতারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের অনুগত সহচরীগণের নামের মধ্যে উভয় গোষ্ঠীতে অমিল যথেষ্ট আছে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তথাপি সখী সহচরী মঞ্জরীর অনুগতভাবে প্রধানা যূথেশ্বরীর আনুগত্যে অষ্টযাম সেবা করিবার যে রসপুষ্ট ক্রম ইহাতে কিন্তু যথেষ্ট মিল আছে। এই দিক দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণ অগ্রসর হইযা পরস্পরের সহিত ভাব রসের আদান-প্রদানে যুগলকিশোর ভজন সেবনে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া মিলনের পথ সুগম করিয়া তুলিতে পারেন। সম্প্রদায় নিষ্ঠার অজুহাতে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি না করিয়া উভয় গোষ্ঠীর নবীনেরা পূর্বোক্ত কথার সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমার শ্রম সফল বলিয়া মনে করিব।

রসিকবর বিহারীলালের জীবনাধার রসময়ী যেমন শ্রীরাধা তেমনি সুকুমারী তাঁহার আলীসখীগণ। ইঁহাদের মাধুর্য্য অফুরন্ত। প্রিয়তম সঙ্গে নিশিজাগরণ করিয়া রসাস্বাদন হইলেও তৃপ্তি নাই। কোন্ অঙ্গের কি বর্ণনা বা তুলনা দিব হরিপ্রিয়া শুধু দাসী হইয়া সর্বদা সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছা করে। সারারাত ক্রীড়ারত থাকিয়াও যাঁহার অন্তরে অধিক উচ্ছ্বাস বর্তমান এরূপ নবকিশোর সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।

সব নিশ বীতি খেলমে তউ উর অধিক উমঙ্গ।
ঐসে নবলকিশোর বর, হিয়রে বসো অভঙ্গ॥

পলে পলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। কত হাব ভাব কত কটাক্ষ ভঙ্গি। শ্যামনাগর কিশোরীর অঙ্গে অঙ্গে নয়নবাণ বিদ্ধ করেন। যাহার প্রতি তাহার লালসা তাহাকেই তিনি আকর্ষণ করেন। সুখময় আসনে বসিয়া তিনি আদেশ করেন, আর সখীগণ তাহার সেবা করেন। তাহার গলায় মোতির মালা, অরুণচরণ কমল, নখরমণিতে চন্দ্রবিম্বের মত শোভা। হরিপ্রিয়ার নয়নে পলক পড়ে না।

প্রিয়াবদন সুখমা সদনে রচিয়ো প্রেমপরিপূর।
জামধি জীবন প্রাণকো সরবস জীবনমূর॥

প্রিয়ার বদন সুখের আধার। উহাতে প্রেম পূর্ণ হইয়া আছে। জীবনের জীবনসর্বস্ব প্রাণরসের মূল উহাতে আছে। সুখসার অধর সুধাপানে তৃষ্ণাতুর নাগরের পলে পলে অপার প্রেম বৃদ্ধি হয়। রঙ্গিণীর বদনে আর সুন্দর দন্তপংক্তিতে অপূর্ব সৌন্দর্য্য। হাসিতে যে মাধুরী উহা কন্দর্পেরও মনোহরণ করে। গৌরবর্ণ গণ্ডস্থল, মধ্যস্থলে রক্তিমাভা। মনে হয় যেন সম্পূটে অনুরাগ ভরিয়া রাখা হইয়াছে। চিবুকে কৃষ্ণকস্তুরীবিন্দু কর্ণে কুণ্ডল ও নাসায় সুন্দর বেশর। খঞ্জনের গর্ব খর্বকারী সুঅঞ্জন অঞ্জিত সুন্দর নয়নশোভা। তাহাতে বঙ্ক ভ্রু-যুগলের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। চিক্কণ চিকুরে নাগরের স্বহস্ত

বিরচিত বেণী সকল সুখের বিস্তার। দুঃখাপহারিণী মনোহরা নবযৌবনসম্পন্নাকে দর্শন করিয়া সহচরী হরিপ্রিয়া আনন্দে বলিহারী বলিতেছে।

শ্রমকণ বন তন বনি রহে গহে লাড় গম্ভীর।
বিহরত সেজ বিহার বিবি সুরতিসমর রণধীর ॥

কিশোরযুগল কামকলা সমরে সুনিপুণ। দেহ ভুলিয়া শয্যায় বিহার করেন। সর্বশরীরে স্বেদবিন্দু। মগ্ন মন। ধনী যেমন ধনহারা। অনঙ্গ রঙ্গে সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত। বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। অমৃতধারা বর্ষণ হইতেছে। তৃষিত ব্যক্তি পান করিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। অসীম অধীরতা, কিশোরীর লালসার সীমা নাই। দেখিয়া হরিপ্রিয়া আনন্দিত।

মনচীতে কারজ ভয়ে রণজীতে জুগপাল।
উরঝি রহে অঙ্গ অঙ্গ যোঁ কঞ্চন বেলি তমাল ॥

রঙ্গিয়া রঙ্গিণী, চতুর চতুরিণী, রসিক রসিকা শোভা পাইতেছেন। রতিরণে উভয়ে জয়লাভ করিয়াছেন। মনোভিলাষ সকলই পূর্ণ হইল। স্বাভাবিক ভূষণে সজ্জিত হইয়া রসে ডগমগি হইয়া বেশ উজ্জল রূপ ধারণ করিলেন। মনে হয়, কাঞ্চনলতা তমালকে পরিবেষ্টন করিল। শ্রীহরিপ্রিয়া সখীগণের সহিত দর্শন করে।

লাল ভামতে জীয়কে লসো বসো হিয় ঠাম।
শ্যামা সহজ সনেহনী সহজসনেহী শ্যাম ॥

সহজ প্রেমিক-প্রেমিকা রাধাশ্যাম, ইহারা কোটি কামকে মোহিত করেন। প্রতি অঙ্গে অতি সুন্দর জ্যোতি। দু'জনেই রাত্রি জাগিয়া কাটায়। শ্যাম শ্রীরাধাকে ভাবনা করেন। রাধা শ্যামকে ভাবনা করেন। হরিপ্রিয়ার হৃদয়ে দুজনের রূপ বিলাস করুক।

প্যারী জীবন প্যারে কী প্যারো প্যারী প্রাণ।
রঙ্গমহলমে বিলসহী দোউ এক সমান ॥

শ্রীরাধা শ্যামের জীবন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার জীবনাধার। রাধা শ্যামের গলার মালা। শ্যাম রাধার বক্ষের রত্নহার। রত্নমন্দিরে রাধাশ্যাম আনন্দে বিহার করেন। শ্রীহরিপ্রিয়া সকল সুখের সারস্বরূপ দর্শন করিয়া উল্লসিত হয়।

কুঞ্জ ভবনমে করত দোউ সুরত রঙ্গ রতিকেলি।
উরঝি বহে সুরঝত নহী তন তন মন মন মেলি॥

কুঞ্জ ভবনে নিত্য নব নব কেলি। রতিরসের উল্লাসে রসিক ও রসিকা দম্পতি সুখাস্বাদন করেন। তু'জনে দেহ মনের মিলনে আত্ম-হারা হইয়া থাকেন। সখিসহিত শ্রীহরিপ্রিয়া উহা দর্শন করিয়া তৃপ্তি-লাভে অসমর্থ হইয়া তৃষ্ণাতুর হইয়া রহিল।

সুরতি রঙ্গকে রঙ্গমে রহে রঙ্গি অঙ্গ অঙ্গ।
অদ্‌ভূত আজ বিরাজহী প্যারী প্রীতম সঙ্গ॥

তুজনেই সুরতরঙ্গে রঙ্গী। রাধাপ্যারী প্রিয়তম সঙ্গে বিরাজিত। তুজনেরই শোভন ভূষণ বসন আনন্দরঙ্গে শিথিল হইয়া অঙ্গচ্যুত। শ্রীহরিপ্রিয়া শ্রীহিতূ সখীকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে অধিক উৎসাহ অনুভব করিতেছে।

অঙ্গ অঙ্গ বস হ্বৈ রহে যত্তপি শ্যাম সুজান।
তত্তপি পীবত প্যারসোঁ অধর সুধারস পান॥

প্রিয়তম শ্যাম প্রিয়ার অধর সুধা পান করেন। সুখরঙ্গে প্রিয়ার সর্বাঙ্গ শিথিল হইল। শ্রীহরিপ্রিয়ার স্বামিনী উদার যশ বর্ণন করেন।

আরস তজিয়ে জাউঁ বলি লগী তুরহরী হোন।
ত্যোঁ ত্যোঁ পৌঢ়ত তানিপট বানি পরী যহ কৌন॥

এ বড় বিচিত্র কথা, কাহাকেই বা বলি। ভোর হয়, আর বস্ত্র টানিয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। অরুণ উদয় হইল। আলস্য ত্যাগ

কর। রাত্রি রতিরসে শেষ হইয়া গেল। শ্রীহরিপ্রিয়ার প্রাণধন-জীবন সকল সুখের খনি।

সুনি সহচরীকে বচনপ্রিয় উচী সুরত সুখ লূটি।
সঁভরি সেজতে সুভট জে্যা বিজয়ী হোয় বধূটি॥

সুরতসুখ লুটিয়া সহচরীর প্রিয়বাক্য শুনিয়া বসন-ভূষণ সামলাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। কাঁচুলী শিথিল, আলুলায়িত কেশ, শ্রীহরিপ্রিয়া স্বামিণী সুরতসমরে শ্যামকে পরাজিত করিয়াছেন।

সবনিশি লুটী সুরত সুখ প্রাণপ্রিয়া হরি সঙ্গ।
ভাগ সুহাগ সচী রচী রসিক রবণকে রঙ্গ॥

রসিক রমণের রঙ্গ রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধা রসময়ী অতুলনীয় তাহার অঙ্গ। শ্যামভামিনীর অন্তরে অভঙ্গ অনুরাগ। তাহার ভাগ্যও সোহাগপূর্ণ। তাই সারারাত্রি শ্রীহরির সঙ্গে সুরতসুখ লুণ্ঠন করিয়াছেন।

জয় নবরঙ্গ বিহারিণী নববাসা সুখকারি।
জয় শ্রীহরিপ্রিয়া স্বামিনী শ্রীরাধে সুকুমারি॥

নবরঙ্গ বিহারিণী তোমার জয় হউক। তুমি নব বস্ত্রধারিণী, সুখ-কারিণী, নবকেলি পরায়ণা, বিশ্বানন্দ বিধায়িণী, শ্রীবৃন্দাবনের রাণী, পরম উত্তম সুখদায়িণী, শ্রীমুখ অদ্ভুত শোভা; নিজ বিলাসরস ভোগ-কারিণী, প্রিয়তম শ্যামের প্রিয়া, সরস উজ্জ্বলরূপধারিণী, গুণাশ্রয়া মধুর রসের আশ্রয়ভূতা, অনুপমা, সহজ মঙ্গলরূপা, মোহন মনোহারিণী, পদ্মার প্রাণধার, হ্লাদিনীরূপা, শ্যামের সকল সুখদায়িণী, শ্রীপ্রিয়বল্লভা রাধা, শরৎকালীন সবসুখসাধিকা, নিত্য নবরূপা, পরমকৃপাস্বরূপিণী, সকল সুখের ধামরূপা, দেবী-দেবীকা নাম লাবণ্যরূপা, সুন্দরী সদ্বেশ-ধারিণী, কোকিল কাকলি-মধুরবচনী, পদ্মাস্তসুখদায়িনী, গুণরূপ গম্ভীরা, ইন্দিরার মনোহারিণী, অভিনব সুন্দরী, সখীগণ মোহিণী, আনন্দরূপা, সখীগণের সুখাশ্রয়, মোহনের মনোহারিণী, সুখরূপা কৃষ্ণপ্রিয়া।

নৈনন নৈন মিলাবহোঁ কহি কহি বৈন রসাল।
রসিকনকো ধন সহজ দোউ লাড় লড়ীলে লাল॥

যুগলকিশোর কিশোরী পরস্পর মধুর সম্ভাষণ করেন। তাহাদের কত অনুরাগ আর কত সোহাগ। সেই সময় কোটি কোটি অনঙ্গের রঙ্গ উভয়ের অঙ্গে অঙ্গে ঝলক দিয়া যায়। মনোমোহন ও মনোমোহিনী শ্যামল ও গৌরকান্তি ধারণ করেন। শ্রীহরিপ্রিয়া বলেন, যুগলকিশোর রসিক জনের পরম সম্পদ।

নিজ সহচরী উভয়কে বলিয়া স্নানকুঞ্জে লইয়া আসিলেন। মণিময় স্নান বেদীতে উভয়ে বসিলেন। অঙ্গ মার্জনে সুগন্ধি দ্রব্য সুগন্ধি জলে স্নান। কোমল অঙ্গ মৃদুভাবে মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করানো হইল। শিঙ্গার করার পর শ্রীহরিপ্রিয়া দুজনের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

শিঙ্গারকুঞ্জে সহচরীসহিত যুগলের আগমন হইল। চরণে সুন্দর পাদুকা। কত বর্ণের আভরণ ভূষণ ধারণ করিয়া যুগল সিংহাসনে বসিলেন। দেখিয়া দেখিয়া সখী বলেন, আজ কি সুন্দর সাজে সাজিয়াছেন। চরণের নখ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত সাজিয়াছে। দর্পণ ধরিয়া দেখাইতেছে, আজ কিরূপ সুন্দর সজ্জা হইল। শোভা দেখিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠে। শ্রীহিতু ও দাসী শ্রীহরিপ্রিয়ার জীবনাধার বিরাজ করিতেছেন।

ভোগের সামগ্রী সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রেমপুলকিত অঙ্গে দুজনে ভোগের জন্য সোনার চৌকীতে বসিলেন। সহচরী থালা ভরিয়া ভোজন দ্রব্য আদরপূর্ব্বক সম্মুখে রাখিলেন। দুজনে পরস্পর প্রংশসা করিয়া সেই দ্রব্য আস্বাদন করেন। ভোজনের পর আচমন। ইহার পর তিলক রচনা। মুখ শোধনের জন্য তাম্বুল অর্পণ। আচমন করাইবার সময় ঝাড়ী হাতে হিতুর দাসী কত আনন্দই না অন্তরে অনুভব করেন। বিশাখা মুখবাস

তাম্বূল প্রদান করিলেন। শ্রীললিতা ভোগ লাগাইলেন। শ্রীহরিপ্রিয়া ললাটে তিলক রচনা করিয়া আরতির সাজ সাজাইতেছে।

সজি লাঈ আরতি সখী অগ্রবর্ত্তি কর দীয়।
অদ্‌ভুত রীতি উতারহোঁ নিরখি ছবিবীয়॥

কি সুন্দর আরতি সাজ হইয়াছে। মনে হয়, মূর্ত্তিমান শোভা। সেই স্বর্ণথালার সৌন্দর্য্য আর কি বলিব। অতি সুন্দরভাবে আরতি করা হইল। সুন্দর উদার যুগলরূপ দর্শন করিয়া শ্রীহরিপ্রিয়ার অঙ্গে অঙ্গে পুলক ও হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছলিত।

যুগলকিশোর এই ভাবে সকল সখীকে আনন্দে ভাসাইয়া স্বচ্ছন্দে কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে বিহার করেন। হংসের মত গতি। দুলিয়া দুলিয়া বাঁকানয়নে দৃষ্টি এদিক্‌-ওদিক্‌ এপাশে-ওপাশে। সখারা যুগলের মুখচন্দ্রামৃত আস্বাদন করিয়া চলে। কেহ চামর, কেহ অন্য দ্রব্য, সেবার জন্য হাতে লইয়া অনুসরণ করে। শ্রীহরিপ্রিয়ার হৃদয়ের আনন্দদায়ক সুন্দর বিহার। কুঞ্জবিহারি শ্যাম কুঞ্জবিহারী সহ আনন্দে কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করে। অমৃতময় বিহার কুঞ্জের অমৃত পান করিয়া যুগল জলে স্থলে সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বিহার করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে যুগল ভোজনকুঞ্জে আগমন করিলেন। হিতূর সহচরী অত্যন্ত আদর করিয়া দুজনকে অভিনন্দিত করেন। বিধিপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অঙ্গে অঙ্গে হেলাহেলি করিয়া বসিলেন। শ্রীহরিপ্রিয়া বিবিধপ্রকার রুচিজনক ভোজ্যদ্রব্য সাজাইয়া দিলেন। যুগল নিজ নিজ রুচি অনুসারে সেই রসাল পরিবেশিত ভোজ্য ভোজন করেন। রত্নখচিত সোনার চৌকীর উপর থালা ভরিয়া ভোজ্য দ্রব্য দিয়াছেন। সংখ্যা কি করিব? ছাপ্পান্নভোগ ছত্রিশ প্রকার ষড় রসযুক্ত লেহ্য, চোষ্য, ভক্ষ্য ও রসাল ভোজ্য দ্রব্য।

রতন জটিত কঞ্চন চৌকীপর আনি ধর্‌য়ো সহচরি ভরিথাল।
ছপ্পনভোগ ছত্তীসো ষট্‌রস লেহ্য চোষ্য, ভক্ষ্য ভোজ্য রসাল॥

যেটি ভোজন করেন প্রশংসা করেন। করপল্লব স্পর্শে প্রতিটি ব্যঞ্জন মধুরতর হইয়া উঠে। এইভাবে রাজভোগ সম্পন্ন হয়। শ্রীহরিপ্রিয়া পরমপ্রবীণ প্রেমপ্রতিপালক যুগলের ভোজন দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, আচমনের পর হরিপ্রিয়া তাম্বুলবীটিকা প্রদান করে এবং শ্রীহিতূর আনন্দবর্দ্ধক আরতি করে। আরতি দেখিয়া সখীগণের নয়নে প্রেমঅশ্রু ভরিয়া উঠে। অত্যন্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া অধীর ভাবে 'জয় জয়' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে।

'জয় জয় অলকলড়ে সুকুমার জয় জয় নিত্যকিশোরী'

জয় জয় রাধারাণী, তুমি যে মোহনের বক্ষের মালারূপা।

পরস্পর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া হংসের গতিকে—হাতীর গতিকে হীন প্রমাণিত করিয়া এই ভাবে চলিতে চলিতে শ্রীশ্যামসুন্দর রাধাপ্যারীকে পরিশ্রান্ত অনুভব করিয়া তাহার মুখের উপর নিজের মুকুটের ছায়া প্রদান করিতেছেন। দুজনে সুখাসনে বসিলেন। মধ্যদিবসে প্রেমমত্ত শ্যাম ও প্রেমোন্মাদিনী রাধাকে দেখিয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষগণ জয় নমো বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিল।

জয় নমো রাধা রসিকনী; জয় নমো মৃদু মধু মুসকনী।
জয় নমো প্রীতম বল্লভা; জয় নমো প্রনতন সুল্লভা।

রসিকা, মৃদুহাসিনী, প্রিয়তমের বল্লভা, প্রণতের সুলভা রাধার জয় হউক। রাধাকে প্রণাম করি। প্রিয়ের মনোরঞ্জনী, বিরহ বিভঞ্জনী, প্রেমপ্রবাহিনী, রতিরস জ্ঞানদায়িনী, সকল সুখের সাগর, সকল গুণের আধার, অদ্ভুত সুন্দরবদনী মনোহারিণী রাধাকে নমস্কার। চন্দ্রপ্রভাহারিণী, প্রেমপরায়ণী, কোকিলনিনাদিনী, ভবভয় ভঞ্জনী, তাম্বুল চর্ব্বণশীলা, গুণগণ গর্ব্বিতা, প্রবালের মত রক্তিমাভ ওষ্ঠশালিনী, সুচারুদর্শনা, সুন্দর নাসিকা, প্রিয়বন্ধনকারিণী রাধার জয় হউক। নাকে নথ, প্রিয়ের মনোহারিণী, নয়নে কটাক্ষ, রসালরূপ, কজ্জল অঙ্কিতা, খঞ্জন গঞ্জনকারিণী, কৃষ্ণবীক্ষিত আতুরা রাধা, কৃষ্ণদর্শনে চতুরা রাধা,

ভ্রূভঙ্গী শোভনা, প্রিয়মনোমোহিনী, কর্ণে তাটঙ্কধারিণী, কুঞ্চিতকুন্তলা শ্রীহরিপ্রিয়ার স্বামিনী রাধার জয় হউক।

শ্রীহবিপ্রিয়া স্বামিনি প্রণমি পুনি প্রণমো পিয় প্রান।
কমলনৈন শ্রীকৃষ্ণ কহি বরনোঁ বিবিধ বিধান ॥

শ্রীরাধা হরিপ্রিযার স্বামিনী। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রাণ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণনাম বলিয়া বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করি।

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণাযাকুণ্ঠমেধসে।
রাধাধরসুধাসিন্ধৌ নমো নিত্যবিহারিণে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অকুণ্ঠ মেধা। নিত্য তাঁহাব বিহার শ্রীরাধার অধরামৃতসিন্ধুতে। তাঁহাকে নমস্কার।

যাঁর কণ্ঠে মণিহার, যিনি মনোহারিণী লজ্জাশীলা, গৌরবর্ণা, চতুরা, কুমারী, তপ্তস্বর্ণাভা মুগ্ধা স্নিগ্ধা বিদগ্ধা ও সন্দিগ্ধা, দেবর্ষির আনন্দদায়িনী, নূপুরসিঞ্জিতপদযুগলা, হংসীর গতি, খঞ্জনয়না পীনস্কন্ধা কাঞ্চনকঙ্কণশোভিতা, চামরসেবাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী, সেই রঙ্গদেবীকে সদা ভজন করি।

হারিণীং হারিণীং হ্রীণাং হরিতাং চতুরক্রিয়াম্।
কৌমারীং সততং বন্দে তপ্তচামীকরপ্রভাম্॥
মুগ্ধাং স্নিগ্ধাং বিদগ্ধাং চ সংদিগ্ধাং চতুরক্রিয়াম্।
বন্দেরুণক্রিয়াভাসাং ? দেবর্ষিপ্রমুদাকৃতিম্॥
সিঞ্জন্নূপুরপাদপদ্মযুগলাং হংসীংগতিংবিভ্রতীম্।
চঞ্চৎখঞ্জনমঞ্জুলোচনযুগাং পীনোল্লসৎকন্ধরাম্॥
শুম্ভৎকাঞ্চন কঙ্কণ দ্যুতিমিলৎপাণৌ চলচ্চামরাম্।
কুর্ব্বাণাং হরিরাধিকোপরি সদা শ্রীরঙ্গদেবীং ভজে॥

কুঞ্জের দ্বারে আসিয়া সখীগণ মিলিত কণ্ঠে প্রভাতে শ্রীরাধারাণীর জয় গান করিয়া বলেন—

জয় জয় শ্রীরঙ্গরূপরসালী জয় জয় পদ্মা প্রতিপালী।

জয় জয় শ্রীরসবরষাকরণী জয় জয় শ্রুতিরূপা শ্রুতিবরুণী ॥

শ্রীরাধা রঙ্গদেবী, রূপ, রসমঞ্জরী প্রভৃতির এবং পদ্মা প্রভৃতির প্রতিপালিকা। তিনি সাক্ষাৎ শ্রুতিরূপা এবং বেদপ্রতিপাদ্যা মধুর রস বর্ষণকারিণী। রাধা সকল কামনা পূর্ণ করেন। ভাগবতী এবং মঙ্গল-ভাবিনী। কোটি চন্দ্রের কান্তি তাঁহার অঙ্গে। তিনি মাধবের হৃদয়ে বাস করেন। শ্রীবৃন্দাবনচারিণী, অসিত ও সিত উভয়বিধ রসে পূর্ণা, নিজ যশে জগতে বিখ্যাতা, গুণের আকর সুখদায়িনী রাধা। মহা প্রেম হেতু প্রসিদ্ধা রাধা প্রাণবল্লভের গৌরবে গৌরবান্বিতা সকল গুণের আগার গৌরাঙ্গী দিব্য কাঞ্চনবর্ণা কুমারী কুঞ্চিতকেশিনী বিচিত্র বর্ণে শোভমানা চিত্র বিচিত্র অঙ্কনে চিত্রিতাঙ্গী পবিত্র হস্তকমলা অলক শোভিত গণ্ডস্থল। সুখদায়িনী হিতূ যাহার অনুগতা সখী, যাহার নিজ-নাম শ্রীরাধা, যিনি হরিপ্রিয়ার স্বামিনী, সেই রাধার জয় হউক।

নিত্য কিসোরি কিসোর দোউ নিত্যকামিনী কংত।
নিতবিলাস বিলসত দোউ নিতনব ভাব অনন্ত ॥

কিশোর ও কিশোরী নিত্য কান্ত ও কান্তা। তাহাদের নিত্যবিলাস নিত্য নব নব অনন্ত ভাব তাহাদের উভয়ের।

শ্রীরাধা নিত্যকিশোরী রসিক বিহারী নিত্যকিশোর। তাহাদের এই কিশোর বয়সের আর শেষ নাই। শ্রীরাধা প্রিয়ের চিত্ত চুরি করেন। প্রিয়তম কৃষ্ণও প্রিয়ার চিত্ত চুরি করেন। শ্রীরাধা শোভাময়ী গৌরী। গুণমন্দির সুন্দর শ্যাম। রাধা রসিকাগণশ্রেষ্ঠা, অগাধরূপ-শালিনী, মনমোহনেরও শোভার সীমা নাই।

রাধা বাধা হরণী	বাধা হরণকারী হরি রাধার প্রাণাধার
,, অতি সুকুমারী	শ্যাম অদ্ভুত প্রিয় সুকুমার
,, প্রিয়ের প্যারী	,, প্যারীর পরম উদার প্রিয়
,, কৃষ্ণ বল্লভা	,, রাধাবল্লভ কৃপালু কৃষ্ণ
,, কৃপাসুলভা	,, দয়ানিধি দীনদয়াল

রাধ বিশালনয়না	শ্যাম কমলদলনয়ন
,, রসালরূপ	,, বিচিত্র রসের নাগর
,, পরম প্রবীণা	,, চিত্তের সুখদানে পরম চতুর
,, নিত্য নবীনা	,, কমলনয়ন নিত্য নব
,, রতি রস রঙ্গিনী	,, কোটি কন্দর্প সুন্দর

শ্রীরাধা স্বর্ণকান্তি ধারিণী শ্যাম মরকতমণি কান্তি মৃদু অঙ্গ মোহনীয়া।

,, রমণীমণি	,, কুঞ্জবিলাসীরমণ
,, দুঃখজ্বালা হরণকারিণী	,, দুঃখহরণ পরমপবিত্র
,, কমল বদনী	,, কমলবদন বৃন্দাবনচন্দ্র
,, সকল সুখের গৃহরূপা	,, সকলসুখ সদন আনন্দ কন্দ
,, ললিতলাবণ্যরূপা	,, লাবণ্যখনি আদরের দুলাল
,, সকল সুখের প্রদীপ	,, সকল সুখরূপ সদা সর্ব্বদা
,, সহজস্বরূপা	,, সকলের শিরোমণি সহজরূপ
,, নিরুপমা অমেয়া	,, অদ্ভুতআভা অসীম অতুল।
,, কান্তা কামিনী	,, কামিনীকান্ত রাধাকান্ত
,, হরিপ্রিয়া স্বামিনী	,, নব নব অনন্ত ভাবে বিলসিত।

যুগলের মাধুর্য্য আস্বাদনে গুণবর্ণনায় আর বিরতি নাই। এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দর্শন ইহাই মহাবাণীর মহামহিমা। প্রাণের যে জাতীয় সরলভাবের উদ্‌গমে পরম প্রিয় যুগলের এইরূপ বিশেষ বিশেষ গুণের দিকে মনের গতি নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হয় উহা অসাধারণ। হরিপ্রিয়ার স্বামিনী ও শ্যামসুন্দরের অনন্ত ভাব বিলাসের নব নবায়মান মাধুর্য্য জগৎকে আপ্লাবিত করুক।

অলবেলে আঁগন খড়ে অংস অংস ভুজ ধারি।
লৈ দরপন দিখরাবহো হৈব সনমুখ সহচারি॥

সখীগণ পরস্পর কাঁধে হাত রাখিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া

আছেন। তাহারা হাতে দর্পণ লইয়া যুগলের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা দেখিতেছেন অঙ্গের অলঙ্কার স্থানচ্যুত হইয়াছে—বক্ষঃস্থলে অদ্ভুত নখরেখা—গণ্ডস্থলে তাম্বুলরাগ, অধরে অঞ্জন লাগিয়াছে। নিদ্রার আলস্যে নয়ন অরুণবর্ণ। শ্রীহরিপ্রিয়া সহচরী যুগলকিশোরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। -

রতিরসে বিভোর যুগলের কোনদিক্ দিয়া রজনী প্রভাত হইল জানিতে পারা যায় নাই। যে সকল রতিচিহ্নে সঙ্কোচ হইতেছে, রঙ্গদেবী নিজের পটবাসদ্বারা যুগলের সেই সকল রতিচিহ্ন মুছিয়া দিতেছেন। সেই শোভা দর্শনে শ্রীহরিপ্রিয়া দন্তে তৃণ কাটিতেছেন—নিছনি যাইতেছেন। দুজনেই কুঞ্জমধ্যে মুখ প্রক্ষালন করিলেন। সখীগণ নির্ণিমেষনয়নে দুজনার সুন্দর বদন শোভা দেখিতে লাগিলেন। মুখমার্জন করিয়া ভোজনের সামগ্রী দিলেন। মঙ্গল ভোগের পর দুজনেই আচমন করিলেন সখীগণ জল ঢালিয়া দেন। যুগলেই তখন সিংহাসনে বসিলেন। শ্রীহরিপ্রিয়া মঙ্গল আরতির দ্রব্য সাজাইলেন। তখন—

মঙ্গল কুংজমে মঙ্গল আরতি মঙ্গল রংগরংগীলী বারতি।
মঙ্গল মুখ অরবিংদ নিহারতি মঙ্গলমূরতি হিয়মে ধারতি॥
মঙ্গল সবসহচরি অনুসারতি মঙ্গল মোদ বিবিধ বিস্তারতি।
মঙ্গল চৌর লিয়ে কর ঢারতি মঙ্গল মনসিজ মন্মু মনুহারতি।
মঙ্গল জয় জয় শব্দ উচ্চারতি মঙ্গল শ্রীহরিপ্রিয়া বিচারতি॥

আজ সুন্দর প্রভাত সর্ব্ববিষয়েই শুভ। কুঞ্জ, আরতি, সখীগণ, মুখারবিন্দ দর্শন, হৃদয়ে রূপধারণ সকলই মঙ্গলময়। ধ্বনির সহিত শ্রীহরিপ্রিয়ার অন্তরেও সেই মঙ্গলই ভাবনার বিষয় হইয়াছে।

কমলনয়ন বসকারিণী নিত্য কিসোরী বাম।
সুজসউজাগরি নাগরী জয় রাধা সুখধাম॥

রাধাশ্যাম সুন্দরের সকল সুখ সাধা রাধিকা কমলনয়নের

বশীকারিণী সকল সুখধামস্বরূপা মনমোহন মনোহরণকারিণী নিত্য-কিশোরী ভাগ্যবতী প্রশংসিতা শ্রীহরিপ্রিয়া স্বামিনী তোমার জয় হউক।

একরংগমে রঁগে দোউ একপ্রাণ দ্বৌ গাত।
বদন বিলোকিত পরস্পর ছিন বিছুরে ন সুহাত॥

ক্ষণকালের জন্যও দুজনের বিচ্ছেদ সহেনা। মুখের দিকে চাহিয়া আর কেহই পথে চলিতে পারেন না। পদ আর চলেনা দুজনেই দুজনের প্রাণ জীবনধন। এক রঙ্গে দুজনে রঙ্গীন হইয়া আছেন। দুজনে একপ্রাণ মাত্র দুই দেহ। এইরূপ দেখিয়া শ্রীহরিপ্রিয়া সহচরীর আনন্দ আর ধরেনা।

শ্রীহরিব্যাসজী যুগল মাধুরী বর্ণনায় সহস্র বদন। তিনি এই ব্রজবনচারী যুগল কিশোর কিশোরীর কত যে মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার ভাবনায় চিত্ত দিব্যানন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। রসচেতনার এই ভূমিতে যাহারা পৌছাইতে সমর্থ তাহারাই বিশ্বরচনার মাধুর্য্যে লীলাময়ের অভিনব লীলা দর্শনের অধিকারী, মহতের অনুগ্রহ ভিন্ন জড়বিচার তর্কের যুক্তিজাল বিস্তারে এই রসতত্ত্বের অনুসন্ধান চিদানন্দময় ব্রজবাসীগণের ভাবনার কাছে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। তিনি কেবল জয় গান করিয়াই যে আনন্দ পাইয়াছেন তাহার প্রাণের অনুভূতির সঙ্গে সমপ্রাণতায় সজাতীয়তা বোধে কেহ যদি একটু দরদ দিয়া যুগলমাধুরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন আমাদের মনে হয় তিনি এই মর্ত্ত্যলোকেই সকল বাধা দূর করিয়া দিব্য জগতের আলোক পাইতে পারেন। শুধু ঐতিহাসিক বিচার করিয়া রাধাভাবনাম্বুজে প্রবেশ একান্তভাবেই পরিহার করা কর্ত্তব্য। উহাতে প্রাকৃত বিচার হইতে চিত্তকে রসরাজ্যে তুলিয়া লওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই জন্যই প্রাচীনেরা ঋষিবাক্য, সাধুসঙ্গ এবং আচারবান সৎলোকের গ্রন্থই আলোচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে সকল আধুনিক বিদ্যোপজীবির গ্রন্থ আমাদের ভাবনা ও সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সেইগুলি

সাবধানতা সহকারে পরিহারপূর্ব্বক ভাবনার পরিপোষক ও পুষ্টিবিষয়ক সংশাস্ত্রই অভ্যাস করিবে।

হরিব্যাস বলেন, পুরুষাভিমানে আমার প্রভু হরিকে আর আমার নিত্যসিদ্ধস্বরূপ হরিপ্রিয়ারূপে আমার স্বামিনী বলিয়া রাধাকেই বরণ করিয়াছি।

মনমোহন মনোহর কুঞ্জভবনে পর্য্যঙ্কের উপরে শয়ন করেন। তখন প্রিয় সহচরী কাছে থাকিয়া সেবা করেন।

মোহনও মোহিনী মনোরঞ্জন করেন। পরস্পরের স্কন্ধে হস্তার্পণপূর্ব্বক দুইজনে হংসগতিতে হেলিয়া দুলিয়া পথে চলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে মহামনোহর মন্দিরে সুখে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন।

সুখ সরমত বয়সত রসে রুচি তরঙ্গ নহি॑ পার।
শ্রীহরিপ্রিয়া দোউ বিলসহী॑ সুমনসেজ সাধার॥

কুসুম শয্যায় যুগল বিহার করেন। সেখানে আনন্দ মূর্ত্তি সখীভিন্ন আর কাহারও থাকিবার উপায় নাই। বার বার প্রিয়ার বদনকমল বলপূর্ব্বক কৃষ্ণ ধারণ করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ শোভা প্রশংসা করিতেছেন। প্রিয়ার প্রেম বৃদ্ধির জন্যই তিনি এরূপ করেন। কুমার ও কুমারী পরস্পরের অঙ্গে বিহার করিয়া প্রমত্ত হইলেন হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। 'না' 'না' এই বাক্য শুনিয়া প্রিয়ের অন্তরে অধিকতর উল্লাস, নূপুর মুখর হইল, কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনা গেল, অনঙ্গের অঙ্গনে অগণিত ভাবোদ্‌গম। সুখরূপও সরসায়িত হইয়া উঠিল রস বর্ষণে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইল। দাসী হরিপ্রিয়া লতার আড়াল হইতে দর্শন করে। সখীরা পরস্পর বলাবলি করে এসময় যুগল দর্শন করিয়া নয়নের সফলতা বিধান করিয়া লও।

সমাপ্ত